রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পঞ্চদশ খণ্ড

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

শুধায়োনা, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি'?
জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহ জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি ;
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমিরতোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথচক্রনির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্‌বেল উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

[ভাদ্র ?] ১৩৩৬
[শান্তিনিকেতন]

পারস্যে জন্মদিনে

তেহেরান। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৯

[পৃ ২৮৩

মহুয়া

বোধন

মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে
পার হয়ে এল চলি,
তার পানে হায় শেষ চাওয়া চায়
করুণ কুন্দকলি।
উত্তর বায় একতারা তার
তীব্র নিখাদে দিল ঝংকার,
শিথিল যা ছিল তারে ঝরাইল—
গেল তারে দলি দলি।

শীতের রথের ঘূর্ণিধূলিতে
গোধূলিরে করে ম্লান'।
তাহারি আড়ালে নবীন কালের
কে আসিছে সে কি জান'।
বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী
করে কানাকানি 'কে আসে কী জানি',
বলে মর্মরে 'অতিথির তরে
অর্ঘ্য সাজায়ে আনো'।

নির্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিল বনপারে।
মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জনা নাহি কারে।

ম্লান চেতনার আবর্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি দিল তারে।

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নূতন করি।
অপব্যয়ের ভয় নাহি তার
পূর্ণের দান স্মরি।
অলস ভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চিরপুরাতনে করে উজ্জ্বল
নূতন চেতনা ভরি।

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে
নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু
আনিবে সে ধরণীতে।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নব বর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে
ফিরে জয় করে নিতে।

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার,
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার,

তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা।

বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়' ;—
কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থরথর করি উঠুক পরান
প্রান্তরে পর্বতে।

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়,—
'করো ত্বরা, করো ত্বরা।
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র
রক্তপ্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্‌ভ রক্তিমরাগে,
মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে
মধুপের মনোহরা।'

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন ভরে,—
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
জয়সংগীতস্বরে।
নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার,
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে।

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল
শূন্য কে দিল ভরি।
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরি।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাই তো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্যামাসুন্দরী।

দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বসন্ত

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
বাজে বাণী তব 'মাভৈঃ মাভৈঃ',
বন্দীরা পেল ছাড়া।
দিগন্ত হতে শুনি' তব সুর
মাটি ভেদ করি উঠে অঙ্কুর,
কারাগারে দিল নাড়া।
জীবনের রণে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে-যে নবীনেরা জানে,
দলে দলে আসে আমের মুকুল
বনে বনে দেয় সাড়া।

কিশলয়দল হল চঞ্চল,
উতল প্রাণের কলকোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে

মুক্তির গানে কাঁপে চারিধার,
কানা দানবের মানা-দেওয়া দ্বার
আজ গেল সব টুটে।
মরুযাত্রার পাথেয়-অমৃতে
পাত্র ভরিয়া আসে চারিভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জনগীতে
জাগে মৌমাছিপাড়া।

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই,
কেন সুকুমার বেশ।
মৃত্যুদমন শৌর্য আপন
কী মায়ামন্ত্রে করিলে গোপন,
তূণ তব নিঃশেষ।
বর্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া।

জড়দৈত্যের সাথে অনিবার
চিরসংগ্রামঘোষণা তোমার
লিখিছ ধূলির পটে—
মনোহর রঙে লিপি ভূমিতলে
যুদ্ধের বাণী বিস্তারি চলে
সিন্ধুর তটে তটে।
হে অজেয়, তব রণভূমি-'পরে
সুন্দর তার উৎসব করে,
দক্ষিণবায়ু মর্মর স্বরে
বাজায় কাড়া-নাকাড়া।

দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বরযাত্রা

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
যেন কোন্ দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে।

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে ছড়ায়ে হাসি।

অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকরগুঞ্জিত
কিশলয়পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।

কিংশুককুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিণী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সংগীতে
নৃত্যের ভঙ্গীতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

মাধবী

বসন্তের জয়রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুলের বন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে,
ছুটিল সকল তার লজ্জা।
অজানা পান্থের লাগি
নিশি নিশি ছিল জাগি
দিনে দিনে ভরেছিল অর্ঘ্য
কাননের একভিতে
নিভৃত পরানটিতে
রেখেছিল মাধুরীর স্বর্গ।
ফাল্গুন পবনরথে
যখন বনের পথে
জাগাল মর্মর-কলছন্দ,
মাধবী সহসা তার
সঁপি দিল উপহার,
রূপ তার, মধু তার, গন্ধ।

দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বিজয়ী

বিবশ দিন, বিরস কাজ,
কে কোথা ছিনু দোঁহে,
সহসা প্রেম আসিলে আজ
কী মহা সমারোহে।
নীরবে রয় অলস মন,
আঁধারময় ভবনকোণ,

ভাঙিলে দ্বার কোন্‌ সে ক্ষণ
অপরাজিত ওহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বিপুল বিদ্রোহে।

কানন-'পর ছায়া বুলায়,
ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা।
যে যেথা রয় ছাড়িল পথ,
ছুটালে ঐ বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ
ঘন ঘুমের মোহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বেদনাদান বহে।

বৈশাখ ১৩৩৩ ?

প্রত্যাশা

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,
'এসেছে কি।'

আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী উল্লাসে
নাচের মাতন লাগল শিরীষ ডালে,
স্বর্গপুরের কোন্‌ নূপুরের তালে !

প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিল, 'শুনাও দেখি,
আসে নি কি।'

আবার কখন্ এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী বিশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণশব্দে মেতে।
প্রত্যহ তার মর্মরস্বর বলবে আমায় দীর্ঘশ্বাসে,
'সে কি আসে।'

প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা,
নিমেষগণন হয় না কি মোর সারা।
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো,
'সে কি এল।'

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
চৌরঙ্গি [কলিকাতা]

অর্ঘ্য

সূর্যমুখীর বর্ণে বসন
লই রাঙায়ে
অরুণ আলোর ঝংকার মোর
লাগল গায়ে।
অঞ্চলে মোর কদমফুলের ভাষা
বক্ষে জড়ায় আসন্ন কোন্ আশা,
কৃষ্ণকলির হেমাঙ্গলির
চঞ্চলতা
কঞ্চুলিকার স্বর্ণলিখায়
মিলায় কথা।

আজ যেন পায় নয়ন আপন
নতুন জাগা।
আজ আসে দিন প্রথম দেখার
দোলন-লাগা।
এই ভুবনের একটি অসীম কোণ,
যুগলপ্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায়
নাই জানা কে,
সাগরপারের পান্থপাখির
ডানার ডাকে।

চলব ডালায় আলোকমালায়
প্রদীপ জেলে,
ঝিল্লিঝনন অশোকতলায়
চমক মেলে।
আমার প্রকাশ নতুন বচন ধ'রে
আপনাকে আজ নতুন রচন ক'রে,
ফাগুনবনের গুপ্ত ধনের
আভাস-ভরা,
রক্তদীপন প্রাণের আভায়
রঙিন-করা।

চক্ষে আমার জ্বলবে আদিম
অগ্নিশিখা,
প্রথম ধরায় সেই যে পরায়
আলোর টিকা।
নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি
করবে ঘোষণ প্রেমের উদ্বোধনী,

প্রাণদেবতার মন্দিরদ্বার
যাক রে খুলে,
অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

দ্বৈত

আমি যেন গোধূলিগগন
ধেয়ানে মগন,
স্তব্ধ হয়ে ধরা-পানে চাই ;
কোথা কিছু নাই,
শুধু শূন্য বিরাট প্রান্তরভূমি।
তারি প্রান্তে নিরালা পিয়ালতরু তুমি
বক্ষে মোর বাহু প্রসারিয়া।
স্তব্ধ হিয়া
শ্যামল স্পর্শনে আত্মহারা,
বিস্মরিল আপনার সূর্যচন্দ্রতারা।

তোমার মঞ্জরি
কভু ফোটে, কভু পড়ে ঝরি ;
তোমার পল্লবদল
কভু স্তব্ধ, কভু বা চঞ্চল।
একেলার খেলা তব
আমার একেলা বক্ষে নিত্যনব।
কিশলয়গুলি
কম্পমান করুণ অঙ্গুলি

চায় সন্ধ্যারক্তরাগ,
আলোর সোহাগ ;
চায় নক্ষত্রের কথা,—
চায় বুঝি মোর নিঃসীমতা।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

সন্ধান

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।
সেথায় কখন্ অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও-যে।
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে,—
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে ;
অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় ম'জে।

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে।

শ্রাবণ ১৩৩৫ ?

উপহার

মণিমালা হাতে নিয়ে
দ্বারে গিয়ে
এসেছিনু ফিরে
নতশিরে।
ক্ষণতরে বুঝি
বাহিরে ফিরেছি খুঁজি
হায় রে বৃথাই
বাহিরে যা নাই।
ভীরু মন চেয়েছিল ভুলায়ে জিনিতে,
হীরা দিয়ে হৃদয় কিনিতে।

এই পণ মোর,
সমস্ত জীবন-ভোর
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি ;
কণ্ঠহারে
গেঁথে দিব তা'রে
যে দুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাতসম
পায়ে দিব তার
যে এক-মুহূর্ত আনে প্রাণের অনন্ত উপহার।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

শুভযোগ

যে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে
উৎসুক ধরণী,

সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তার তরঙ্গের ধন্য ধন্য ধ্বনি
মন্দ্রিয়া উঠিল কূলে কূলে ;
নদীর গদ্‌গদ বাণী অশ্রুবেগে উঠে ফুলে' ফুলে'
কোটালের বানে,
কী চেয়েছে কী বলেছে আপনি না জানে ;
সে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
তোমারে প্রথম দেখা দেখেছি জীবনে।

যে-বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে ;
পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি ;
শিমুল পাগল হয়ে মাতে,
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে,
পাত্র করি পুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা।
উচ্ছ্বসিত সে-এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫
চৌরঙ্গি [কলিকাতা]

মায়া

চিত্তকোণে ছন্দে তব
বাণীরূপে
সংগোপনে আসন লব
চুপে চুপে।

সেইখানেতেই আমার অভিসার,
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন-বনের
ছায়াতলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির
আলো জ্বলে।

সেথায় নিয়ে যাব আমার
দীপশিখা,
গাঁথব আলো-আঁধার দিয়ে
মরীচিকা।
মাথা থেকে খোঁপার মালা খুলে
পরিয়ে দেব চুলে,—
গন্ধ দিবে সিন্ধুপারের
কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন্ বিদেশের
কী বিস্মৃতির।

পরশ মম লাগবে তোমার
কেশে বেশে,
অঙ্গে তোমার রূপ নিয়ে গান
উঠবে ভেসে।
ভৈরবীতে উচ্ছল গান্ধার,
বসন্তবাহার,
পূরবী কি ভীমপলাশি
রক্তে দোলে—
রাগরাগিণী দুঃখে সুখে
যায়-যে গলে।

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা,—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন কর।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

নির্ঝরিণী

ঝর্না, তোমার স্ফটিকজলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্যতারা।
তারি একধারে আমার ছায়ারে
আনি মাঝে মাঝে, দুলায়ো তাহারে,
তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি,—
দিয়ো তা'রে বাণী যে-বাণী তোমার
চিরন্তনী।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।

পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।

আষাঢ় ১৩৩৫
[বাঙ্গালোর]

শুকতারা

সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখারন্ধ্র।

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য,
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ন।

মন্দ চরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে-বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

নিশীথের তল হতে তুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য।

যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

২৩ জুন ১৯২৮
Ballabrooie
বাঙ্গালোর

প্রকাশ

আচ্ছাদন হতে
ডেকে লহো মোরে তব চক্ষুর আলোতে।
অজ্ঞাত ছিলাম এতদিন
পরিচয়হীন,—
সেই অগোচরদুঃখভার
বহিয়া চলেছি পথে; শুধু আমি অংশ জনতার।
উদ্ধার করিয়া আনো,
আমারে সম্পূর্ণ করি জানো।
যেথা আমি একা
সেথায় নামুক তব দেখা।

সে-মহানির্জন
যে-গহনে অন্তর্যামী পাতেন আসন,
সেইখানে আনো আলো,
দেখো মোর সব মন্দ ভালো,
যাক লজ্জা ভয়,
আমার সমস্ত হ'ক তব দৃষ্টিময়।

ছায়া আমি সবা-কাছে, অস্ফুট আমি-যে,
তাই আমি নিজে
তাহাদের মাঝে
নিজেরে খুঁজিয়া পাই না-যে।
তারা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান,
তারা মোর কর্ম জানে, নাহি জানে মর্মগত প্রাণ
সত্য যদি হই তোমা-কাছে
তবে মোর মূল্য বাঁচে,—
তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।
প্রেম তব ঘোষিবে তখন
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার
বহিতেছি অজ্ঞাতির বন্ধন সদাই,
মুক্তি চাই
তোমার জানার মাঝে
সত্য তব যেথায় বিরাজে।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

বরণডালা

আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার
অঙ্গ-মাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোক-
মালার সাজে।
নব বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের
স্বর্ণকূলে,
আমার দেহের বাণীতে সে-দোল
উঠিছে দুলে,—
এ বরণ-গান নাহি পেলে মান
মরিব লাজে,
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম
ছন্দ বাজে।

অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া
বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের
আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয়
বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি
হ'ক না সারা।
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা,

দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে।
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর
সকল কাজে।

২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫

মুক্তি

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
পুরানো মোর স্বপনডোর
ছিঁড়িল কুটিকুটি।
রুদ্ধ মন গগনে গেল খুলি,
বিজুলি হানি দৈববাণী
বক্ষে উঠে দুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া তৃণশয়নছায়ে
মাটির যেন মর্মকথা বুলায়ে দিল গায়ে ;
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল,
ঢেউয়ের লুটোপুটি
মিলি সকলে কী কোলাহলে
বক্ষে এল জুটি।

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
গুহাবিহারী ভাবনা যত
নিমেষে নিল লুটি।
কী ইঙ্গিতে আচম্বিতে
ডাকিল লীলাভরে
দুয়ারখোলা পুরানো খেলাঘরে,
যেখানে ব'সে সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান
একদা গাহিয়াছি।

প্রাণের মাঝে ছুটে-চলার
খেপামি এল ছুটি,
লাভের লোভ, ক্ষতির ক্ষোভ
সকলি গেল টুটি।

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
শুকতারাকে যেমনি ডাকে
প্রাণে সে উঠে ফুটি।
অরুণরাঙা চেতনা জাগে চিতে—
ঝুমকোলতা জানায় কথা
রঙিন রাগিণীতে।
মনের 'পরে খেলায় বায়ুবেগে
কত-যে মায়া রঙের ছায়া
খেয়ালে-পাওয়া মেঘে;
বুলায় বুকে ম্যাগ্‌নোলিয়া
কৌতূহলী মুঠি,
অতি বিপুল ব্যাকুলতায়
নিখিলে জেগে উঠি।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

উদ্‌ঘাত

অজানা জীবন বাহিনু,
রহিনু আপন মনে,
গোপন করিতে চাহিনু—
ধরা দিনু দুনয়নে।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে ছিনু কেবলি,
তুমি কেন এসে সহসা
দেখে গেলে আঁখিকোণে
কী আছে আমার মনে।

গভীর তিমিরগহনে
আছিনু নীরব বিরহে,
হাসির তড়িৎ-দহনে
লুকানো সে আর কি রহে।
দিন কেটেছিল বিজনে
ধেয়ানের ছবি সৃজনে,
আনমনে যেই গেয়েছি
শুনে গেছ সেইখনে
কী আছে আমার মনে।

প্রবেশিলে মোর নিভৃতে,
দেখে নিলে মোরে কী ভাবে,
যে-দীপ জ্বেলেছি নিশীথে
সে-দীপ কি তুমি নিভাবে।
ছিল ভরি মোর থালিকা,
ছিঁড়িব কি সেই মালিকা।
শরম দিবে কি তাহারে
অকথিত নিবেদনে
যা আছে আমার মনে।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

অসমাপ্ত

বোলো তারে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণশেষে
ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো

বনের মন্দির-মাঝে
তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান,
চক্ষে জল বহে যায়,
নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ।

দেবতার বর
কত জন্ম কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে
লিখেছে আকাশ-পাতে
এ-দেখার আশ্বাস-অক্ষর।
অস্তিত্বের পারে পারে
এ-দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি'
আমার উন্মনা আঁখি
এ-দেখার গূঢ় গান গাহে।

বোলো আজি তারে,—
'চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে
বারম্বার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে,
প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জানি
আমার গুণ্ঠনখানি,
কাঁদায়েছে সেতারের তার।'

বোলো তারে আজ,—
'অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।'

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

নিবেদন

অজানা খনির নূতন মণির
গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায়
বেঁধেছি তার।
যেমন নূতন বনের দুকূল,
যেমন নূতন আমের মুকুল,
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের
নূতন দ্বার—
তেমনি আমার নবীন রাগের
নবযৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া
বীণার তার।

যে-বাণী আমার কখনো কারেও
হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন
নৃত্যকলা।
আজি অকারণ মুখর বাতাসে
যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মরস্বরে বনের ঘুচিল
মনের ভার,—
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ
উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত
বীণার তার।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

অচেনা

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?
কোন অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রাজাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু 'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, 'কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে?'

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে-কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী;

দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।
জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি হবে মোর।

হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় র'বে না ;
মহা আকস্মিক
বাধাবন্ধ ছিন্ন করি দিক্‌,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।

আষাঢ় ১৩৩৫
[বাঙ্গালোর]

অপরাজিত

ফিরাবে তুমি মুখ,
ভেবেছ মনে আমারে দিবে দুখ ?
আমি কি করি ভয়।
জীবন দিয়ে তোমারে প্রিয়ে, করিব আমি জ
বিঘ্ন-ভাঙা যৌবনের ভাষা,
অসীম তার আশা,
বিপুল তার বল,
তোমার আঁখি-বিজুলিঘাতে হবে না নিষ্ফল।

বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে,
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে,

ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল,
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল ;
ঝরিয়া পড়ে পাতা,
বনস্পতি তবুও তুলি' মাথা
নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।
দিনের পরে যায় রে দিন, রাতের পরে রাতি,
শ্রবণ রহে পাতি।
কঠিনতর যবে সে-পণ দারুণ উপবাসে
এমনকালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অকৃপণ
আষাঢ় মাসে সজল শুভখন ;
পূর্বগিরি-আড়াল হতে বাড়ায় তার পাণি,
করিয়ো ক্ষমা, করিয়ো ক্ষমা, গুমরি উঠে বাণী,
নমিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি,
অশ্রুবারিবন্যা নামে ধরণী যায় ভাসি।

ফিরালে মোরে মুখ !
এ শুধু মোরে ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক।
তোমার প্রেমে আমার অধিকার
অতীত যুগ হতে সে জেনো লিখন বিধাতার।
অচল গিরিশিখর-'পরে সাগর করে দাবি,
ঝর্না পড়ে নাবি ;
সুদূর দিক্‌রেখার পানে চায়,
অকুল অজানায়
শঙ্কাভরে তরল স্বরে কহে,
নহে গো, নহে নহে ;
এড়ায়ে যাবে বলি
কত-না আঁকাবাঁকার পথে চলে সে ছলছলি ;

বিপুলতর হয় সে-ধারা, গভীরতর স্বরে,
যতই আসে দূরে ;
উদারহাসি সাগর সহে অবুঝ অবহেলা,—
একদা শেষে পলাতকার খেলা
বক্ষে তার মিলায় কবে, মিলনে হয় সারা—
পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা।

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে ;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ-বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী—
তুমি আছ, আমি আছি।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৫

পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন্ সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণকিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন্ গুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

দূত

ছিনু আমি বিষাদে মগনা
অন্যমনা
তোমার বিচ্ছেদ-অন্ধকারে।
হেনকালে নির্জন কুটিরদ্বারে
অকস্মাৎ
কে করিল করাঘাত,
কহিল গম্ভীর কণ্ঠে, অতিথি এসেছি, দ্বার খোলো।

মনে হল
ঐ যেন তোমারি স্বর শুনি,
ঐ যেন দক্ষিণবায়ু দূরে ফেলি মদির ফাল্‌গুনী
দিগন্তে আসিল পূর্বদ্বারে,
পাঠাল নির্ঘোষ তার বজ্রধ্বনিমন্দ্রিত মল্লারে।
কেঁপেছিল বক্ষতল
বিলম্ব করি নি তবু অর্ধ পল।

মুহূর্তে মুছিনু অশ্রুবারি,
বিরহিণী নারী,

ছাড়িনু ধেয়ান তব তোমারি সন্ধানে,
ছুটে গেনু দ্বার-পানে।
শুধালেম, তুমি দূত কার।
সে কহিল, আমি তো সবার।
যে-ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে
ডাকিলাম তারে সেই ঘরে।
আনিলাম অর্ঘ্যথালি,
দীপ দিনু জ্বালি।
দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে
যে-মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে।

২০ অগস্ট ১৯২৮
[কলিকাতা]

পরিচয়

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্নমেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে ;
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায় ;
শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু-কটাক্ষচ্ছটায়

সে-দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী,
কদম্বের ডালি।
বাদলের বিষণ্ণ ছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে-ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে।

মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পুবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে,
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধুলায়।
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
দিনু উপহার।

সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে সখী,
একটি কেতকী।
তখনো হয় নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।
সারিদেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে

দাঁড়াইলে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া,
গোপনে হাসিয়া।
শুধালেম আমি কৌতূহলী
'কী এনেছ' বলি'।
পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত,
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত।

ঝংকারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সংগীতে
চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে।

সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
নিষেধে নিরুদ্ধ যে-সম্মান
তাই তব দান।

২০ অগস্ট ১৯২৮
চৌরঙ্গি [কলিকাতা]

দায়মোচন

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল,—
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হ'ক সেই চিরকাল ;
তার পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাব না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবাসো যদি বেসো।

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী ;
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
রবে তব বিস্মৃতিতলে।

দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে
যদি কভু চেয়ে দেখ ফিরে
হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে
নয়ন সিক্ত আঁখিনীরে।
মার্জনা করো যদি পাব তবে বল,
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল,
সত্য যা দিয়েছিলে থাক্ মোর তাই,
দিবে লাজ তার বেশি দিলে।
দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনোমতে চাই
দুঃখের মূল্য না মিলে।

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে।
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি,
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।

২৩ অগস্ট ১৯২৮

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি' মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।

শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গাপাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি' পণ।

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে ;
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, মর্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্র-পাখির পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।

উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হ'ক সে-নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে।

২৩ অগস্ট ১৯২৮

প্রতীক্ষা

তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে,
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে।
অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্য প্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।
সেবাকক্ষে করি না আহ্বান ;—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে-বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।

দীর্ঘ এ দুর্গম পথ মধ্যাহ্নতাপিত,
অনিদ্রায় রজনী যাপিত।
শুষ্কবাক্যবালুকার ঘূর্ণিপাক-ঝড়ে
পথিক ধুলায় শুয়ে পড়ে।
নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা,
হে কল্যাণী, তুমি নিষ্কলুষা,
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্ধ্বশিখা বিপুল বিশ্বাস।

ধূসর প্রদোষে আজি অন্তপথ জুড়ে
নিশাচর মিথ্যা চলে উড়ে।
আলো-আঁধারের পাকে না মিলে কিনারা,
দীর্ঘ যে দেখায় হ্রস্ব যারা।
যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে,
কাঁদে দিক বিধির ধিক্কারে,
ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধির আশীর্বাদ,
ধূলিতে-খুঁটিয়া-তোলা বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ।

কুৎসায় বিস্তারি দেয় পঙ্কে-ক্লিন্ন গ্লানি,
কলহেরে শৌর্য ব'লে জানি,
ভাবি, দুর্যোগের সিন্ধু তরিব হেলায়
বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায়।
বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি,
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি,
অশক্তি মজ্জায় রক্তে, শক্তি বলি জানি ছলনাকে,
মর্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব করি রাখে।

হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চির সত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি,—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ

১৭ অগস্ট ১৯২৮

লগ্ন

প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে,
যেদিন গৈরিক বস্ত্র ছাড়ে
আসন্নের আশ্বাসে সুন্দরা
বসুন্ধরা ?
প্রাঙ্গণের চারিধার ঢাকিয়া সজল আচ্ছাদনে
যেদিন সে বসে প্রসাধনে
ছায়ার আসন মেলি ;
পরি লয় নূতন সবুজরঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন।
দিগন্তের অভিষেকে
বাতাস অরণ্যে ফিরি নিমন্ত্রণ যায় হেঁকে হেঁকে।
যেদিন প্রণয়ী বক্ষতলে
মিলনের পাত্রখানি ভরে অকারণ অশ্রুজলে,
কবির সংগীত বাজে গভীর বিরহে,—
নহে নহে, সেদিন তো নহে।

সে কি তবে ফাল্গুনের দিনে,
যেদিন বাতাস ফিরে গন্ধ চিনে চিনে
সবিস্ময়ে বনে বনে,
শুধায় সে মল্লিকারে কাঞ্চন-রঙ্গনে,
তুমি কবে এলে।
নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধুলায় দেয় ফেলে
ঐশ্বর্যগৌরবে।
কলরবে
অজস্র মিশায় বিহঙ্গম
ফুলের বর্ণের রঙ্গে ধ্বনির সংগম ;

অরণ্যের শাখায় শাখায়
প্রজাপতিসংঘ আনে পাখায় পাখায়
চিত্রলিপি, কুসুমেরি বিচিত্র অক্ষরে ;
ধরণী যৌবনগর্বভরে
আকাশেরে নিমন্ত্রণ করে যবে
উদ্দাম উৎসবে ;
কবির বীণার তন্ত্র যে-বসন্তে ছিঁড়ে যেতে চাহে
প্রমত্ত উৎসাহে।
আকাশে বাতাসে
বর্ণের গন্ধের উচ্চহাসে
ধৈর্য নাহি রহে,—
নহে নহে, সেদিন তো নহে।

যেদিন আশ্বিনে শুভক্ষণে
আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হয় ধনে।
প্রাচুর্যপ্রশান্ত তট পেয়েছে সঙ্গিনী
তরঙ্গিণী—
তপস্বিনী সে-যে, তার গম্ভীর প্রবাহে—
সমুদ্রবন্দনা গান গাহে।
মুছিয়াছে নীলাম্বর বাষ্পসিক্ত চোখ,
বন্ধমুক্ত নির্মল আলোক।
বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে।
অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
পূজারিনী নিরবগুণ্ঠিত,
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে।

দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিয়াছে ভাসি।
সেই স্নিগ্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,
পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে।

১৯ অগস্ট ১৯২৮

সাগরিকা

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট-'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,—
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী"।

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে,
শুধালে, "কেন এলে"।
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে"।
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপাফুল।

দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর-'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা মাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দুখানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
"অতিথি আমি", কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিতকরে প্রদীপখানি জ্বেলে
চাহিলে মুখে, কহিলে, "কেন এলে"।
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে"।
চাহিলে হাসিমুখে,
আধোচাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুক
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।
মধুর হল বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগরজলে দোলে।

ফুরাল দিন কখন্ নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।

লবণজলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবাল মোর রতনভরা তরী।
আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউলদ্বার খুলি
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।
হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে,
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিতগীতকলিতকল্লোলে।

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে;
এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

১ অক্টোবর ১৯২৭
মায়ার জাহাজ

বরণ

পুরাণে বলেছে
একদিন নিয়েছিল বেছে
স্বয়ম্বরসভাঙ্গনে দময়ন্তী সতী
নল-নরপতি
ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে।
অর্ঘ্যহারা দেবতারা চলে গেল লাজে।
দেবমূর্তি চিনেছে সেদিন,
তারা যে ফেলে না ছায়া, তারা অমলিন।
সেদিন স্বর্গের ধৈর্য গেল টুটি,
ইন্দ্রলোক করিল ভ্রূকুটি।

তাই শুনে কত দিন একা বসে বসে
ভেবেছিনু বালিকাবয়সে,
আমি হব স্বয়ম্বরা বিশ্বসভাতলে,—
দেবতারি গলে
দিব মালা তপস্বিনী,
মানবের মাঝখানে একদিন লব তারে চিনি।
তারি লাগি সর্ব দেহে মনে
দিনে দিনে বরমাল্য গাঁথিব যতনে।

কঠিন সে পণ,
ভাবি নি কেমনে তারে করিব সাধন।
মানুষ-যে দেশে দেশে
কত ফেরে দেবতার ছদ্মবেশে ;
ললাটে তিলক কারো লেখা,
দেখিতে দেখিতে ওঠে কালো হয়ে তার স্বর্ণরেখা।
কারো বা কটিতে বাঁধা শরশূন্য তূণ,
কেহ করে বজ্রধ্বনি, নাহি তাহে বজ্রের আগুন।

বাতায়নে বসে থাকি,
কতদিন কী দেখিয়া আশ্বাসে চমকি উঠে আঁখি ;
চেয়ে চেয়ে দ্বিধা লাগে শেষে
বৃষ্টি হতে হতে দেখি শিলা পড়ে এসে।

একদিন রৌদ্রের বেলায়
মধ্যাহ্নের জনতার মুখর মেলায়
রাজপথ-পাশে
দাঁড়াইনু,—দেখিলাম যারা যায় আসে
তাহাদের কায়া
সম্মুখে ফেলিয়া চলে দীর্ঘতর ছায়া।
শুনিলাম স্পর্ধাতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর
ছিন্ন করে দিতে চাহে দেবতার অখণ্ড অম্বর।
উজ্জ্বল সজ্জায়
দীন অঙ্গ সমাচ্ছন্ন ধনের লজ্জায়।
ছুটে চলে অশ্বরথ,
তার চেয়ে আড়ম্বরে সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত।

যখন সেদিন সেই উর্ধ্বশ্বাস লুব্ধ ঠেলাঠেলি
নানাশব্দে উঠিছে উদ্বেলি
তুমি দেখি পথপ্রান্তে একা হাস্যমুখে
নিঃশব্দ কৌতুকে
চেয়ে আছ,—হৃদয় আছিল জনস্রোতে,
মন ছিল দূরে সবা হতে।
তুমি যেন মহাকালসমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যান-মাঝে উমার ভৈরবী।
বহে গেল জনতার ঢেউ,—
কে-যে তুমি কোথা আছ দেখে নাই কেউ।

একা আমি দেখেছি তোমারে—
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে।
মালা হাতে গেনু ধেয়ে,
হাসিলে আমার পানে চেয়ে।
মোর স্বয়ম্বরে
সেদিন মর্ত্যের মুখ ভ্রূকুটিল অবজ্ঞার ভরে

২৬ অগস্ট ১৯২৮

পথবর্তী

দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে
পথে চলিয়াছ তুমি।
আমি তরু মোর ছায়া দিয়ে তারে
মৃত্তিকা তার চুমি।
হে তীর্থগামী, তব সাধনার
অংশ কিছু-বা রহিল আমার,
পথপাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে।
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধধূপে।

তব আহ্বানে বরণ করিয়া
নিয়েছি দুর্গমেরে।
ক্লান্তি কিছু-বা নিলাম হরিয়া
মোর অঞ্চল-ঘেরে।
যা ছিল কঠোর, যাহা নিষ্ঠুর
তার সাথে কিছু মিলাই মধুর,
যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর
আমি তারি মাঝে থেকে

দিনু পথ-'পরে শ্যাম অক্ষরে
জানার চিহ্ন এঁকে।

মোর পরিচয়ে তোমার পথের
কিছু রহে পরিচয়।
তব রচনায় তব ভকতের
কিছু বাণী মিশে রয়।
তোমার মধ্যদিবসের তাপে
আমার স্নিগ্ধ কিশলয় কাঁপে,
মোর পল্লব সে-মন্ত্র জাপে
গভীর যা তব মনে,
মোর ফলভার মিলানু তোমার
সাধনফলের সনে।

বেলা চলে যাবে, একদা যখন
ফুরাবে যাত্রা তব,
শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন
হেথাই দাঁড়ায়ে রব।
এই পথখানি রবে মোর প্রিয়,
এই হবে মোর চিরবরণীয়,
তোমারি স্মরণে রব স্মরণীয়,
না মানিব পরাভব।
তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে
যা-কিছু আমার সব

২৭ অগস্ট ১৯২৮

মুক্তরূপ

তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
পূর্ণরূপে দেখি না তোমায়,
মোর রক্ততরঙ্গের মত্ত কলরবে
বাণী তব মিশে ভেসে যায়।

তোমার পাখারে আমি রুদ্ধ করি বুঝি,
সে-বন্ধনে তোমারেই পাই না তো খুঁজি,
তুমি তো ছায়ার নহ, প্রভাতবিলাসী,
আলোতেই তোমার প্রকাশ,
তোমার ডানার ছন্দে তব উচ্চ হাসি
যাক চলে ভেদিয়া আকাশ।

জানি, যদি লুব্ধ মনে কৃপণতা করি,
ঐশ্বর্যেও দৈন্য না ঘুচায়,
ব্যর্থ ভাণ্ডারের তবে রহিব প্রহরী,
বঞ্চনা করিব আপনায়।
আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপচ্ছায়া
মুগ্ধ চেতনার 'পরে রচে তার মায়া,
তাই নিয়ে ভুলাব কি আমার জীবন।
গাঁথিব কি বুদ্বুদের হার।
তোমারে আড়াল ক'রে তোমার স্বপন
মিটাবে কি আকাঙ্ক্ষা আমার।

বিরাজে মানবশৌর্যে সূর্যের মহিমা,
মর্ত্যে সে তিমিরজয়ী প্রভু,
অজেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।
যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি,
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্রধূলি,
নির্দয় সংগ্রাম-অন্তে মৃত্যু যদি আসি
দেয় ভালে অমৃতের টিকা,
জানি যেন সে-তিলকে উঠিল প্রকাশি
আমারো জীবনজয়লিখা।

আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো,
মোর দুঃখযজ্ঞের শিখায়

জ্বালিবে মশাল তব, আতঙ্কদুঃসহ
রাত্রিরে দহি সে যেন যায়।
তোমারে করিনু দান শ্রদ্ধার পাথেয়,
যাত্রা তব ধন্য হ'ক, যাহা কিছু হেয়
ধূলিতলে হ'ক ধূলি, দ্বিধা যাক মরি,
চরিতার্থ হ'ক ব্যর্থতাও,
তোমার বিজয়মাল্য হতে ছিন্ন করি
আমারে একটি পুষ্প দাও।

২৯ অগস্ট ১৯২৮

স্পর্ধা

শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে, বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার
কলুষকুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার,
আবেশে মন্থর কণ্ঠে গদ্‌গদ সে প্রার্থনা জানায়,
আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায়
দুষ্ট ফেন উঠে বুদ্‌বুদিয়া,— ফেটে যায়, দেয় খুলি
রুদ্ধ বিষবায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
কল্পনাবিকার তার, শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি।— যেন প্রাণপণ বলে
মন তারে করে কষাঘাত। জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দুষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

৩০ অগস্ট ১৯২৮
জোড়াসাঁকো

রাখিপূর্ণিমা

কাহারে পরাব রাখি যৌবনের রাখিপূর্ণিমায়,
হে মোর ভাগ্যের দেব। লগ্ন যেন বহে নাহি যায়।
মেঘে আজি আবিষ্ট অম্বর, ঘন বৃষ্টি-আচ্ছাদনে
অস্পষ্ট আলোর মন্ত্র আকাশ নিবিষ্ট হয়ে শোনে,
বুঝিতে পারে না ভালো। আমি ভাবিতেছি একা বসে
আমার বাঞ্ছিত কবে বাহিরিল প্রচ্ছন্ন প্রদোষে
চিহ্নহীন পথে। এসেছিল দ্বারের সম্মুখে মোর
ক্ষণতরে। তখনো রজনী মম হয় নাই ভোর,
হৃদয় অস্ফুট ছিল অর্ধ জাগরণে। ডাকে নি সে
নাম ধরে, দুয়ারে করে নি করাঘাত, গেছে মিশে
সমুদ্রতরঙ্গরবে তাহার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি।
হে বীর অপরিচিত, শেষ হল আমার রজনী,
জানা তো হল না কোন্ দুঃসাধ্যের সাধন লাগিয়া
অস্ত্র তব উঠিল ঝঞ্চনি। আমি রহিনু জাগিয়া।

৩১ অগস্ট ১৯২৮

আহ্বান

কোথা আছ? ডাকি আমি। শোনো শোনো, আছে প্রয়োজন
একান্ত আমারে তব। আমি নহি তোমার বন্ধন;—
পথের সম্বল মোর প্রাণে। দুর্গমে চলেছ তুমি
নীরস নিষ্ঠুর পথে,— উপবাসহিংস্র সেই ভূমি
আতিথ্যবিহীন; উদ্ধত নিষেধদণ্ড রাত্রিদিন
উদ্যত করিয়া আছে ঊর্ধ্ব-পানে। আমি ক্লান্তিহীন
সেই সঙ্গ দিতে পারি, প্রাণবেগে বহন যে করে
শুশ্রূষার পূর্ণশক্তি আপনার নিঃশঙ্ক অন্তরে,—
যথা রুক্ষ রিক্তবৃক্ষ শৈলবক্ষ ভেদি অহরহ
দুর্দাম নির্ঝরে ঢালে দুর্নিবার সেবার আগ্রহ,

শুকায় না রসবিন্দু প্রখর নির্দয় সূর্যতেজে,
নীরস প্রস্তরমুষ্টিতলে দৃঢ়বলে রাখে সে-যে
অক্ষয় সম্পদরাশি। সহাস্য উজ্জ্বল গতি তার
দুর্যোগে অপরাজিত, অবিচল বীর্যের আধার।

১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

বাপী

একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে
তৃষ্ণার জল তুমি দিয়েছিলে তুলে।
আর কোনোখানে ছায়া নাহি দেখি,
শুধালেম, কাছে বসিতে দিবে কি।
সেদিন তোমার ঘরে ফিরিবার বেলা
বহে গেল বুঝি, কাজে হয়ে গেল হেলা।

অদূরে হোথায় ভাঙা দেউলের ধারে
পূর্ব যুগের পূজাহীন দেবতারে
প্রভাত-অরুণ প্রতিদিন খোঁজে,
শূন্য বেদির অর্থ না বোঝে,
দিন শেষ হলে সন্ধ্যাতারার আলো
যে-পূজারী নাই তারে বলে, দীপ জ্বালো।

একদিন বুঝি দূরে কোন্ রাজধানী
রচনা করেছে দীর্ঘ এ পথখানি।
আজি তার নাম নাই ইতিহাসে,
জীর্ণ হয়েছে বালুকার গ্রাসে,
প্রান্তরশেষে শীর্ণ বনের কোলে
জনপদবধূ জল নিয়ে যায় চলে।

লুপ্তকালের শুষ্ক সাগরধারে
বহু বিস্মৃতি যেথা রয় স্তূপাকারে,
অতি পুরাতন কাহিনী যেথায়
রুদ্ধ কণ্ঠে শূন্যে তাকায়,
হারানো ভাষার নিশার স্বপ্নছায়ে
হেরিনু তোমায়, আসিনু ক্লান্ত পায়ে।

শুধু দুটি তরু মরুর প্রাণের কথা,
লুকানো কী রসে বাঁচে তার শ্যামলতা।
সেদিন তাহারি মর্মর সনে
কী ব্যথা মিশানু, জানে দুইজনে;
মাথার উপরে উড়ে গেল কোন্ পাখি
হতাশ পাখার হাহাকাররেখা আঁকি।

তপ্ত বালুরে ভর্ৎসিয়া মুহুমুহু
তাপিত বাতাস চিৎকারি উঠে হুহু;
ধূলির ঘূর্ণি, যেন বেঁকে বেঁকে
শাপ-লাগা প্রেত নাচে থেকে থেকে;
রূঢ় রুদ্র রিক্তের মাঝখানে
দুইটি প্রহর ভরেছিনু প্রাণে গানে।

দিন শেষ হল, চলে যেতে হল একা,
বলিনু তোমারে, আরবার হবে দেখা।
শুনে হেসেছিলে হাসিখানি ম্লান,
তরুণ হৃদয়ে যেন তুমি জান
অসীমের বুকে অনাদি বিষাদখানি
আছে সারাখন মুখে আবরণ টানি।

তার পরে কত দিন চলে গেল মিছে
একটি দিনেরে দলিয়া পায়ের নীচে।

বহু পরে যবে ফিরিলাম প্রিয়ে,
এ-পথে আসিতে দেখি চমকিয়ে
আছে সেই কূপ, আছে সে যুগলতরু।
তুমি নাই, আছে তৃষিত স্মৃতির মরু॥

এ কূপের তলে মোর যক্ষের ধন
একটি দিনের দুর্লভ সেইখন
চিরকাল ভরি' রহিল লুকানো,
ওগো অগোচরা জান নাহি জান ;
আর কোনো দিনে অন্য যুগের প্রিয়া
তারে আর কারে দিবে কি উদ্ধারিয়া।

১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

মহুয়া

বিরক্ত আমার মন কিংশুকের এত গর্ব দেখি'।
নাহি ঘুচিবে কি
অশোকের অতিখ্যাতি, বকুলের মুখর সম্মান।
ক্লান্ত কি হবে না কবিগান
মালতীর মল্লিকার
অভ্যর্থনা রচি' বারম্বার ?
রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
উচ্চশিরে তবু রাজকুলবনিতার
গৌরব রাখিস ঊর্ধ্বে ধরে।
আমি তো দেখেছি তোরে
বনস্পতিগোষ্ঠী-মাঝে অরণ্যসভায়
অকুণ্ঠিত মর্যাদায়
আছিস দাঁড়ায়ে ;
শাখা যত আকাশে বাড়ায়ে

শাল তাল সপ্তপর্ণ অশ্বত্থের সাথে
প্রথম প্রভাতে
সূর্য-অভিনন্দনের তুলেছিস গম্ভীর বন্দন।
অপ্রসন্ন আকাশের ভ্রূভঙ্গে যখন
অরণ্য উদ্বিগ্ন করি তোলে,
সেই কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ কলরোলে
শাখাব্যূহে ঘিরে
আশ্বাস করিস দান শঙ্কিত বিহঙ্গ অতিথিরে।
অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট দিনে,
বিশীর্ণ বিপিনে,
বন্যবুভুক্ষুর দল ফেরে রিক্ত পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরে তারা তোর সদাব্রতে

বহুদীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ় উন্নত
তপস্বীর মতো
বিলাসের চাঞ্চল্যবিহীন,
সুগম্ভীর সেই তোরে দেখিয়াছি অন্যদিন
অন্তরে অধীরা
ফাল্গুনের ফুলদোলে কোথা হতে জোগাস মদিরা
পুষ্পপুটে ;
বনে বনে মৌমাছিরা চঞ্চলিয়া উঠে।
তোর সুরাপাত্র হতে বন্যনারী
সম্বল সংগ্রহ করে পুর্ণিমার নৃত্যমত্ততারি।
রে অটল, রে কঠিন,
কেমনে গোপনে রাত্রিদিন
তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে।
কানে কানে কহি তোরে
বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৮
[জোড়াসাঁকো]

দীনা

তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহি নি,
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।
মোর স্পর্শে বাজে
যে-তন্ত্রটি তোমার বীণায়,
তাহারি পঞ্চম স্বরে তোমারে কি নিঃশেষে চিনায়
তোমার বসন্ত রাগে,
নিদ্রাহীন রজনীর পরজে বেহাগে।
সে-তন্ত্র সোনার বটে,— বিভাসে ললিতে
যে কথা সে চেয়েছে বলিতে
তাইতে হয়েছে পূর্ণ এ আমার জীবন-অঞ্জলি।
তবু সত্য করে বলি,
ব্যথা লাগে বুকে
যখন সহসা আসি তোমার সম্মুখে
নিভৃত তোমার ঘরে
স্বপ্নভাঙা প্রথম প্রহরে,—
যখন জাগে নি পাখি, রক্তিম আকাশে
আসন্ন অরণ্যগাথা নব সূর্যোদয়-আশে
রয়েছে স্তম্ভিত,
পিঙ্গল আভায় দীপ্ত জটা বিলম্বিত
অরুণ সন্ন্যাসী
করজোড়ে আছে স্থির আলোকপ্রত্যাশী,—
তখন তোমার মুখ চেয়ে দেখিয়াছি ভয়ে ভয়ে,
জেনেছি হৃদয়ে
তুমিই অচেনা।
কোনো দিন ফুরাবে না
পরিচয় ; তোমারে বুঝিব আমি করি না সে আশা,
কথায় যা বল নাই, আমি-যে জানি না তার ভাষা।

ভয় হয় পাছে
যে-সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে
সে-যে মোর নাই, তাই শেষে পড়ে ধরা,
দেখ দূর হতে এসে জলাশয়ে জল নাই ভরা।
তখন নিয়ো না যেন অপরাধ মোর,
হয়ো না কঠোর,
তুমি যদি মুগ্ধ মনে ভুলে থাক, তবু
গভীর দীনতা মোর গোপন করি নি আমি কভু।
মোর দ্বারে যবে এলে অন্যমনা
সে কি মোর কিছু নিয়ে পুরাতে কামনা।
নহে নহে, হে রাজন, তোমার অনেক ধন আছে,
তাই তুমি আস মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি;
যদি তাই পূর্ণ হয়, তবে আমি নহি তো অভাগী।

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

সৃষ্টিরহস্য

সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব,
নিখিলের অস্তিত্বগৌরব।
তুমি আছ, তুমি এলে,
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পদ্মের মতন।
অন্তহীন কাল আর অসীম গগন
নিদ্রাহীন আলো
কী অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলাল।
যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়,
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা

ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।
সেই সৃষ্টিতপস্তার সার্থক আনন্দ মোর চিতে
স্পর্শ করে, যবে তব মুখে মেলি' আঁখি
সম্মুখে তোমার বসে থাকি।

২০ অগস্ট ১৯২৮

নাম্নী

শামলী

সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে ;
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে ;
নুয়ে-পড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেরে
ছোটো করে রাখে আকাশেরে।
জগৎ সামান্য তার, তারি ধূলি-'পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে,
মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।
গৃহকোণে ছোটো দীপ জ্বালায় নেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।
স্নান সাঙ্গ করি এলোচুলে
অপরাজিতার ফুলে
প্রভাতে নীরব নিবেদনে
স্তব করে একমনে।
মধ্যদিনে বাতায়নতলে
চেয়ে দেখে নিম্নে দিঘিজলে
শৈবালের ঘনস্তর,
পতঙ্গের খেলা তারি 'পর।

আবছায়া কল্পনায়
ভাষাহীন ভাবনায়
মন তার ভরে
মধ্যাহ্নের অব্যক্ত মর্মরে।
সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
ঘট কাঁখে
বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি',—
নাম কি শামলী।

কাজলী

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মতো,
তৃষ্ণাহরা
আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা।
সে যেন গো তমালের ছায়াখানি,
অবগুণ্ঠনের তলে পথ-চাওয়া আতিথ্যের বাণী।
যে-পথিক একদিন আসিবে দুয়ারে
ক্লিষ্ট ক্লান্তিভারে,
সেই অজানার লাগি গৃহকোণে আনতনয়ন
বুনিছে শয়ন।
সে যেন গো কাকচক্ষু স্বচ্ছ দিঘিজল
অচঞ্চল,
কানায় কানায় ভরা,
শীতল অতল-মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা।
কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
থমকিয়া আছে

স্তব্ধ ছায়া পাতি'
হাসির খেলার সাথী
সুগভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি ;
যেন তাহা দেবতারি
করুণা-অঞ্জলি,—
নাম কি কাজলী।

হেঁয়ালী

যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।
নূতন ধাঁধায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তারে,
কেবলি আলো-আঁধারে
সংশয় বাধায় ;
ছল-করা অভিমানে বৃথা সে সাধায়।
সে কি শরতের মায়া
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া।
অনুকূল চাহনির তলে
কী বিদ্যুৎ ঝলে।
কেন দয়িতের মিনতিকে
অভাবিত উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে।
তার পরে আপনার নির্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ ;
আপনার অভিমানে করে খানখান।
কেন তার চিত্তাকাশে সারা বেলা
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা।
আপনি সে পারে না বুঝিতে
যেদিকে চলিতে চায় কেন তার চলে বিপরীতে।
গভীর অন্তরে
যেন আপনার অগোচরে

আপনার সাথে তার কী আছে বিরোধ,
অন্যেরে আঘাত করে আত্মঘাতী ক্রোধ ;
মুহূর্তেই বিগলিত করুণায়
অপমানিতের পায়
প্রাণমন দেয় ঢালি,—
নাম কি হেঁয়ালী।

খেয়ালী

মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে
সুদূর গগনে
কী দেখে সে ধানের খেতের পরপারে,—
নিরালা নদীর পথে দিগন্তে সবুজ অন্ধকারে
যেখানে কাঁঠাল জাম নারিকেল বেত
প্রসারিয়া চলেছে সংকেত
অজানা গ্রামের,
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু অখ্যাত নামের।
অপরাহ্নে ছাদে বসি',
এলোচুল বুকে পড়ে খসি,
গ্রন্থ নিয়ে হাতে
উদাস হয়েছে মন সে-যে কোন্ কবিকল্পনাতে।
সুদূরের বেদনায়
অতীতের অশ্রুবাষ্প হৃদয়ে ঘনায়।
বীরের কাহিনী
না-দেখা জনের লাগি তারে যেন করে বিরহিণী।
পূর্ণিমানিশীথে
স্রোতে-ভাসা একা তরী যবে সকরুণ সারিগীতে
ছায়াঘন তীরে তীরে সুপ্তিতে সুরের ছবি আঁকে,
উৎসুক আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে

নিষুপ্ত প্রহরে,
অহৈতুক বারিবিন্দু ঝরে
আঁখিকোণে ;
যুগান্তরপার হতে কোন্ পুরাণের কথা শোনে।
ইচ্ছা করে সেই রাতে
লিপিখানি লেখে ভূর্জপাতে
লেখনীতে ভরি লয়ে দুঃখে-গলা কাজলের কালি,—
নাম কি খেয়ালী।

কাকলী

কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ,—
নিত্য বহমান
ভাষার কল্লোলে
জাগাইয়া তোলে
চারিধারে
প্রত্যহের জড়তারে ;
সংগীতে তরঙ্গ তুলি,
হাসিতে ফেনিল তার ছোটো দিনগুলি
আঁখি তার কথা কয়, বাহুভঙ্গী কত কথা বলে,
চরণ যখন চলে
কথা কয়ে যায়—
যে-কথাটি অরণ্যের পাতায় পাতায়,
যে-কথাটি ঢেউ তোলে
আশ্বিনে ধানের খেতে— প্রান্ত হতে প্রান্তে যায় চলে,
যে-কথাটি নিশীথতিমিরে
তারায় তারায় কাঁপে অধীর ঝির্ঝিরে,
যে-কথাটি মহুয়ার বনে
মধুপগুঞ্জনে
সারাবেলা উঠিছে চঞ্চলি,—
নাম কি কাকলী।

পিয়ালী

চাহনি তাহার, সব কোলাহল হ'লে সারা
সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা।
মৌনখানি সুমধুর মিনতিরে
লতায়ে লতায়ে যেন মনের চৌদিকে দেয় ঘিরে,
নির্বাক চাহিয়া থাকে নাহি পায় ভেবে
কেমন করিয়া কী-যে দেবে।
দুয়ার-বাহিরে
আসে ধীরে,
ক্ষণেক নীরব থেকে চলে যায় ফিরে।
নাও যদি কয় কথা
মনে যেন ভরি দেয় সুস্নিগ্ধ মমতা।
পায়ের চলায়
কিছু যেন দান করে ধূলির তলায়।
তারে কিছু করিলে জিজ্ঞাসা,
কিছু বলে, কিছু তবু বাকি থাকে ভাষা।
নিঃশব্দে খুলিয়া দ্বার
অঞ্চলে আড়াল করি সে যেন কাহার
আনিয়াছে সৌভাগ্যের থালি,—
নাম কি পিয়ালী।

দিয়ালী

জনতার মাঝে
দেখিতে পাই নে তারে, থাকে তুচ্ছ সাজে।
ললাটে ঘোমটা টানি
দিবসে লুকায়ে রাখে নয়নের বাণী।
রজনীর অন্ধকার
তুলে দেয় আবরণ তার।

রাজরানীবেশে
অনায়াসগৌরবের সিংহাসনে বসে মৃদু হেসে।
বক্ষে হার ঝলমলে,
সীমন্তে অলকে জ্বলে
মাণিক্যের সীঁথি।
কী যেন বিস্মৃতি
সহসা ঘুচিয়া যায়, টুটে দীনতার ছদ্মসীমা,
মনে পড়ে আপন মহিমা।
ভক্তেরে সে দেয় পুরস্কার
বরমাল্য তার
আপন সহস্র দীপ জ্বালি,—
নাম কি দিয়ালী।

নাগরী

ব্যঙ্গসুনিপুণা,
শ্লেষবাণসন্ধানদারুণা।
অনুগ্রহবর্ষণের মাঝে
বিদ্রূপবিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে।
সে যেন তুফান
যাহারে চঞ্চল করে সে-তরীকে করে খানখান
অট্টহাস্য আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে ;
প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে
রেখেছে সে কণ্টক-অঙ্কুর বুনে বুনে ;
অদৃশ্য আগুনে
কুঞ্জ তার বেড়িয়াছে ;
যারা আসে কাছে
সব থেকে তারা দূরে রয় ;

মোহমন্ত্রে যে-হৃদয়
করে জয়
তারি 'পরে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দয়।
আপন তপস্যা লয়ে যে-পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে।
বিদুষী নিয়েছে বিদ্যা শুধু চিত্তে নয়,
আপন রূপের সাথে ছন্দ তারে দিল অঙ্গময়
বুদ্ধি তার ললাটিকা,
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা ;
বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহংকার।
বিদ্যারে করেছে অলংকার।
প্রসাধনসাধনে চতুরা,
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণভঙ্গীতে,
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।
জাদুকরী বচনে চলনে ;
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে ;
অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
নিন্দা তার করি দেয় দূর ;
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন।
আঁধার-আলোরি কোলে রয়েছে জাগরি,—
নাম কি নাগরী।

সাগরী

বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে
উচ্ছলিয়া উঠে জেগে,—
উচ্চহাস্যতরঙ্গ সে হানে
সূর্যচন্দ্র-পানে।
পাঠায় অস্থির চোখ—
আলোকের উত্তরে আলোক।
কভু অন্ধকারপুঞ্জে দেখা দেয় ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি,
ক্ষণে ক্ষণে
আন্দোলনে
প্রচণ্ড অধৈর্যবেগে তটের মর্যাদা ফেলে টুটি।
গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর,
কোথা তল, কোথা তীর;
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি,—
নাম কি সাগরী।

জয়ন্তী

যেন তার চক্ষু-মাঝে
উদ্যত বিরাজে
মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনী।
ইন্দ্রের অশনি
মৌনে তার ঢাকা;
প্রাণ তার অরুণের পাখা
মেলিল দিনের বক্ষে তীব্র অতৃপ্তিতে
দুঃসহ দীপ্তিতে।
সাধক দাঁড়ায় তার কাছে—
সহসা সংশয় লাগে যোগ্যতা কি আছে;
দুঃসাধ্যসাধন-তরে
পথ খুঁজে মরে।

তুচ্ছতারে দাহে তার অবজ্ঞাদহন ;
এনেছে সে করিয়া বহন
ইন্দ্রাণীর গাঁথা মাল্য ; দিবে কণ্ঠে তার
কার্মুকে যে দিয়েছে টংকার,
কাপট্যেরে হানিয়াছে সত্যে যার ঋণী বসুমতী,—
নাম কি জয়তী।

ঝামরী

সে যেন খসিয়া-পড়া তারা,
মর্ত্যের প্রদীপে নিল মৃত্তিকার কারা।
নগরে জনতামরু,
সে যেন তাহারি মাঝে পথপ্রান্তে সঙ্গিহীন তরু,
তারে ঢেকে আছে নিতি
অরণ্যের সুগভীর স্মৃতি।
সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়,
শিশিরে কুণ্ঠিত হয়ে রয়।
মন পাখা মেলিবারে চায়
চারিদিকে ঠেকে যায়,
জানে না কিসের বাধা তার ;
অদৃষ্টের মায়াদুর্গদ্বার
কোন্ রাজপুত্র এসে
মন্ত্রবলে ভেঙে দেবে শেষে।
আকাশে আলোতে
নিমন্ত্রণ আসে যেন কোথা হতে,
পথ রুদ্ধ চারিধারে,
মুখ ফুটে বলিতে না পারে
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা।
সে যেন অশোকবনে সীতা,

চারিদিকে যারা আছে কেহ তার নহেক স্বকীয় ;
কে তারে পাঠাবে অঙ্গুরীয়
বিচ্ছেদের অতল সমুদ্রপারে ;
আঁখি তুলে তাই বারে বারে
চেয়ে দেখে নিরুত্তর নিঃশব্দ গগনে।

কোন্ দেব নিত্যনির্বাসনে
পাঠাল তাহারে।
স্বর্গের বীণার তারে
সংগীতে কি করেছিল ভুল।
মহেন্দ্রের-দেওয়া ফুল
নৃত্যকালে খসে গেলে অন্যমনে দলেছিল কভু ?
আজো তবু
মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো,
অধরে রয়েছে তার ম্লান—
সন্ধ্যার গোলাপসম—
মাঝখানে-ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনুপম।
অদৃশ্য যে-অশ্রুধারা
আবিষ্ট করেছে তার চক্ষুতারা,
তাহা দিব্য বেদনার করুণানির্ঝরী,—
নাম কি ঝামরী।

মুরতি

যে-শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা,
যে-গুণী প্রজাপতির পাখা
যুগ যুগ ধ্যান করি একদা কী খনে
রচিল অপূর্ব চিত্রে বিচিত্র লিখনে,
এই নারী
রচনা তাহারি।

এ শুধু কালের খেলা
এর দেহ কী আলস্যে বিধাতা একেলা
রচিলেন সন্ধ্যাকালে
আপনার অর্থহীন ক্ষণিক খেয়ালে—
যে-লগনে
কর্মহীন ক্লান্তক্ষণে
মেঘের মহিমামায়া মুহূর্তেই মুগ্ধ করি আঁখি
অন্ধরাত্রে বিনা ক্ষোভে যায় মুখ ঢাকি।
শরতে নদীর জলে যে-ভঙ্গিমা,
বৈশাখে দাড়িম্ববনে যে-রাগরঙ্গিমা
যৌবনের দাপে
অবজ্ঞাকটাক্ষ হানে মধ্যাহ্নের তাপে,
শ্রাবণের বন্যাতলে হারা
ভেসে-যাওয়া শৈবালের যে-নৃত্যের ধারা,
মাঘশেষে অশ্বত্থের কচি পাতাগুলি
যে-চাঞ্চল্যে উঠে দুলি,
হেমন্তের প্রভাতবাতাসে
শিশিরে যে-ঝিলিমিলি ঘাসে ঘাসে,
প্রথম আষাঢ়দিনে গুরু গুরু রবে
ময়ূরের পুচ্ছপুঞ্জ উল্লসিয়া উঠে যে-গৌরবে
তাই দিয়ে রচিত সুন্দরী ;—
লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি।

রঙিন বুদ্‌বুদ সে কি, ইন্দ্রধনু বুঝি,
অন্তর না পাই খুঁজি—
সকলি বাহির,
চিত্ত অগভীর।
কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে,
কারে-না-পাওয়ার দুঃখ মনে নাহি রাখে

মুগ্ধ প্রাণ-উপহার
অনায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তার।
ভুবনে যেখানে যত নয়নের আনন্দলহরী
তাই দেখা দিতে এল নারীমূর্তি ধরি।
সরস্বতী রচিলেন মন তার কোন্ অবসরে
রাগহীন বাণীহীন গুঞ্জনের স্বরে;
অমৃতে মাটিতে মেশা সৃজনের এ কোন্ সুরতি,—
নাম কি মুরতি।

মালিনী

হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
সখীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে।
প্রসন্নতা তার অন্তহীন
রাত্রিদিন
গভীর কী উৎস হতে
উচ্ছলিছে আলোঝলা কথাবলা স্রোতে।
মর্ত্যের ম্লানতা তারে
পারে নি তো স্পর্শ করিবারে।
প্রভাতে সে দেখা দিলে মনে হয় যেন সূর্যমুখী
রক্তারুণ উল্লাসে কৌতুকী।
মধ্যাহ্নের স্থলপদ্ম অমলিন রাগে
প্রফুল্ল সে সূর্যের সোহাগে,
সায়াহ্নের জুঁই সে-যে,
গন্ধে যার প্রদোষের শূন্যতায় বাঁশি ওঠে বেজে।
মৈত্রীসুধাময় চোখে
মাধুরী মিশায়ে দেয় সন্ধ্যাদীপালোকে।
রজনীগন্ধা সে রাতে, দেয় পরকাশি
আনন্দহিল্লোল রাশি রাশি;
সঙ্গহীন আঁধারের নৈরাশ্যক্ষালিনী,—
নাম কি মালিনী।

করুণী

তরুলতা
যে-ভাষায় কয় কথা
সে-ভাষা সে জানে,—
তৃণ তার পদক্ষেপ দয়া বলি মানে।
পুষ্পপল্লবের 'পরে তার আঁখি
অদৃশ্য প্রাণের হর্ষ দিয়ে যায় রাখি।
স্নেহ তার আকাশের আলোর মতন
কাননের অন্তরবেদন
দূর করিবার লাগি
নিত্য আছে জাগি।
শিশু হতে শিশুতর
গাছগুলি বোবা প্রাণে ভর-ভর ;
বাতাসে বৃষ্টিতে
চঞ্চলিয়া জাগে তারা অর্থহীন গীতে,
ধরণীর যে-গভীরে চিররসধারা
সেইখানে তারা
কাঙাল প্রসারি ধরে তৃষিত অঞ্জলি,
বিশ্বের করুণারাশি শাখায় শাখায় উঠে ফলি ;—
সে-তরুলতারি মতো স্নিগ্ধ প্রাণ তার ;
শ্যামল উদার
সেবা যত্ন সরল শান্তিতে
ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া আছে চারিভিতে ;
তাহার মমতা
সকল প্রাণীর 'পরে বিছায়েছে স্নেহের সমতা ;
পশু পাখি তার আপনার ;
জীববৎসলার
স্নেহ ঝরে শিশু-'পরে, বনে যেন নত মেঘভার
ঢালে বারিধার।

তরুণ প্রাণের 'পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী,—
নাম কি করুণী।

প্রতিমা

চতুর্দশী এল নেমে
পূর্ণিমার প্রান্তে এসে গেল থেমে।
অপূর্ণের ঈষৎ আভাসে
আপন বলিতে তারে মর্ত্যভূমি শঙ্কা নাহি বাসে।
এ ধরার নির্বাসনে
কুণ্ঠার গুণ্ঠন নাই, ভীরুতা নাইক তার মনে,
সংসারজনতা মাঝে
আপনাতে আপনি বিরাজে।
দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য তার প্রফুল্লতা-ভরা,
সকল উদ্বেগভারহরা।
রোগ যদি আসে রুখে
সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে।
দুর্যোগ মেঘের মতো
নীচে দিয়ে বহে যায় কত
বারে বারে,
প্রভা তার মুছিতে না পারে।
তবু তার মহিমায় কিছু আছে বাকি,
সেইখানে রাখে ঢাকি
অশ্রুজল
বিষাদ-ইঙ্গিতে-ছোঁওয়া ঈষৎ বিহ্বল।
কণামাত্র সে-ক্ষীণতা
নাহি কহে কথা,
কেহ না দেখিতে পায়
নিত্য যারা ঘিরে আছে তায়।

অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা,—
নাম কি প্রতিমা।

নন্দিনী

প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি
অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি।
বর্ষা-অন্তে ইন্দ্রধনু
মর্ত্যে নিল তনু।
দিগ্বধূর মায়াবী অঙ্গুলি
চঞ্চল চিন্তায় তার বুলায়েছে বর্ণ-আঁকা তুলি।
সরল তাহার হাসি, সুকুমার মুঠি
যেন শুভ্র কমলকলিকা ;
আঁখিদুটি
যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।
অবসাদবন্ধভাঙা মুক্তির সে ছবি,
সে আনিয়া দেয় চিত্তে
কলনৃত্যে
দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দজাহ্নবী।
বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সংগীতস্পন্দিনী,—
নাম কি নন্দিনী।

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫

উষসী

ভোরের আগের যে-প্রহরে
স্তব্ধ অন্ধকার-'পরে
সুপ্তি-অন্তরাল হতে দূর সূর্যোদয়
বনময়

পাঠায় নূতন জাগরণী,
অতি মৃদু শিহরণী
বাতাসের গায়ে ;
পাখির কুলায়ে
অস্পষ্ট কাকলি ওঠে আধোজাগা স্বরে,
স্তম্ভিত আগ্রহভরে
অব্যক্ত বিরাট আশা ধ্যানে মগ্ন দিকে দিগন্তরে,—
ও কোন্ তরুণ প্রাণে করিয়াছে ভর,
অন্তর্গূঢ় সে-প্রহর
আত্ম-অগোচর।
চিত্ত তার আপনার গভীর অন্তরে
নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাগি।
সুপ্তি-মাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি
নির্মল নির্ভয়
কোন্ দিব্য অভ্যুদয়।
কোন্ সে পরমা মুক্তি, কোন্ সেই আপনার
দীপ্যমান মহা আবিষ্কার।
প্রভাতমহিমা ওর সম্বৃত রয়েছে নিশ্চেতনে,
তাহারি আভাস পাই মনে।
আমি ওই রথশব্দ শুনি,
সোনার বীণার তারে সংগীত আনিছে কোন্ গুণী।
জাগিবে হৃদয়,
ভুবন তাহার হবে বাণীময় ;
মানসকমল একমনা
নবোদিত তপনের করিবে প্রথম অভ্যর্থনা।
জাগিবে নূতন দিবা উজ্জ্বল উল্লাসে
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে মহোৎসবে তার চারিপাশে।
নিরুদ্ধ চেতনা হতে হবে চ্যুত
লালসা-আবেশে জড়ীভূত
স্বপ্নের শৃঙ্খলপাশ।

বিলুপ্ত করিবে দূরে উন্মুক্ত বাতাস
দুর্বল দীপের গাঢ় বিষতপ্ত কলুষনিশ্বাস।
আলোকের জয়ধ্বনি উঠিবে উচ্ছ্বসি,—
নাম কি উষসী।

[শ্রাবণ ?-আশ্বিন ১৩৩৫]

ছায়ালোক

যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,
যেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা,
আমি সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি,
সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা।
সেথায় তোমার বুদ্ধি সদাই জাগে,
চক্ষে তোমার আবেশ নাহি লাগে,
আমার ভীরু হৃদয় ছায়া মাগে,
তোমার সেথায় আলোক খরতর,
যখন সেথা চাহ আমার বাগে
সংকোচে প্রাণ কাঁপে থর থর।

মোহভাঙা দৃষ্টি তোমার যখন আঘাত হানে,
যায় নিখিলের রহস্যদ্বার টুটে,
এক নিমেষে অপরূপের রূপের মধ্যখানে
অস্ত্র যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে উঠে।
বসুন্ধরার শ্যামল প্রাণের ঢাকা
রূঢ় পাথর গোপন ক'রে রাখা,
ভিতরে তার কতই আঁকাবাঁকা
কতকালের দাহন-ইতিহাসে,
ফাটলধরা কত-যে দাগ আঁকা
তোমার চোখে বাহির হয়ে আসে।

তেমনি করে যখন কভু আমার পানে চাবে
মর্ম্মভেদী কৌতূহলের আঁখি,
বিধাতা যা লুকান লাজে দেখতে-যে তাই পাবে
মোর রচনায় যা আছে তাঁর বাকি।
আমার মাঝে তোমার অগোচরে
আদিম যুগের গোপন গভীর স্তরে
অপূর্ণতা রয়েছে অন্তরে,
সৃষ্টি আমার অসমাপ্ত আছে,
সামনে এলে মরি-যে সেই ডরে
ভাঙাচোরা চক্ষে পড়ে পাছে।

তোমার প্রাণে কোনোখানে নাই কি মায়ার ঠাঁই
মত্ততাহীন তত্ত্বপরপারে,
যেথায় তীক্ষ্ণ চোখের কোনো প্রশ্ন জেগে নাই
অসতর্ক মুক্ত হৃদয়দ্বারে ?
যেথায় তুমি দৃষ্টিকর্ত্তা নহ,
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি লয়ে রহ,
যেথা নানা বর্ণের সংগ্রহ,
যেথা নানা মূর্তিতে মন মাতে,
যেথা তোমার অতৃপ্ত আগ্রহ
আপনভোলা রসের রচনাতে।

সেথায় আমি যাব যখন চৈত্ররজনীতে
বনের বাণী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা,
চাঁদের আলোয় ঘুম-হারানো পাখির কলগীতে
পথ-হারানো ফুলের রেণু মেশা।
দেখবে আমায় স্বপন-দেখা চোখে,
চমকে উঠে বলবে তুমি, ‘ও কে,

কোন্ দেবতার ছিল মানসলোকে,
এল আমার গানের ডাকে ডাকা'।
সে-রূপ আমার দেখবে ছায়ালোকে
যে-রূপ তোমার পরান দিয়ে আঁকা।

৯ আশ্বিন ১৩৩৫

প্রচ্ছন্ন

বিদেশে ঐ সৌধশিখর-'পরে
ক্ষণকালের তরে
পথ হতে-যে দেখেছিলেম, ওগো আধেক-দেখা,
মনে হল তুমি অসীম একা।
দাঁড়িয়েছিলে যেন আমার একটি বিজন খনে
আর কিছু নাই সেথায় ত্রিভুবনে।
সামনে তোমার মুক্ত আকাশ, অরণ্যতল নীচে,
ক্ষণে ক্ষণে ঝাউয়ের শাখা প্রলাপ মর্মরিছে।
মুখ দেখা না যায়,
পিঠের 'পরে বেণীটি লুটায়।
থামের পাশে হেলান-দেওয়া ঈষৎ দেখি আধখানি ঐ দেহ,
অসম্পূর্ণ কয়টি রেখায় কী যেন সন্দেহ।
বন্দিনী কি ভোগের কারাগারে,
ভাবনা তোমার উড়ে চলে দূর দিগন্তপারে?
সোনার বরন শস্যখেতে, কোন্-সে নদীতীরে
পূজারীদের চলার পথে, উচ্চচূড়া দেবতামন্দিরে
তোমার চিরপরিচিত প্রভাত-আলোখানি,
তারি স্মৃতি চক্ষে তোমার জল কি দিল আনি।

কিম্বা তুমি রাজেন্দ্রসোহাগী,
সেই বহুবল্লভের প্রেমে দ্বিধার দুঃখ হৃদয়ে রয় জাগি,

প্রশ্ন কি তাই শুধাও নক্ষত্রেরে
সপ্তঋষির কাছে তোমার প্রণামখানি সেরে।
হয়তো বৃথাই সাজ,
তৃপ্তিবিহীন চিত্ততলে তৃষ্ণা-অনল দহন করে আজো ;
তাই কি শূন্য আকাশ-পানে চাও,
উপেক্ষিত যৌবনেরি ধিক্কার জানাও ?

কিম্বা আছ চেয়ে
আসবে সে কোন্ দুঃসাহসী গোপন পন্থা বেয়ে,
বক্ষ তোমার দোলে,
রক্ত নাচে ত্রাসের উতরোলে।
স্তব্ধ আছে তরুশ্রেণী মরণছায়া-ঢাকা,
শূন্যে ওড়ে অদৃশ্য কোন্ পাখা।
আমি পথিক যাব-যে কোন্ দূরে ;
তুমি রাজার পুরে
মাঝে-মাঝে কাজের অবসরে
বাহির হয়ে আসবে হোথায় ঐ অলিন্দ-'পরে,
দেখবে চেয়ে অকারণে স্তব্ধ নেত্রপাতে
গোধূলিবেলাতে
বনের সবুজ তরঙ্গ পারায়ে
নদীর প্রান্তরেখায় যে-পথ গিয়েছে হারায়ে।
তোমার ইচ্ছা চলবে কল্পনাতে
সুদূর পথে আভাসরূপী সেই অজানার সাথে
পান্থ যে-জন নিত্য চলে যায়।
আমি পথিক হায়,
পিছন-পানে এই বিদেশের সুদূর সৌধশিরে
ইচ্ছা আমার পাঠাই ফিরে ফিরে
ছায়ায়-ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাতায়নে,
যে-মুখ তোমার লুকিয়ে ছিল সে-মুখ আঁকি মনে।

১০ আশ্বিন ১৩৩৫

দর্পণ

দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শুধাও একমনে
হে সুন্দরী, কী সংশয় জাগে তব উদ্বিগ্ন নয়নে।
নিজেরে দেখিতে চাও বাহিরে রাখিয়া আপনারে
যেন আর কারো চোখে; আর কারো জীবনের দ্বারে
খুঁজিছ আপন স্থান। প্রেমের অর্ঘ্যের কোনো ত্রুটি
দেখ কি মুখের কোনোখানে। তাই তব আঁখিদুটি
নিজেরে কি করিছে ভর্ৎসনা। সাজায়ে লইয়া সর্বদেহে
স্বর্গের গর্বের ধন, তবে যেতে চাও তার গেহে?
জান না কি হে রমণী, দর্পণে যা দেখিছ তা ছায়া,
পার না রচিতে কভু তাই দিয়ে চিরস্থায়ী মায়া।
তিলোত্তমা অনুপমা সুরেন্দ্রের প্রমোদপ্রাঙ্গণে
কঙ্কণঝংকারে আর নৃত্যলোল নূপুরনিক্বণে
নাচিয়া বাহিরে চলে যায়। লয়ে আত্মনিবেদন
গৌরবে জিনিলা শচী ইন্দ্রলোকে নন্দন-আসন।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৫

ভাবিনী

ভাবিছ যে-ভাবনা একা-একা
দুয়ারে বসি চুপে চুপে,
সে যদি সম্মুখে দিত দেখা
মূর্তি ধরি কোনো রূপে—
হয়তো দেখিতাম শুকতারা
দিবস পার হয়ে দিশাহারা
এসেছে সন্ধ্যার কিনারাতে
সাঁঝের তারাদের দলে,
উদাস স্মৃতিভরা আঁখিপাতে
উষার হিমকণা জ্বলে।

হয়তো দেখিতাম বাদলে যে
শ্রাবণে এনেছিল বাণী
শরতে জলভার এল ত্যেজে
শুভ্র সেই মেঘখানি।
চলে সে সন্ন্যাসী দিশে দিশে
রবির আলোকের পিয়াসী সে,
আকাশ আপনারি লিপি লিখে
পড়িতে দিল যেন তারে,
সে তাই চেয়ে চেয়ে অনিমিখে
বুঝিতে বুঝি নাহি পারে।

হয়তো দেখিতাম রজনীতে
সে যেন সুরহারা বীণা
বিজন দীপহীন দেহলিতে
মৌন-মাঝে আছে লীনা।
একদা বেজেছিল যে-রাগিণী
তারে সে ফিরে যেন নিল চিনি
তারার কিরণের কম্পনে
নীরব আকাশের মাঝে,
সুদূর সুরসভা-অঙ্গনে
সুরের স্মৃতি যেথা বাজে।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৫

একাকী

চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী,—
আপন নিঃশব্দ গানে আপনারি শূন্য দিল ঢাকি।
অয়ি একাকিনী,
অলিন্দে নিশীথরাত্রে শুনিছ সে জ্যোৎস্নার রাগিণী
চেয়ে শূন্যপানে,

যে-রাগিণী অসীমের উৎস হতে আনে
অনাদি বিরহরস, তাই দিয়ে ভরিয়া আঁধার
কোন্ বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার।
তারি সাথে মিলায়েছ তব দৃষ্টিখানি,
চোখে অনির্বচনীয় বাণী,
মিলায়েছ যেন তব জন্মান্তর হতে নিয়ে আসা
দীর্ঘনিশ্বাসের ভাষা।
মিলায়েছ, সুগম্ভীর দুঃখের মাঝারে
যে-মুক্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে।
অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে,
জনশূন্য তুষারশিখরে
কোন্ মহাশ্বেতা, কোন্ তপস্বিনী বিছাল অঞ্চল,
স্তব্ধ অচঞ্চল,
অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে উর্ধ্বে তুলি আঁখি,—
তুমিও একাকী।

১৮ আশ্বিন ১৩৩৫

আশীর্বাদ

জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে
হে নবীনা, নবরাগরক্তিম শোভাতে
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু তব
জ্যোতি আজি পেল অভিনব,
চেলাঞ্চলে উদ্ভাসিল অন্তরের দীপ্যমান প্রভা,
শরমের বৃন্তে তুমি আনন্দের বিকশিত জবা।

সাহানা রাগিণীরসে জড়িত আজি এ পুণ্যতিথি,
তোমার ভুবনে আসে পরম অতিথি।
আনো আনো মাঙ্গল্যের ভার,
দাও বধূ, খুলে দাও দ্বার,

তোমার অঙ্গনে হেরো সগৌরবে ওই রথ আসে,
সেই বার্তা আজি বুঝি উদ্‌ঘোষিল আকাশে বাতাসে।

নবীন জীবনে তব নববিশ্ব রচনার ভাষা
আজি বুঝি পুর্ণ হল লয়ে নব আশা।
সৃষ্টির সে আনন্দ-উৎসবে
তব শ্রেষ্ঠধন দিতে হবে,
সেই সৃষ্টিসাধনায় আপনি করিবে আবিষ্কার
তোমার আপনা-মাঝে লুকানো যে ঐশ্বর্যভাণ্ডার।

পথ কে দেখাল এই পথিকেরে তাহা আমি জানি,
ওই চক্ষুতারা তারে দ্বারে দিল আনি।
যে-সুর নিভৃতে ছিল প্রাণে
কেমনে তা শুনেছিল কানে,
তোমার হৃদয়কুঞ্জে যে-ফুল ছায়ায় ছিল ফুটে
তাহার অমৃতগন্ধ গিয়েছিল বন্ধ তার টুটে।

যদি পারিতাম আজি অলকার দ্বারীরে ভুলায়ে
হরিয়া অমূল্য মণি অলকেতে দিতাম দুলায়ে।
তবু মোর মন মোরে কহে
সে-দান তোমার যোগ্য নহে,
তোমার কমলবনে দিব আনি রবির প্রসাদ,
তোমার মিলনক্ষণে সঁপিব কবির আশীর্বাদ।

আশ্বিন ? ১৩৩৫

নববধূ

চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।
কোন্ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্ ঘাটে হে বধূবেশিনী,
ওগো বিদেশিনী।
উৎসবের বাঁশিখানি কেন-যে কে জানে
ভরেছে দিনান্তবেলা ম্লান মূলতানে,
তোমারে পরাল সাজ মিলি সখীদল
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল।

মৃদুস্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে
স্তিমিত বাতাসে যেন বলে—
'কত বধূ গিয়েছিল কতকাল এই স্রোত বাহি
তীরপানে চাহি।
ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেন নি কথা,
নিস্তব্ধ ছিলেন চেয়ে লজ্জাভয়ে নতা
তরুণী কন্যার পানে, তরী 'পরে ছিলেন গোপনে
তরণীর কাণ্ডারীর সনে।'

কোন্ টানে জানা হতে অজানায় চলে
আধো হাসি আধো অশ্রুজলে!
ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে
অচেনার ধারে।
ওপারের গ্রাম দেখো আছে ঐ চেয়ে,
বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে,
ওই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ষ বর্ষ ধরি
ভিড়ায়েছে ভাগ্যভীরু তরী

জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্যপ্রবাহিনী।
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম-উপহার
রেখে গেল তার।
আপনার প্রাণসূত্রে যুগ যুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি স্বাক্ষর,
ব্যথা যদি পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তার ক্ষত,
লভিল মৃত্যুর সদাব্রত।

তাই আজি গোধূলির নিস্তব্ধ আকাশ
পথে তব বিছাল আশ্বাস।
কহিল সে কানে কানে, প্রাণ দিয়ে ভরা যার বুক
সেই তার সুখ।
রয়েছে কঠোর দুঃখ রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ
যদি বলে যাও বধূ, 'আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো।'

১৯ আশ্বিন ১৩৩৫

পরিণয়

শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বেলে,
মিলনের সুধা পরম ভাগ্যে মেলে।
একার ভিতরে একের দেখা না পাই,
দুজনার যোগে পরম একের ঠাঁই,
সে-একের মাঝে আপনারে খুঁজে পেলে।

আপনারে দান সেই তো চরম দান,
আকাশে আকাশে তারি লাগি আহ্বান।

ফুলবনে তাই রূপের তুফান লাগে,
নিশীথে তারায় আলোর ধেয়ান জাগে,
উদয়সূর্য গাহে জাগরণী গান।

নীরবে গোপনে মর্ত্যভুবন-'পরে
অমরাবতীর সুরসুরধুনী ঝরে।
যখনি হৃদয়ে পশিল তাহার ধারা
নিজেরে জানিলে সীমার বাঁধন হারা,
স্বর্গের দীপ জ্বলিল মাটির ঘরে।

আজি বসন্ত চিরবসন্ত হ'ক
চিরসুন্দরে মজুক তোমার চোখ।
প্রেমের শান্তি চিরশান্তির বাণী
জীবনের ব্রতে দিনে রাতে দিক আনি,
সংসারে তব নামুক অমৃতলোক।

আশ্বিন ? ১৩৩৫

মিলন

সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে
দুটিরে মিলানো নিয়ে খেলা।
রেণুলিপি বহি বায়ু প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে
কবে হবে ফুটিবার বেলা।
তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা শাখায় শাখায়,
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায়,
পাখির সংগীত সাথে বন হতে বনান্তরে ধায়
উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা।

সৃষ্টির সে-রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে
দুজনায় গ্রন্থির বাঁধন।
অপূর্ব জীবন তাহে জাগিবে বিচিত্র রূপ লয়ে
বিধাতার আপন সাধন।
ছেড়েছে সকল কাজ, রঙিন বসনে ওরা সেজে
চলেছে প্রান্তর বেয়ে, পথে পথে বাঁশি চলে বেজে,
পুরানো সংসার হতে জীর্ণতার সব চিহ্ন মেজে
রচিল নবীন আচ্ছাদন।

যাহা সবচেয়ে সত্য সবচেয়ে খেলা যেন তাই,
যেন সে ফাল্গুনকলোল্লাস।
যেন তাহা নিঃসংশয়, মর্তের ম্লানতা যেন নাই,
দেবতার যেন সে উচ্ছ্বাস।
সহজে মিশেছে তাই আত্মভোলা মানুষের সনে
আকাশের আলো আজি গোধূলির রক্তিম লগনে,
বিশ্বের রহস্যলীলা মানুষের উৎসবপ্রাঙ্গণে
লভিয়াছে আপন প্রকাশ।

বাজা তোরা বাজা বাঁশি, মৃদঙ্গ উঠুক তালে মেতে
দুরন্ত নাচের নেশা পাওয়া।
নদীপ্রান্তে তরুগুলি ঐ দেখ্ আছে কান পেতে,
ঐ সূর্য চাহে শেষ চাওয়া।
নিবি তোরা তীর্থবারি সে-অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্তকালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে, তরঙ্গিত সংগীত উৎসাহে
জাগায় প্রাণের মত্ত হাওয়া।

সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।
প্রাণদেবতার হাতে জয়টিকা পরেছে সে ভালে,
সূর্যতারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে,
সৃষ্টির প্রথম বাণী যে-প্রত্যাশা আকাশে জাগালে
তাই এল করিয়া বহন।

২০ আশ্বিন ১৩৩৫

বন্দিনী

তুমি বনের পুব পবনের সাথী,
বাদল মেঘের পথে তোমার ডানার মাতামাতি।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
খাঁচার কোণে এই বিজনে আপন মনে থাকি।
হায় অজানা, জানি না সে
উধাও তুমি কোন্ আকাশে,
কোন্ তমালের কাননতলে মধ্যদিনের তাপে
বনচ্ছায়ার শিরায় শিরায় তোমারি সুর কাঁপে।

কোন্ রঙনে রঙিন তোমার পাখা?
তোমার সোনার বরনখানি ভাবনাতে মোর আঁকা।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
মুক্তরূপের ধ্যানের ছায়ায় মগ্ন আমার আঁখি।
বন্দী মনের বদ্ধ ডানা,
চতুর্দিকে কঠোর মানা,
তোমার সাথে উড়ে চলার মিলন মাগি মনে,—
শূন্যে সদাই গান ফেরে তাই অসীম অন্বেষণে।

গান গাওয়া মোর সেই মিলনের খেলা,
তোমার গানের ছন্দে আমার স্বপন পাখা মেলা।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
মনে মনে তোমায় পরাই গানের গাঁথন রাখি।
আজি আমার সুরের মাঝে
দূরের ডানার শব্দ বাজে,
মেঘের পথিক গানে আমার এল প্রাণের কূলে,
বিরহেরি আকাশতলে নিল আমায় তুলে।

গানের হাওয়ায় নিকট মিলায় দূরে—
দূর আসে সেই হাওয়ায় প্রাণের নিকট অন্তঃপুরে।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
তোমার গানের মরীচিকায় শূন্য যে দাও ঢাকি।
বাঁধনে তাই জাদু লাগে,
বীণার তারে মূর্তি জাগে,
রাগিণীতে মুক্তি সে দেয়, ওগো আমার দূর,
তোমার দেওয়া না-শোনা গান বাঁধে যে তার সুর।

৫ কার্তিক ১৩৩৫

গুপ্তধন

আরো কিছুখন না-হয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরৎ-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,

দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক বলো বলো,—
সে মোর অগম অন্তর-পারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো।

দ্বিধাভরে আজো প্রবেশ কর নি ঘরে,
বাহির-আঙনে করিলে সুরের খেলা,
জানি না কী নিয়ে যাবে-যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষবিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে-গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে
হে পথিক, বলো বলো,—
সে-বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত-আগুনে প্রাণে মোর জ্বলোজ্বলো।

১৪ কার্তিক ১৩৩৫

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি ; বসন্তের আনন্দভাণ্ডার
তখনো হয় নি নিঃস্ব ; আমার বরণপুষ্পহার
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার। হে অধীর,
কোন্ অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্ভ্রান্ত সমীর
এনেছিল চিত্তে তব। তুমি গেলে বাঁশি লয়ে হাতে,
ফিরে দেখ নাই চেয়ে আমি বসে আপন বীণাতে
বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্তপঞ্চমে ;
আমার অঙ্গনতলে আলো আর ছায়ার সংগমে
কম্পমান আম্রতরু করেছিল চাঞ্চল্য বিস্তার
সৌরভবিহ্বল শুক্লরাতে। সেই কুঞ্জগৃহদ্বার

এতকাল মুক্ত ছিল। প্রতিদিন মোর দেহলিতে
আঁকিয়াছি আলিপনা। প্রতিসন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধতৈলে জ্বালায়েছি দীপ। আজি কতকাল পরে
যাত্রা তব হল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ-লিখন—
আমারে আড়াল করে আমারে করিবে অন্বেষণ ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণদ্বারে
যে-পথ করিলে শুরু সে-পথের এখানেই শেষ।
হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ,
নাই অভিমানতাপ। করিব না ভর্ৎসনা তোমায় ;
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ ; আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহগুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান।
আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাম্বর ; আজিকার উৎসব নিরালা
সর্ব-আভরণহীন। আকাশেতে প্রতিপদ-চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে। দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা-বলা।

২৭ পৌষ ১৩৩৫

পুরাতন

যে-গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে-গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে। সেদিনের সাহানার সুর
আজি অসময়ে এসে অকারণে করিছে বিধুর
মধ্যাহ্নের আকাশেরে; দিগন্তের অরণ্যরেখায়
দূর অতীতের বাণী লিপ্ত আছে অস্পষ্ট লেখায়,
তাহারে ফুটাতে চাহে। পথভ্রান্ত করুণ গুঞ্জনে
মধু আহরিতে ফিরে, সেদিনের অকৃপণ বনে
যে-চামেলিবল্লী ছিল তারি শূন্য দানসত্র হতে।
ছায়াতে যা লীন হল তারে খোঁজে নিষ্ঠুর আলোতে।
শীতরিক্ত শাখা ছেড়ে পাখি গেছে সিন্ধুপারে চলি,
তারি কুলায়ের কাছে সে-কালের বিস্মৃত কাকলি
বৃথাই জাগাতে আসে। যে-তারকা অস্তে গেল দূরে
তাহারি স্পন্দন ও-যে ধরিয়া এনেছে নিজ সুরে।

পৌষ ? ১৩৩৫

ছায়া

আঁখি চাহে তব মুখ-পানে,
তোমারে জেনেও নাহি জানে।
কিসের নিবিড় ছায়া
নিয়েছে স্বপনকায়া
তোমার মর্মের মাঝখানে।

হাসি কাঁপে অধরের শেষে
দূরতর অশ্রুর আবেশে।

বসন্তকূজিত রাতে
তোমার বাণীর সাথে
অশ্রুত কাহার বাণী মেশে।

মনে তব গুপ্ত কোন্ নীড়ে
অব্যক্ত ভাবনা এসে ভিড়ে।
বসন্তপঞ্চম রাগে
বিচ্ছেদের ব্যথা লাগে
সুগভীর ভৈরবীর মীড়ে।

তোমার শ্রাবণপূর্ণিমাতে
বাদল রয়েছে সাথে সাথে।
হে করুণ ইন্দ্রধনু,
তোমার মানসী তনু
জন্ম নিল আলোতে ছায়াতে।

অদৃশ্যের বরণের ডালা,
প্রচ্ছন্ন প্রদীপ তাহে জ্বালা।
মিলন নিকুঞ্জতলে
দিয়েছ আমার গলে
বিরহের সূত্রে গাঁথা মালা।

তব দানে ওগো আনমনা,
দিয়ো মোরে তোমার বেদনা।
যে-বন কুয়াশাছাওয়া
ঝরা ফুল সেথা পাওয়া,
থাক্ তাহে শিশিরের কণা।

৫ ভাদ্র ১৩৩৬

বাসরঘর

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙেচোরে
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন ;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল।
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রীমাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার-পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

বিচ্ছেদ

রাত্রি যবে সাঙ্গ হল, দূরে চলিবারে
দাঁড়াইলে দ্বারে।
আমার কণ্ঠের যত গান
করিলাম দান।

তুমি হাসি
মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি।
তার পরদিন হতে
বসন্তে শরতে
আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ

আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর

বিদায়

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন

ওগো বন্ধু, সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল,—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহুদূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।

ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি
মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত-মুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হ'ক তব সন্ধ্যাবেলা।
পূজার সে-খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে ;
তৃষার্ত আবেগবেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।

তোমার মানসভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে
আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।

ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

২৫ জুন ১৯২৮
ব্যাঙ্গালোর। বাঙ্গালোর

প্রণতি

কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্যপথের ধূলিরে।
আজ যবে
দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

এবার তোমার আগমন
হোমহুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

লহো এ প্রণাম—
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি-'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে।
তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে,
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

নৈবেদ্য

তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে; কিছু আর নাহি বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীনকান্না, নাই গর্বহাসি,
নাই পিছে ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

অশ্রু

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

অন্তর্ধান

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম-আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছ দান।
বিচ্ছেদেরি হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে

২৬ আষাঢ় ১৩৩৫
[শান্তিনিকেতন]

বিরহ

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল,
ব্যথায় নিবিড় হল শেষ বাক্য বলিবার কাল।

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
শান্ত হল শেষ দেখা,— নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে।
ধীরে ধীরে বনান্তে মিলাল
প্রান্তরের প্রান্ততটে অস্তশেষ ক্ষীণ পাংশু আলো।

যে-দ্বার খুলিয়া গেলে রুদ্ধ সে হবে না কোনোমতে।
কান পাতি রবে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে,—
তোমার অমূর্ত আসা-যাওয়া
যে-পথে চঞ্চল করে দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া।

বসন্তে মাঘের অন্তে আম্রবনে মুকুলমত্ততা
মধুপগুঞ্জনে মিশি আনে কোন্ কানে-কানে কথা।
মোর নাম তব কণ্ঠে ডাকা
শান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা।

সঙ্গহীন স্তব্ধতার সুগম্ভীর নিবিড় নিভৃতে
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতদিনে পাইনু শুনিতে
তুমি কবে মর্মমাঝে পশি
আপন মহিমা হতে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৫
[শান্তিনিকেতন]

বিদায়সম্বল

যাবার দিকের পথিকের 'পরে
ক্ষণিকার স্নেহখানি
শেষ উপহার করুণ অধরে
দিল কানে কানে আনি।
ভুলিব না কভু, রবে মনে মনে—
এই মিছে আশা দেয় খনে খনে,
ছলছল ছায়া নবীন নয়নে
বাধোবাধো মৃদু বাণী।

যাবার দিকের পথিক সে-কথা
ভরি লয় তার প্রাণে।
পিছনের এই শেষ আকুলতা
পাথেয় বলি সে জানে।
যখন আঁধারে ভরিবে সরণী,
ভুলে-ভরা ঘুমে নীরব ধরণী,
ভুলিব না কভু, এই ক্ষীণধ্বনি
তখনো বাজিবে কানে।

যাবার দিকের পথিক সে বোঝে—
যে যায় সে যায় চ'লে,
যারা থাকে তারা এ উহারে খোঁজে,
যে যায় তাহারে ভোলে।
তবুও নিজেরে ছলিতে ছলিতে
বাঁশি বাজে মনে চলিতে চলিতে
'ভুলিব না কভু' বিভাসে ললিতে
এই কথা বুকে দোলে।

১৯ অগস্ট ১৯২৭
সিঙাপুর

দিনান্তে

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে,
তাহাতে মোর যা হয় হ'ক ক্ষতি,
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হয়ে,
চরণে তব গোপনে তার গতি।
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল, ভরিল তব ডালি,
গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি,
প্রদীপ ছিল মলিনশিখা, ধোঁয়াতে ছিল কালি,
দীপ্ত হয়ে উঠিছে তার জ্যোতি।
বাহির হতে না যদি লও পূজার এই ডালি
চরণে তব গোপনে তার গতি।

না-হয় তুমি ওপারে থাকো, এপারে আমি থাকি
নীরব এই নীরস মরুতীরে,
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা নয়নে দেয় আঁকি
সুদূর তব উদার আঁখিটিরে।
ব্যথায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,
বিরহ হানি তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে,
অলখ স্রোতে ভাবনা ধায় তোমার তটপানে
এপার হতে বহিয়া মোর নতি
যে-বীণা তব মন্দিরেতে বাজে নি তানে তানে
চরণে তব নীরবে তার গতি।

১ শ্রাবণ ১৩৩৪
আম্বোয়াজ জাহাজ

অবশেষ

বাহির পথে বিবাগী হিয়া
কিসের খোঁজে গেলি,
আয় রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া
ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায়।
সারাটা বেলা সাগর-ধারে
কুড়ালি যত নুড়ি,
নানারঙের শামুক-ভারে
বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণ-পারাবারের পারে
প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায় ;
ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল
অকূলতল জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায়।
আয় রে ফিরে আয়।

বিরাম হল আরামহীন
যদি রে তোর ঘরে,
না যদি রয় সাথী,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন
মৌন অনাদরে,
না যদি জ্বালে বাতি ;
তবু তো আছে আঁধার কোণে
ধ্যানের ধনগুলি,
একেলা বসি আপনমনে
মুছিবি তার ধূলি,

গাঁথিবি তারে রতনহারে
বুকেতে নিবি তুলি
মধুর বেদনায়।
কাননবীথি ফুলের রীতি
না-হয় গেছে ভুলি,
তারকা আছে গগন-কিনারায়।
আয় রে ফিরে আয়।

২৯ চৈত্র ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

শেষ মধু

বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায়
চৈৎ-ফসলের শূন্য খেতে,
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে,—
আয় রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
চৈত্র যে যায় পত্রঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা।

সজনে ঝুলায় ফুলের বেণী,
আমের মুকুল সব ঝরে নি,
কুঞ্জবনের প্রান্ত-ধারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।
আয় রে তোরা মৌমাছি, আয়,
আসবে কখন্ শুকনো খরা,
প্রেতের নাচন নাচবে তখন
রিক্ত নিশায় শীর্ণ জরা।

শুনি যেন কাননশাখায়
বেলাশেষের বাজায় বেণু;
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধরেণু।
কাল যে-কুসুম পড়বে ঝরে
তাদের কাছে নিস গো ভরে
ওই বছরের শেষের মধু
এই বছরের মৌচাকেতে।
নূতন দিনের মৌমাছি, আয়,
নাই রে দেরি, করিস ত্বরা,
শেষের দানে ঐ রে সাজায়
বিদায়দিনের দানের ভরা।

চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলনচাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়দাহের রৌদ্রতাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে জানি।
যা-কিছু তার আছে দেবার
শেষ করে সব নিবি এবার,
যাবার বেলায় যাক চলে যাক
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে।
আয় রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
আয় রে গোপনমধু-হরা,
চরম দেওয়া সঁপিতে চায়
ঐ মরণের স্বয়ম্বরা।

১২ চৈত্র ১৩৩৩
[শান্তিনিকেতন]

বনবাণী

ভূমিকা

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়,— তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।

ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ্-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে-বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন— দুই-এ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'; শুনেছিলেন, 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'।

তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'— প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কত দিন মনে করেছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দ-রূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম-প্রৈতির বন্ধবিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরাত্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়— তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ— অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে,— তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরনা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরমসুন্দরের মুক্তরূপে প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ,— আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।

২৩ অক্টোবর ১৯২৬

[হোটেল ইম্পীরিয়ল]

ভিয়েনা

বনবাণী

বৃক্ষবন্দনা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ,
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে ; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

সেদিন অম্বর-মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্কসমাজে
মর্ত্যের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা। যে-জীবন
মরণতোরণদ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি উল্লসি
নিজেরে পড়েছে তার মনে,— দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃস্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
পাংশুম্লান গৈরিকবসন-পরা, খণ্ড কালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে,
দুঃখের সংঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে ; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে ;
সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।

বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্রহীন,—
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়,
যে-গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর,
বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির ;
তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে
শুনিতে মৌনের মহাবাণী ;— দুশ্চিন্তার গুরুভারে

নতশীর্ষ বিলুণ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব,—
প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
বিশ্বজয়ী বীররূপ, ধরণীর বাণীরূপ তার
লভিতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধরূপ ; ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে-তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী ; দিলে তারে পরম সম্মান ;
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী,— সে-অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে-মানব, তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য ল'য়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।

৯ চৈত্র ১৩৩৩
[শান্তিনিকেতন]

জগদীশচন্দ্র

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
প্রিয়করকমলে

বন্ধু

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ-যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহনতলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিমভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে ইঙ্গিতে মর্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্যকোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝংকারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাতপবনে।
প্রাণের প্রথমবাণী এইমতো জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—
কাছে থেকে শুনি নাই;— হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি; মূক জীবনের যে-ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।

প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মর সাথে মানব-মর্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়;—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি
সেথা তুমি দীপ্তহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদি
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্যের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষাকণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ-কূলে ও-কূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্মমাঝে।
জ্যোতিষ্কসভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্রদীপ জ্বলে আজি দীপালি-উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা

বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে-বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি-'পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, 'ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।'

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
শান্তিনিকেতন

দেবদারু

আমি তখন ছিলেম শিলঙ পাহাড়ে, রূপভাবক নন্দলাল ছিলেন কার্সিয়ঙে। তাঁর কাছ থেকে ছোটো একটি পত্রপট পাওয়া গেল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা। চেয়ে চেয়ে মনে হল, ওই একটি দেবদারুর মধ্যে যে-শ্যামল শক্তির প্রকাশ, সমস্ত পর্বতের চেয়ে তা বড়ো, ওই দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে-প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলেম।

তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
সূর্যের যে-জ্যোতির্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য-উচ্চারণ
অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী,— তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
সে-বাণী ধরিল শ্যামকায়া ; সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রীগান ; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।

ঋজু দীর্ঘ দেবদারু—গিরি এরে শ্রেষ্ঠ করে জ্ঞান
আপন মহিমা চেয়ে ; অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান
বাহিরে তা সত্য হল ; উর্ধ্ব হতে পেয়েছিল ঋণ,
উর্ধ্বপানে অর্ঘ্যরূপে শোধ করি দিল একদিন।
আপন দানের পুণ্যে স্বর্গ তার রহিল না দূর,
সূর্যের সংগীতে মেশে মৃত্তিকার মুরলীর সুর।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪
শিলঙ

আম্রবন

সে-বৎসর শান্তিনিকেতন আম্রবীথিকায় বসন্ত-উৎসব হয়েছিল। কেউবা চিত্রে কেউবা কারুশিল্পে কেউবা কাব্যে আপন অর্ঘ্য এনেছিলেন। আমি ঋতুরাজকে নিবেদন করেছিলেম কয়েকটি কবিতা, তার মধ্যে নিম্নলিখিত একটি। সে-দিন উৎসবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, এই আম্রবনের সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁদের সকলের চেয়ে পুরাতন,— সেই আমার বালককালের আত্মীয়তা এই কবিতার মধ্যে আমার জীবনের পরাহ্নে প্রকাশ করে গেলেম। এই আম্রবনের যে-নিমন্ত্রণ বালকের চিরবিস্মিত হৃদয়ে এসে পৌঁচেছিল আজ মনে হয় সেই নিমন্ত্রণ যেন আবার আসছে মাটির মেঠো সুর নিয়ে, রৌদ্রতপ্ত ঘাসের গন্ধ নিয়ে, উত্তেজিত শালিখগুলির কাকলিবিক্ষুব্ধ অপরাহ্নের অবকাশ নিয়ে।

তব পথচ্ছায়া বাহি বাঁশরিতে যে বাজাল আজি
মর্মে তব অশ্রুত রাগিণী,
ওগো আম্রবন,
তারি স্পর্শে রহি রহি আমারো হৃদয় উঠে বাজি,—
চিনি তারে কিম্বা নাহি চিনি,
কে জানে কেমন।

অন্তরে অন্তরে তব যে-চঞ্চল রসের ব্যগ্রতা
আপন অন্তরে তাহা বুঝি,
ওগো আম্রবন।
তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমারি মতন চাহে কথা—
মঞ্জরিতে মুখরিয়া আনন্দের ঘনগূঢ় ব্যথা;
অজানারে খুঁজি'
আমারি মতন আন্দোলন।

সচকিয়া চিকনিয়া কাঁপে তব কিশলয়রাজি
সর্ব অঙ্গে নিমেষে নিমেষে,
ওগো আম্রবন।
আমিও তো আপনার বিকশিত কল্পনায় সাজি
অন্তর্লীন আনন্দ-আবেশে
অমনি নূতন।
প্রাণে মোর অমনি তো দোলা দেয় সন্ধ্যায় উষায়
অদৃশ্যের নিশ্বসিত ধ্বনি,
ওগো আম্রবন।
আমার যে পুষ্পশোভা সে কেবল বাণীর ভূষায়,
নূতন চেতনে চিত্ত আপনারে পরাইতে চায়
সুরের গাঁথনি—
গীতঝংকারের আবরণ।

যে অজস্র ভাষা তব উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে কুসুমি
ভূতলের চিরন্তনী কথা,
ওগো আম্রবন,
তাই বহে নিয়ে যাও, আকাশের অন্তরঙ্গ তুমি,
ধরণীর বিরহবারতা
গভীর গোপন।
সে-ভাষা সহজে মিশে বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে,

মৌমাছির গুঞ্জনে গুঞ্জনে,
ওগো আম্রবন।
আমার নিভৃত চিত্তে সে-ভাষা সহজে চলে আসে,
মিশে যায় সংগোপনে অন্তরের আভাসে আশ্বাসে
স্বপনে বেদনে,
ধ্যানে মোর করে সঞ্চরণ।

সুদূর জন্মের যেন ভুলে-যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর
গন্ধে তব রয়েছে সঞ্চিত,
ওগো আম্রবন।
যেন নাম ধ'রে কোন্ কানে-কানে গোপন মর্মর
তাই মোরে করে রোমাঞ্চিত
আজি ক্ষণে ক্ষণ।
আমার ভাবনা আজি প্রসারিত তব গন্ধ সনে
জনমমরণপরপার,
ওগো আম্রবন,
যেথায় অমরাপুরে সুন্দরের দেউলপ্রাঙ্গণে
জীবনের নিত্য-আশা সন্ন্যাসিনী, সন্ধ্যারতিক্ষণে
দীপ জ্বালি তার
পূর্ণেরে করিছে সমর্পণ।

বহুকাল চলিয়াছে বসন্তের রসের সঞ্চার
ওই তব মজ্জায় মজ্জায়,
ওগো আম্রবন।
বহুকাল যৌবনের মদোৎফুল্ল পল্লীললনার
আকুলিত অলক সজ্জায়
জোগালে ভূষণ।
শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে-বক্ষ পৃথ্বীর
প্রাণরস কর তুমি পান,
ওগো আম্রবন,

সেথা আমি গেঁথে আছি দুদিনের কুটির মৃত্তির ;-
তোমার উৎসবে আমি আজি গাব এক রজনীর
পথ-চলা গান,
কালি তার হবে সমাপন।

৫ ফাল্গুন ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

নীলমণিলতা

শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়িতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়র্সন একটি বিদেশী গাছের চারা রোপণ করেছিলেন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীলফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত করলে। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বলবার ইচ্ছে হত কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই নামকরণটি পাকা করবার জন্যে এই কবিতা। নীলমণি ফুল যেখানে চোখের সামনে ফোটে সেখানে নামের দরকার হয় নি, কিন্তু একদা অবসানপ্রায় বসন্তের দিনে দূরে ছিলুম, সে-দিন রূপের স্মৃতি নামের দাবি করলে। ভক্ত ১০১ নামে দেবতাকে ডাকে সে শুধু বিরহের আকাশকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে।

ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণিমঞ্জরির গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে।
আকাশ যে মৌনভার
বহিতে পারে না আর,
নীলিমাবন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা,
তারি ধারা পুষ্পপাত্রে ভরি নিল নীলমণিলতা

পৃথ্বীর গভীর মৌন দূর শৈলে ফেলে নীল ছায়া,
মধ্যাহ্নমরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্নকায়া।
যে-মৌন নিজেরে চায়
সমুদ্রের নীলিমায়,
অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বসিল নীলগুচ্ছ ফুলে,
দুর্গম রহস্য তার উঠিল সহজ ছন্দে দুলে।

আসন্ন মিলনাশ্বাসে বধূর কম্পিত তনুখানি
নীলাম্বর-অঞ্চলের গুণ্ঠনে সঞ্চিত করে বাণী।
মর্মের নির্বাক কথা
পায় তার নিঃসীমতা
নিবিড় নির্মল নীলে; আনন্দের সেই নীল দ্যুতি
নীলমণিমঞ্জরির পুঞ্জে পুঞ্জে প্রকাশে আকুতি।

অজানা পান্থের মতো ডাক দিলে অতিথির ডাকে,
অপরূপ পুষ্পোচ্ছ্বাসে হে লতা, চিনালে আপনাকে।
বেল জুঁই শেফালিরে
জানি আমি ফিরে ফিরে,
কত ফাল্গুনের, কত শ্রাবণের, আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিত্তে, রঙিন করেছে ভালোবাসা।

চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে-যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে-যে কোন্ বেণীবন্ধে বাঁধা।
বাদলের চামেলি-যে
কালো আঁখিজলে ভিজে,
করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণঝংকারসুরে মাখা,
কদম্বকেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা।

তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছ নীলমণি,
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাসজালে
বাঁধা নহ দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে,
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব, কেন এ কে জানে

'কেন এ কে জানে'— এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে;
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে।
বসন্তের নানা ফুলে
গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণগানে;
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি; কেন এ কে জানে।

কেন এ কে জানে এত বর্ণগন্ধরসের উল্লাস,
প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।
যেদিন বিতানচ্ছায়ে
মধ্যাহ্নের মন্দবায়ে
ময়ূর আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে একখানে
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে, কহিলাম, 'কেন এ কে জানে'

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
মন জড়তায় ঠেকে,
নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
হেনকালে হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে;
বিশ্বপানে চাহিলাম, কহিলাম, 'কেন এ কে জানে'।

আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে।
তব নীললাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।
আসে বৎসরের শেষ,
চৈত্র ধরে ম্লান বেশ,
হয়তো বা রিক্ত তুমি ফুল ফোটাবার অবসানে,
তবু, হে অপূর্ব রূপ, দেখা দিলে কেন যে কে জানে।

:৭ চৈত্র ১৩৩৩
ভরতপুর

কুরচি

অনেককাল পূর্বে শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসছিলেম। কুষ্টিয়া স্টেশনঘরের পিছনের দেয়ালঘেঁষা এক কুরচিগাছ চোখে পড়ল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত। চারিদিকে হাটবাজার ; একদিকে রেলের লাইন, অন্যদিকে গোরুর গাড়ির ভিড়, বাতাস ধুলোয় নিবিড়। এমন অজায়গায় পি. ডব্লু. ডি-র স্বরচিত প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে এই একটি কুরচিগাছ তার সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয়ঘোষণা করছে— উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তার অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা। কুরচির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়
ছিল প্রীতি কুমুদিনী পানে।
সহসা বিদেশে আসি হায়, আজ কি ও
কুটজেও বহু বলি' মানে !

—সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ

কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে-ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভর্ৎসনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে। তুমি আভিজাত্যহীনা,
নামের গৌরবহারা ; শ্বেতভুজা ভারতীর বীণা

তোমারে করে নি অভ্যর্থনা অলংকারঝংকারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা তব স্থান অবারিত,
বিশ্বলক্ষ্মী করেছেন আমন্ত্রণ যে-প্রাঙ্গণতলে
প্রসাদচিহ্নিত তাঁর নিত্যকার অতিথির দলে।
আমি কবি লজ্জা পাই কবির অন্যায় অবিচারে
হে সুন্দরী। শাস্ত্রদৃষ্টি দিয়ে তারা দেখেছে তোমারে,
রসদৃষ্টি দিয়ে নহে; শুভদৃষ্টি কোনো স্থলগনে
ঘটিতে পারে নি তাই, ঔদাস্যের মোহ-আবরণে
রহিলে কুণ্ঠিত হয়ে।

তোমারে দেখেছি সেই কবে
নগরে হাটের ধারে, জনতার নিত্যকলরবে,
ইঁটকাঠপাথরের শাসনের সংকীর্ণ আড়ালে,
প্রাচীরের বহিঃপ্রান্তে।— সূর্যপানে চাহিয়া দাঁড়ালে
সকরুণ অভিমানে;— সহসা পড়েছে যেন মনে
একদিন ছিলে যবে মহেন্দ্রের নন্দনকাননে
পারিজাতমঞ্জরির লীলার সঙ্গিনীরূপ ধরি
চিরবসন্তের স্বর্গে, ইন্দ্রাণীর সাজাতে কবরী;
অপ্সরীর নৃত্যলোল মণিবন্ধে কঙ্কণবন্ধনে
পেতে দোল তালে তালে; পূর্ণিমার অমল চন্দনে
মাখা হয়ে নিশ্বসিতে চন্দ্রমার বক্ষোহার-'পরে।
অদূরে কঙ্কররুক্ষ লৌহপথে কঠোর ঘর্ঘরে
চলেছে আগ্নেয়রথ, পণ্যভারে কম্পিত ধরায়
ঔদ্ধত্য বিস্তারি বেগে; কটাক্ষে কেহ না ফিরে চায়
অর্থমূল্যহীন তোমাপানে, হে তুমি দেবের প্রিয়া,
স্বর্গের দুলালী। যবে নাটমন্দিরের পথ দিয়া
বেসুর অসুর চলে, সেইক্ষণে তুমি একাকিনী
দক্ষিণবায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধ-কিঙ্কিণী
বসন্তবন্দনানৃত্যে,— অবজ্ঞিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে,

ঐশ্বর্যের ছদ্মবেশী ধূলির দুঃসহ অহংকারে
হানিয়া মধুর হাস্য ; শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত
ক্লান্তিহীন সৌন্দর্যের আত্মহারা অজস্র অমৃত
করেছ নিঃশব্দ নিবেদন।

মোর মুগ্ধ চিত্তময়
সেইদিন অকস্মাৎ আমার প্রথম পরিচয়
তোমা-সাথে। অনাদৃত বসন্তেরে আবাহন গীতে
প্রণমিয়া উপেক্ষিতা, শুভক্ষণে কৃতজ্ঞ এ চিতে
পদার্পিলে অক্ষয় গৌরবে। সেইক্ষণে জানিলাম,
হে আত্মবিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম
সকলেই ভুলে গেছে, সে-নাম প্রকাশ নাহি পায়
চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে পণ্ডিতের পুঁথির পাতায় ;
গ্রামের গাথার ছন্দে সে-নাম হয় নি আজো লেখা,
গানে পায় নাই সুর। সে-নাম কেবল জানে একা
আকাশের সূর্যদেব, তিনি তাঁর আলোকবীণায়
সে-নামে ঝংকার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায়
অপূর্ব ঐশ্বর্য তার ; সে-সুরে গোপন বার্তা জানি'
সন্ধানী বসন্ত হাসে। স্বর্গ হতে চুরি করে আনি'
এ ধরা, বেদের মেয়ে, তোরে রাখে কুটির-কানাচে
কটুনামে লুকাইয়া, হঠাৎ পড়িস ধরা পাছে।
পণ্যের কর্কশধ্বনি এ নামে কদর্য আবরণ
রচিয়াছে ; তাই তোরে দেবী ভারতীর পদ্মবন
মানে নি স্বজাতি বলে, ছন্দ তোরে করে পরিহার,—
তা বলে হবে কি ক্ষুণ্ণ কিছুমাত্র তোর শুচিতার।
সূর্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুর্চি, পড়েছ ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।

১০ বৈশাখ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন

শাল

প্রায় ত্রিশ বছর হল শান্তিনিকেতনের শালবীথিকায় আমার সে-দিনকার এক কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সায়াহ্নে পায়চারি করেছি। তাকে অন্তরের গভীর কথা বলা বড়ো সহজ ছিল। সেই আমাদের যত আলাপগুঞ্জরিত রাত্রি, আশ্রমবাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুলির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে। সে কবি আজ ইহলোকে নেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রিয়সঙ্গের কত ধারা কত নিভৃত পথ দিয়ে চলেছে। এই স্তব্ধ তরুশ্রেণীর প্রাচীন ছায়ায় সেই ধারা তেমন করে আরো অনেক বয়ে গেছে, আরো অনেক বইবে। আমরা চলে যাব কিন্তু কালে কালে বারে বারে বন্ধুসংগমের জন্য এই ছায়াতল রয়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাবছি— তেমনি ওই শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসছে।

বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মদির পবন
অরণ্যে বিস্তারে অধীরতা; যবে কিংশুকের বন
উচ্ছৃঙ্খল রক্তরাগে স্পর্ধায় উদ্যত; দিশিদিশি
শিমুল ছড়ায় ফাগ; কোকিলের গান অহর্নিশি
জানে না সংযম, যবে বকুল অজস্র সর্বনাশে
স্খলিত দলিত বনপথে, তখন তোমার পাশে
আসি আমি হে তপস্বী শাল, যেথায় মহিমারাশি
পুঞ্জিত করেছ অভ্রভেদী, যেথা রয়েছ বিকাশি
দিগন্তে গম্ভীর শান্তি। অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট রয়েছ ঊর্ধ্বশিরে;
চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না সেথায়। অন্ধকারে
নিঃশব্দ সৃষ্টির মন্ত্র নাড়ি বেয়ে শাখায় সঞ্চারে;
সে অমৃত মন্ত্রতেজ নিলে ধরি সূর্যলোক হতে
নিভৃত মর্মের মাঝে; স্নান করি আলোকের স্রোতে
শুনি নিলে নীল আকাশের শান্তিবাণী; তার পরে
আত্মসমাহিত তুমি, স্তব্ধ তুমি,— বৎসরে বৎসরে
বিশ্বের প্রকাশযজ্ঞে বারম্বার করিতেছ দান
নিপুণ সুন্দর তব কমণ্ডলু হতে অফুরান
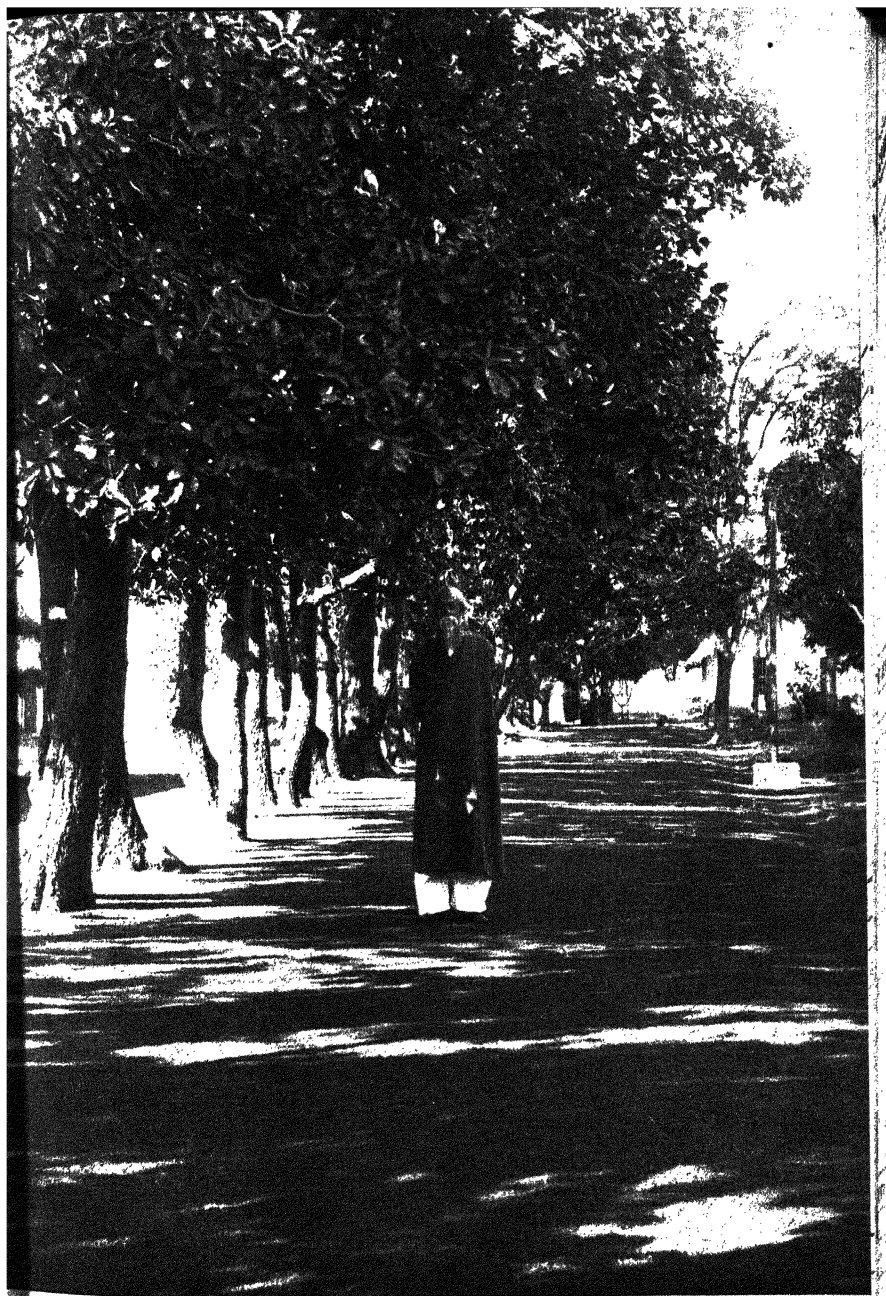
শান্তিনিকেতন শালবীথিকায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ হইতে

পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা ; সে ধারা চলেছে ধীরে ধীরে
দিগন্তে শ্যামল উর্মি উচ্ছ্বাসিয়া, দূর শতাব্দীরে
শুনাতে মর্মর আশীর্বাণী। রাজার সাম্রাজ্য কতশত
কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে যায় বুদ্‌বুদের মতো,
মানুষের ইতিবৃত্ত সুদুর্গম গৌরবের পথে
কিছুদূর যায়, আর বারম্বার ভগ্নচূর্ণ রথে
কীর্ণ করে ধূলি। তারি মাঝে উদার তোমার স্থিতি,
ওগো মহা শাল, তুমি সুবিশাল কালের অতিথি ;
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গিতে,
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্মরসংগীতে,
মঞ্জরির গন্ধের গণ্ডূষে। যুগে যুগে কত কাল
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, বসেছে রাখাল,
শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখি ; যায় তারা পথ বাহি
আসন্ন বিস্মৃতি পানে, উদাসীন তুমি আছ চাহি।
নিত্যের মালার সূত্রে অনিত্যের যত অক্ষগুটি
অ।স্তত্বের আবর্তনে দ্রুতবেগে চলে তারা ছুটি ;
মর্ত্যপ্রাণ তাহাদের ক্ষণেক পরশ করে যেই
পায় তারা জপনাম, তার পরে আর তারা নেই,
নেমে যায় অসংখ্যের তলে। সেই চলে-যাওয়া দল
রেখে দিয়ে গেছে যেন ক্ষণিকের কলকোলাহল
দক্ষিণহাওয়ায় কাঁপা ওই তব পত্রের কল্লোলে,
শাখার দোলায়। ওই ধ্বনি স্মরণে জাগায়ে তোলে
কিশোর বন্ধুরে মোর। কতদিন এই পাতাঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা ;
যৌবন-তুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্নামুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।

গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরিতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।

প্রীতিমিলনের ক্ষণে
সেদিনের প্রিয় সে কোথায়, বর্ষে বর্ষে দোলা দিত
যাহার প্রাণের বেগ উৎসব করিয়া তরঙ্গিত।
তোমার বীথিকাতলে তার মুক্ত জীবনপ্রবাহ
আনন্দচঞ্চল গতি মিলায়েছে আপন উৎসাহ
পুষ্পিত উৎসাহে তব। হায়, আজি তব পত্রদোলে
সেদিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্তকল্লোলে,
পূর্ণিমার পূর্ণতায়, দেবতার অমৃতের দানে
মর্ত্যের বেদনা মেশে।

চাহি' আজ দূর পানে
স্বপ্নচ্ছবি চোখে ভাসে,— ভাবী কোন্ ফাল্গুনের রাতে
দোলপূর্ণিমায়, সাজাতে আসিছে কারা পদ্মপাতে
পলাশ বকুল চাঁপা, আলিম্পনলেখা এঁকে দিতে
তব ছায়াবেদিকায়, বসন্তের আবাহন গীতে
প্রসন্ন করিতে তব পুষ্পবরিষন। সে-উৎসবে
আজিকার এই দিন পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত নীরবে।
কোলে তার পড়ে আছে এ-রাত্রির উৎসবের ডালা।
আজিকার অর্ঘ্যে আছে যতগুলি সুরে-গাঁথা মালা,
কিছু তার শুকায়েছে, কিছু তার আছে অমলিন ;
দুয়েকটি তুলে নিল যাত্রীদল ; সে-দিন এ-দিন
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে বদল করিয়া নিল মালা,—
নূতনে ও পুরাতনে পূর্ণ হল বসন্তের পালা।

৮ ফাল্গুন ১৩৩৪

[শান্তিনিকেতন]

মধুমঞ্জরি

এ লতার কোনো-একটা বিদেশী নাম নিশ্চয় আছে— জানি নে, জানার দরকারও নেই। আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাহিরের যে-দেবতা মুক্তস্বরূপে আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত। কাব্যসরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাব ঠিক করেছি, তাই নতুন করে নাম দিতে হল। রূপে রসে এর মধ্যে বিদেশী কিছুই নেই, এদেশের হাওয়ায় মাটিতে এর একটুও বিতৃষ্ণা দেখা যায় না, তাই দিশী নামে একে আপন করে নিলেম।

প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধরি,
বসন্তে আজ দুয়ারে, আ মরি মরি,
ফুলমাধুরীর অঞ্জলি দিল ভরি
　　মধুমঞ্জরিলতা।
কতদিন আমি দেখিতে এসেছি প্রাতে
কচি ডালগুলি ভরি নিয়ে কচি পাতে
আপন ভাষায় যেন আলোকের সাথে
　　কহিতে চেয়েছে কথা।

কতদিন আমি দেখেছি গোধূলিকালে
সোনালি ছায়ার পরশ লেগেছে ডালে,
সন্ধ্যাবায়ুর মৃদু-কাঁপনের তালে
　　কী যেন ছন্দ শোনে।
গহন নিশীথে ঝিল্লি যখন ডাকে,
দেখেছি চাহিয়া জড়িত ডালের ফাঁকে
কালপুরুষের ইঙ্গিত যেন কাকে
　　দূর দিগন্তকোণে।

শ্রাবণে সঘন ধারা ঝরে ঝরঝর
পাতায় পাতায় কেঁপে ওঠে থরথর,

মনে হয় ওর হিয়া যেন ভর-ভর
　　বিশ্বের বেদনাতে।
কতবার ওর মর্মে গিয়েছি চলি,
বুঝিতে পেরেছি কেন উঠে চঞ্চলি,
শরৎশিশিরে যখন সে ঝলমলি
　　শিহরায় পাতে পাতে।

ভুবনে ভুবনে যে-প্রাণ সীমানাহারা
গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
পল্লবপুটে ধরি লয় তারি ধারা,
　　মজ্জায় লহে ভরি।
কী নিবিড় যোগ এই বাতাসের সনে,
যেন সে পরশ পায় জননীর স্তনে,
সে পুলকখানি কত-যে, সে মোর মনে
　　বুঝিব কেমন করি।

বাতাসে আকাশে আলোকের মাঝখানে—
ঋতুর হাতের মায়ামন্ত্রের টানে
কী-যে বাণী আছে প্রাণে প্রাণে ও-ই জানে,
　　মন তা জানিবে কিসে।
যে-ইন্দ্রজাল দ্যুলোকে ভূলোকে ছাওয়া,
বুকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া,—
বুঝিতে যে চাই কেমন সে ওর পাওয়া,
　　চেয়ে থাকি অনিমিষে।

ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত,
নিখিলবাণীর রসের পরশামৃত
গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত
　　ধরিতে না পারে তারে।

ছন্দে গন্ধে রূপ-আনন্দে ভরা,
ধরণীর ধন গগনের মন-হরা,
শ্যামলের বীণা বাজিল মধুস্বরা
ঝংকারে ঝংকারে।

আমার দুয়ারে এসেছিল নাম ভুলি
পাতা-ঝলমল অঙ্কুরখানি তুলি
মোর আঁখিপানে চেয়েছিল দুলি দুলি
করুণ প্রশ্নরতা।
তারপরে কবে দাঁড়াল যেদিন ভোরে
ফুলে ফুলে তার পরিচয়লিপি ধরে
নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন করে
মধুমঞ্জরিলতা।

তারপরে যবে চলে যাব অবশেষে
সকল ঋতুর অতীত নীরব দেশে,
তখনো জাগাবে বসন্ত ফিরে এসে
ফুল-ফোটাবার ব্যথা।
বরষে বরষে সেদিনো তো বারে বারে
এমনি করিয়া শূন্য ঘরের দ্বারে
এই লতা মোর আনিবে কুসুমভারে
ফাগুনের আকুলতা।

তব পানে মোর ছিল যে প্রাণের প্রীতি
ওর কিশলয়ে রূপ নেবে সেই স্মৃতি,
মধুর গন্ধে আভাসিবে নিতি নিতি
সে মোর গোপন কথা।

অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে,
স্মরণচিহ্ন কত যাবে উন্মূলে ;
মোর দেওয়া নাম লেখা থাক্ ওর ফুলে
মধুমঞ্জরিলতা।

[চৈত্র ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন]

নারিকেল

সমুদ্রের ধারে জমিতেই নারিকেলের সহজ আবাস। আমাদের আশ্রমের মাঠ সেই সমুদ্রকূল থেকে বহুদূরে। এখানে অনেক যত্নে একটি নারিকেলকে পালন করে তোলা হয়েছে— সে নিঃসঙ্গ নিষ্ফল নিস্তেজ। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন প্রাণপণে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে দিগন্ত অতিক্রম করে কোনো-এক আকাঙ্ক্ষার ধনকে দেখবার চেষ্টা করছে। নির্বাসিত তরুর মজ্জার মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা। এখানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রের স্পর্শমাত্র নেই, গাছের শিকড় তার বাঞ্ছিত রস এখানে সন্ধান করছে, পাচ্ছে না ; সে উপবাসী, ধরণীর কাছে তার কান্নার সাড়া মিলছে না। আকাশে উদ্যত হয়ে উঠে তার যে-সন্ধানদৃষ্টিকে সে দিগন্তপারে পাঠাচ্ছে দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় সেই তার সন্ধানেরই সজীব মূর্তির মতো পাখি তার দোদুল্যমান শাখায় প্রতিদিন ফিরে ফিরে আসে।

আজ বসন্তে প্রথম কোকিল ডেকে উঠল। দক্ষিণ হাওয়ায় আজ কি সমুদ্রের বাণী এসে পৌঁছল, যে-বাণী সমুদ্রের কূলে কূলে বধির মাটির সুপ্তিকে নিয়তই অশান্ত তরঙ্গমন্ত্রে আন্দোলিত করে তুলছে। তাই কি আজ সেই দক্ষিণসমুদ্র থেকে তার তাণ্ডবনৃত্যের স্পর্শ এই গাছের শাখায় শাখায় চঞ্চল। সমুদ্রের রুদ্রডমরুর জাগরণী কি এরই পল্লবমর্মরে তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে। বিরহী তরু কি আজ আপন অন্তরে সেই সুদূরবন্ধুর বার্তা পেল, যে-বন্ধুর মহাগানে অভিনন্দিত হয়ে কোন্ অতীত যুগে একদিন কোনো প্রথম নারিকেল প্রাণযাত্রীরূপে জীবলোকে যাত্রা শুরু করেছিল ? সেই যুগারম্ভপ্রভাতের আদিম উৎসবে মহাপ্রাণের যে-স্পর্শপুলক জেগেছিল তাই আজ

ফিরে পেয়ে কি ওই গাছটির সংবৎসরের অবসাদ আজ বসন্তে ঘুচল। তার জীবনের জয়পতাকা আবার আজ কি ওই নব-উৎসাহে নীলাম্বরে আন্দোলিত। যেন একটা আচ্ছাদন উঠে গেল, তার মজ্জার মধ্যে প্রাণশক্তির যে-আশ্বাসবাণী প্রচ্ছন্ন হয়েছিল তাকেই আজ কি ফিরে পেলে, যে-বাণী বলছে— 'চলো প্রাণতীর্থে, জয় করো মৃত্যুকে।'

সমুদ্রের কূল হতে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে
নিঃসঙ্গ প্রবাস তব নারিকেল,— দিনরাত্রি কাটে
যে-প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষায় বুঝিতে পার না তাহা নিজে।
দিগন্তেরে অতিক্রমি দেখিতে চাহিছ তুমি কী-যে
দীর্ঘ করি দেহ তব, মজ্জায় রয়েছে তার স্মৃতি
গূঢ় হয়ে। মাটির গভীরে যে-রস খুঁজিছ নিতি
কী স্বাদ পাও না তাহে, অন্নে তার কী অভাব আছে,
তাই তো শিকড় উপবাসী কাঁদে ধরণীর কাছে।
আকাশে রয়েছ চেয়ে রাত্রিদিন কিসের প্রত্যাশে
বাক্যহারা! বারবার শূন্য হতে ফিরে ফিরে আসে
তোমারি সন্ধানরূপী সন্ধ্যাবেলাকার শ্রান্ত পাখি
লম্বিত শাখায় তব।
ঐ শুন উঠিয়াছে ডাকি
বসন্তের প্রথম কোকিল। সে বাণী কি এল প্রাণে
দক্ষিণপবন হতে যে-বাণী সমুদ্র শুধু জানে;
পৃথিবীর কূলে কূলে যে-বাণী গম্ভীর আন্দোলনে
বধির মাটির সুপ্তি কাঁপায়ে তুলিছে প্রতিক্ষণে
অশান্ততরঙ্গমন্দ্রে, দক্ষিণসাগর হতে একি
তাণ্ডবনৃত্যের স্পর্শ শাখার হিল্লোলে তব দেখি
মুহুর্মুহু চঞ্চলিত।
রুদ্রডমরুর জাগরণী
পল্লবমর্মরে তব পেয়েছে কি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।
কান পেতে ছিলে তুমি,— হে বিরহী, বসন্তে কি আজি
সুদূরবন্ধুর বার্তা অন্তরে উঠিল তব বাজি,—

যে-বন্ধুর মহাগানে একদিন সূর্যের আলোতে
রোমাঞ্চিয়া বাহিরিলে প্রাণযাত্রী, অন্ধকার হতে ?
আজি কি পেয়েছ ফিরে প্রাণের পরশহর্ষ সেই
যুগারম্ভপ্রভাতের আদি-উৎসবের।— নিমেষেই
অবসাদ দূরে গেল, জীবনের বিজয়পতাকা
আবার চঞ্চল হল নীলাম্বরে, খুলে গেল ঢাকা,
খুঁজে পেলে যে-আশ্বাস অন্তরে কহিছে রাত্রিদিন—
'প্রাণতীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয়, শ্রান্তিক্লান্তিহীন।'

[১৬ ফাল্গুন ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন]

চামেলি-বিতান

চামেলি-বিতানের নিচের ছায়ায় আমি বসতুম— ময়ূর এসে বসত উপরে, লতার আশ্রয়বেষ্টনী থেকে পুচ্ছ ঝুলিয়ে। জানি সে আমাকে কিছুমাত্র সম্মান করত না, কিন্তু সৌন্দর্যের যে-অর্ঘ্যভার সে বহন করে বেড়াত, তার অজ্ঞাতে আমি নিজেই সেটি প্রতিদিন গ্রহণ করেছি। এমন অসংকোচে সে যে দেখা দিয়ে যায় এতে আমি কৃতজ্ঞ ছিলুম, সে যে আমাকে ভয় করে নি এ আমার সৌভাগ্য। আরও তার কয়েকটি সঙ্গী সঙ্গিনী ছিল কিন্তু দূরের দুরাশায় ওদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল, আমিও চলে এসেছি সেই চামেলির সুগন্ধি ছায়ার আশ্রয় থেকে অন্য জায়গায়। বাইরে থেকে এই পরিবর্তনগুলি বেশি কিছু নয়, তবু অন্তরের মধ্যে ভাঙাচোরার দাগ কিছু কিছু থেকে যায়। শুনেছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো-এক নদীগর্ভজাত দ্বীপ ময়ূরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মৃগয়াবিলাসী ইংরেজ এই দ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা করতে পারে নি অথচ গুলি করে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব

হওয়াতে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে খাদ্যের প্রলোভন বিস্তার করে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ময়ূর মারত। বাল্মীকির শাপকে এ-যুগের কবি পুনরায় প্রচার না করে থাকতে পারল না।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং
অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

ময়ূর কর নি মোরে ভয়,
সেই গর্ব, সেই মোর জয়।
বাহিরেতে আমলকী
করিতেছে ঝকমকি,
বটের উঠেছে কচি পাতা,
হোথায় দুয়ার থেকে
আমারে গিয়েছ দেখে,
খুলিয়া বসেছি মোটা খাতা।
লিখিতেছি নিজ মনে,—
হেরি' তাই আঁখিকোণে
অবজ্ঞায় ফিরে যাও চলি,
বোঝ না, লেখনী ধরি
কী যে এত খুঁটে মরি,
আমারে জেনেছ মূঢ় বলি।

সেই ভালো জান যদি তাই,
তাহে মোর কোন খেদ নাই।
তবু আমি খুশী আছি,
আস তুমি কাছাকাছি,
মোরে দেখে নাহি কর ত্রাস
যদিও মানব, তবু
আমারে কর না কভু
দানব বলিয়া অবিশ্বাস।

সুন্দরের দূত তুমি,
এ-ধূলির মর্ত্যভূমি,
স্বর্গের প্রসাদ হেথা আন,
তবুও বধি না তোরে,
বাঁধি না পিঞ্জরে ধরে,
এও কি আশ্চর্য নাহি মান

কাননের এই এক কোণা,—
হেথায় তোমার আনাগোনা।
চামেলিবিতানতল
মোর বসিবার স্থল,
দিন যবে অবসান হয়।
হেথা আস কী যে ভাবি',
মোর চেয়ে তোর দাবি
বেশি বই কম কিছু নয়।
জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা আল্‌পনা আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানে আপনার।
কচি পাতা যে-বিশ্বাসে
দ্বিধাহীন হেথা আসে,
তোমার তেমনি অধিকার।

বর্ণহীন রিক্ত মোর সাজ,
তারি লাগি পাছে পাই লাজ,
বর্ণে বর্ণে আমি তাই
ছন্দ রচিবারে চাই,
সুরে সুরে গীতচিত্র করি।
আকাশেরে বাসি ভালো,
সকাল-সন্ধ্যার আলো
আমার প্রাণের বর্ণে ভরি।

ধরায় যেখানে তাই,
তোমার গৌরব-ঠাঁই
সেথায় আমারো ঠাঁই হয়।
সুন্দরের অনুরাগে
তাই মোর গর্ব লাগে,
মোরে তুমি কর নাই ভয়।

তোমার আমার তরে জানি
মধুরের এই রাজধানী।
তোর নাচ, মোর গীতি,
রূপ তোর, মোর প্রীতি,
তোর বর্ণ, আমার বর্ণনা,—
শোভনের নিমন্ত্রণে
চলি মোরা দুইজনে,
তাই তুই আমার আপনা।
সহজ রঙ্গের রঙ্গী
ওই যে গ্রীবার ভঙ্গী,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি-যে শঙ্কা না পাও,
নিঃসংশয়ে আস যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার।

নাশ করে যে-আগ্নেয় বাণ
মুহূর্তে অমূল্য তোর প্রাণ—
তার লাগি বসুন্ধরা
হয় নি সবুজে ভরা,
তার লাগি ফুল নাহি ধরে।
যে-বসন্তে প্রাণে প্রাণে
বেদনার সুধা আনে
সে-বসন্ত নহে তার তরে।

ছন্দ ভেঙে দেয় সে যে,
অকস্মাৎ উঠে বেজে
অর্থহীন চকিত চীৎকার,
ধূমাচ্ছন্ন অবিশ্বাস
বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস,
কুটিল সংশয় কদাকার।

সৃষ্টিছাড়া এই-যে উৎপাত
হানে দানবের পদাঘাত
পুণ্য পৃথিবীর শিরে,—
তার লজ্জা তুই কি রে
আনিতে পারিবি তোর মনে।
অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরতা
সৌন্দর্যেরে দেয় ব্যথা
কেন যে তা বুঝিবি কেমনে।
কেন যে কদর্য ভাষা
বিধাতার ভালোবাসা
বিদ্রূপে করিছে ছারখার,
যে-হস্ত দানেরি তরে
তারি রক্তপাত করে,
সেই লজ্জা নিখিলজনার।

[বৈশাখ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন]

পরদেশী

পিয়র্সন্ কয়েক জোড়া সবুজরঙের বিদেশী পাখি আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন তারা এখানে বাসা বেঁধে ছিল। আজকাল আর দেখতে পাই নে। আশা করি কোনো নালিশ নিয়ে তারা চলে যায় নি, কিম্বা এখানকার অন্য আশ্রমিক পশু-পাখির সঙ্গে বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে নি।

এনেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখি আমার বনে,
সকাল-সাঁঝে কুঞ্জমাঝে
উঠিছে ডাকি সহজ মনে।
অজানা এই সাগরপারে
হল না তার গানের ক্ষতি।
সবুজ তার ডানার আভা,
চপল তার নাচের গতি।
আমার দেশে যে-মেঘ এসে
নীপবনের মরমে মেশে
বিদেশী পাখি গীতালি দিয়ে
মিতালি করে তাহার সনে।

বটের ফলে আরতি তার,
রয়েছে লোভ নিমের তরে,
বনজামেরে চঞ্চু তার
অচেনা ব'লে দোষী না করে
শরতে যবে শিশির বায়ে
উচ্ছ্বসিত শিউলিবীথি,
বাণীরে তার করে না ম্লান
কুহেলিঘন পুরানো স্মৃতি।

শালের ফুল-ফোটার বেলা
মধুকাঙালী লোভীর মেলা,
চিরমধুর বঁধুর মতো
সে-ফুল তার হৃদয় হরে।

বেণুবনের আগের ডালে
চটুল ফিঙা যখন নাচে
পরদেশী এ পাখির সাথে
পরানে তার ভেদ কি আছে।
উষার ছোঁওয়া জাগায় ওরে
ছাতিমশাখে পাতার কোলে,
চোখের আগে যে-ছবি জাগে
মানে না তারে প্রবাস ব'লে।
আলোতে সোনা, আকাশে নীলা,
সেথা যে চিরজানারি লীলা,
মায়ের ভাষা শোনে সেখানে
শ্যামল ভাষা যেখানে গাছে।

৮ বৈশাখ ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

কুটিরবাসী

তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটির রচনা করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন ক'রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয়

বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে ; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।

তোমার কুটিরের
সমুখবাটে
পল্লিরমণীরা
চলেছে হাটে।
উড়েছে রাঙা ধূলি,
উঠেছে হাসি,—
উদাসী বিবাগীর
চলার বাঁশি
আঁধারে আলোকেতে
সকালে সাঁঝে
পথের বাতাসের
বুকেতে বাজে।

যা-কিছু আসে যায়
মাটির 'পরে
পরশ লাগে তারি
তোমার ঘরে।
ঘাসের কাঁপা লাগে,
পাতার দোলা,
শরতে কাশবনে
তুফান তোলা,
প্রভাতে মধুপের
গুনগুনানি,
নিশীথে ঝিঁঝিঁরবে
জালবুনানি।
দেখেছি ভোরবেলা
ফিরিছ একা,

পথের ধারে পাও
কিসের দেখা।
সহজে সুখী তুমি
জানে তা কেবা,
ফুলের গাছে তব
স্নেহের সেবা;
এ কথা কারো মনে
রবে কি কালি,
মাটির 'পরে গেলে
হৃদয় ঢালি।

দিনের পরে দিন
যে-দান আনে
তোমার মন তারে
দেখিতে জানে।
নম্র তুমি, তাই
সরলচিতে
সবার কাছে কিছু
পেরেছ নিতে,
উচ্চ-পানে সদা
মেলিয়া আঁখি
নিজেরে পলে পলে
দাও নি ফাঁকি।

চাও নি জিনে নিতে
হৃদয় কারো,
নিজের মন তাই
দিতে যে পার।
তোমার ঘরে আসে
পথিকজন,

চাহে না জ্ঞান তারা,
চাহে না ধন,
এটুকু বুঝে যায়
কেমনধারা
তোমারি আসনের
শরিক তারা।

তোমার কুটিরের
পুকুর পাড়ে
ফুলের চারাগুলি
যতনে বাড়ে।
তোমারো কথা নাই,
তারাও বোবা,
কোমল কিশলয়ে
সরল শোভা।
শ্রদ্ধা দাও, তবু
মুখ না খোলে,
সহজে বোঝা যায়
নীরব ব'লে।

তোমারি মতো তব
কুটিরখানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তার
বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে
তালের গাছে
বিরল পাতাকটি
আলোয় নাচে,
সমুখে খোলা মাঠ
করিছে ধূ ধূ,

দাঁড়ায়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু।

তোমার বাসাখানি
আঁটিয়া মুঠি
চাহে না আঁকড়িতে
কালের ঝুঁটি।
দেখি যে পথিকের
মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার
সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে,
পাতার মতো,
যখন যাবে, রেখে
যাবে না ক্ষত।

নাইকো রেষারেষি
পথে ও ঘরে,
তাহারা মেশামেশি
সহজে করে।
কীর্তিজালে ঘেরা
আমি তো ভাবি,
তোমার ঘরে ছিল
আমারো দাবি;
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে আর
অনেক দায়ে।

[চৈত্র ১৩৩৩
শান্তিনিকেতন]

হাসির পাথেয়

তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয়ে চলেছেন ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সকালবেলায় ডাণ্ডি চ'ড়ে বেরতুম, অপরাহ্ণে ডাকবাংলায় বিশ্রাম হত। আজো মনে আছে এক জায়গায় পথের ধারে ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি নামিয়েছিল। সেখানে শ্যাওলায় শ্যামল পাথরগুলোর উপর দিয়ে গুহার ভিতর থেকে ঝরনা নেমে উপত্যকায় কলশব্দে ঝরে পড়ছে। সেই প্রথম দেখা ঝরনার রহস্য আমার মনকে প্রবল করে টেনেছিল। এদিকে ডানপাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে শস্যখেত হলদে ফুলে ছাওয়া, দেখে দেখে তৃপ্তির শেষ হয় না,— কেবলি ভাবি এইগুলো ভ্রমণের লক্ষ্য কেন না হবে, কেবল ক্ষণিক উপলক্ষ কেন হয়। সেই ঝরনা কোন্ নদীর সঙ্গে মিলে কোথায় গেছে জানি নে কিন্তু সেই মুহূর্তকালের প্রথম পরিচয়টুকু কখনো ভুলব না।

হিমালয় গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে
মনে পড়ে। ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি-পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারেবারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষারনিরুদ্ধ বাণী, বর্ণহীন বর্ণনাবিহীন।
সেদিন বৈশাখমাস, খণ্ড খণ্ড শস্যক্ষেত্রস্তরে
রৌদ্রবর্ণ ফুল ;— মেঘের কোমল ছায়া তারি 'পরে
যেন স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নীচে নেমে এসে
ধরণীর কানে কানে প্রশংসার বাক্য ভালোবেসে।

সেইদিন দেখেছিনু নিবিড় বিস্ময়মুগ্ধ চোখে
চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে

আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সুরসুন্দরীর
প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝংকার,
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,
আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুক চরণে
অশ্রান্ত সন্ধান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।

সেদিনের যাত্রাপথ হতে
আসিয়াছি বহুদূরে ; আজি ক্লান্ত জীবনের স্রোতে
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা। মনে উঠিতেছে ভাসি
শৈলশিখরের দূর নির্মল শুভ্রতা রাশি রাশি
বিগলিত হয়ে আসে দেবতার আনন্দের মতো
প্রত্যাশী ধরণী যেথা প্রণামে ললাট অবনত।
সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে
কঠিন বাধায় কীর্ণ শঙ্কায় সংকুল পথমাঝে
দুর্গমেরে করি অবহেলা। সে-হাসি দেখেছি বসি
শস্যভরা তটচ্ছায়ে কলস্বরে চলেছে উচ্ছ্বসি
পূর্ণবেগে। দেখেছি অম্লান তারে তীব্র রৌদ্রদাহে
শুষ্ক শীর্ণ দৈন্যদিনে বহি যায় অক্লান্ত প্রবাহে
সৈকতিনী, রক্তচক্ষু বৈশাখেরে নিঃশঙ্ক কৌতুকে
কটাক্ষিয়া— অফুরান হাস্যধারা মৃত্যুর সম্মুখে।

হে হিমাদ্রি, সুগম্ভীর, কঠিন তপস্যা তব গলি
ধরিত্রীরে করে দান যে-অমৃতবাণীর অঞ্জলি
এই সে হাসির মন্ত্র, গতিপথে নিঃশেষ পাথেয়,
নিঃসীম সাহসবেগ, উল্লসিত অশ্রান্ত অজেয়।

১ বৈশাখ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন

বৃক্ষরোপণ উৎসব

গান

১

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে,
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ।

পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি'
এসো শ্যাম সুন্দর,
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্তগীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ।

২

আয় আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহসঙ্গ নে,
চল্, আমাদের ঘরে চল্।

শ্যামবঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কলসংগীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল।

তোদের নবীন পল্লবে
নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বনবল্লভে
মর্মর গীত উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারাজল।

ক্ষিতি

বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে।
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চিরসখ্যে।
অন্তরে পাক কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষিসমাজে পাঠাক পত্রী
তোমার অন্নসত্রে।

অপ

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরি বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এরে ডেকে।
বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণীর বর্ষা অভিষেকে।

তেজ

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক ;
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হ'ক।
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা।
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি'
হ'ক তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি।

মরুৎ

হে পবন কর নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সংগীত দিয়ো এরে ভিক্ষা।
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লবহিল্লোল শিক্ষা।

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামলমূর্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্তি।
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে।
তরুতরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য।

মাঙ্গলিক

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হ'ক হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক সুধাসিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণবর্ষণযজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো।
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুমবর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষাগীতিকায়,
সন্ধ্যাবন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জবীথিকায়
মঞ্জুল মর্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হতে
প্রাণমাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সেদিন বর্ষণমহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হ'ক মৃত্যুহীন।
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সংগীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্বপরিমলে।

১৩ জুলাই ১৯২৮
[শান্তিনিকেতন]

পরিশেষ

আশীর্বাদ

শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন
করকমলে—

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতস্রোতে রসবন্যাবেগে ;
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সংগীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে ;
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি মেঘজটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল ; কত রশ্মিচ্ছটা
প্রত্যুষে দিনের অন্তে রাখে তারি 'পরে
আলোকের স্পর্শমণি। আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
দিল বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশেষ

প্রণাম

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্র-করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি
যাত্রাপথে। সে-প্রত্যুষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলনক্ষণে লভিল পুলক দোঁহাকার
রক্ত-অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন-পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে
তুলিল হিল্লোলদোল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন,
শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হল অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয় নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্মে বেদনার যে-স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠাকম্পিত মূর্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে-নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া

এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ; যে-বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোকবন্দনামন্ত্র জপে— আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের 'পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোরকোরক মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্যডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরি কলস্বনা।
চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্যসনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরলরোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়ারৌদ্র সে-দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দবেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সংগীতসাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,— এই মোর রহিল প্রণাম।

৬ এপ্রিল ১৯৩১
শান্তিনিকেতন

বিচিত্রা

ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি বাজানো শিখাবে ব'লে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়াসুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে ;
লক্ষ্যহারা মিলিল তারা
রূপকথার বাটে,
পারায়ে গেল ধূলির সীমা
তেপান্তরী মাঠে।

নারিকেলের ডালের আগে
দুপুরবেলা কাঁপন লাগে,
ইশারা তারি লাগিত মোর প্রাণে,
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
কী বলে তারা কে বলো তাহা জানে।
অর্থহারা সুরের দেশে
ফিরালে দিনে দিনে,
ঝলিত মনে অবাক বাণী,
শিশির যেন তৃণে।
প্রভাত-আলো উঠিত কেঁপে
পুলকে কাঁপা বুকে,
বারণহীন নাচিত হিয়া
কারণহীন সুখে।

জীবনধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া।
প্রাণের সেই ঢেউয়ের তালে
বাজালে তুমি বীণ,
ব্যথায় মোর জাগায়ে নিয়ে
তারের রিনিরিন।
পালের 'পরে দিয়েছ বেগে
সুরের হাওয়া তুলে,
সহসা বেয়ে নিয়েছ তরী
অপূর্বেরি কূলে।

চৈত্রমাসে শুক্ল নিশা
জুঁহিবেলির গন্ধে মিশা ;
জলের ধ্বনি তটের কোলে কোলে
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
অনিদ্রারে আকুল করি তোলে।
যৌবনে সে উতল রাতে
করুণ কার চোখে
সোহিনী রাগে মিলাতে মিড়
চাঁদের ক্ষীণালোকে।
কাহার ভীরু হাসির 'পরে
মধুর দ্বিধা ভরি
শরমে-ছোঁওয়া নয়নজল
কাঁপাতে থরথরি।

হঠাৎ কভু জাগিয়া উঠি
ছিন্ন করি ফেলেছ টুটি

নিশীথিনীর মৌন যবনিকা,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হেনেছ তারে বজ্রানলশিখা।
গভীর রবে হাঁকিয়া গেছ
'অলস থেকো না গো।'
নিবিড় রাতে দিয়েছ নাড়া,
বলেছ 'জাগো জাগো।'
বাসরঘরে নিবালে দীপ,
ঘুচালে ফুলহার,
ধূলি-আঁচল দুলায়ে ধরা
করিল হাহাকার।

বুকের শিরা ছিন্ন করে
ভীষণ পুজা করেছি তোরে,
কখনো পুজা শোভন শতদলে,—
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।
ফসল যত উঠেছে ফলি
বক্ষ বিভেদিয়া
কণাকণায় তোমারি পায়
দিয়েছি নিবেদিয়া।
তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে ;
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব-করা দানে।

৭ বৈশাখ ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

জন্মদিন

রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
হয়ে আসে সমাপন।
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি
লহো মালাখানি।

উগ্র তব তপের আসন,
সেথায় তোমারে সম্ভাষণ
করেছিনু দিনে দিনে কঠিন স্তবনে
কখনো মধ্যাহ্নরৌদ্রে কখনো-বা ঝঞ্ঝার পবনে।
এবার তপস্যা হতে নেমে এসো তুমি—
দেখা দাও যেথা তব বনভূমি
ছায়াঘন, যেথা তব আকাশ অরুণ
আষাঢ়ের আভাসে করুণ।
অপরাহ্ণ যেথা তার ক্লান্ত অবকাশে
মেলে শূন্য আকাশে আকাশে
বিচিত্র বর্ণের মায়া; যেথা সন্ধ্যাতারা
বাক্যহারা
বাণীবহ্নি জ্বালি'
নিভৃতে সাজায় ব'সে অনন্তের আরতির ডালি।
শ্যামল দাক্ষিণ্যে ভরা
সহজ আতিথ্যে বসুন্ধরা
যেথা স্নিগ্ধ শান্তিময়;
যেথা তার অফুরান মাধুর্যসঞ্চয়
প্রাণে প্রাণে
বিচিত্র বিলাস আনে রূপে রসে গানে

বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হ'ক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।
আমি আজ ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে-কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধুলায়,
পাখির কুলায়
দিনে দিনে ভরি উঠে যে-সহজ গানে,
আলোকের ছোঁওয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে।
এই বিশ্বসত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।'

২৩ বৈশাখ ১৩৩৮

[শান্তিনিকেতন]

পান্থ

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে-যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভক্ষতি কান্নাহাসি,—
এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া;
সেই প্রবাহের 'পরে ঊষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র; অস্তসূর্য রক্তিম উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায়, সে-তরঙ্গে মাধবীমঞ্জরি
ভাসায় মাধুরীডালি,
পাখি তার গান দেয় ঢালি।
সে তরঙ্গনৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সংগীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক।

তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম ;
তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে ।

২৪ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

অপূর্ণ

যে-ক্ষুধা চক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে,
স্পর্শের যে-ক্ষুধা ফিরে দিকে দিকে বিশ্বের আহ্বানে
উপকরণের ক্ষুধা কাঙাল প্রাণের,
ব্রত তার বস্তু সন্ধানের,
মনের যে-ক্ষুধা চাহে ভাষা,
সঙ্গের যে-ক্ষুধা নিত্য পথ চেয়ে করে কার আশা,
যে-ক্ষুধা উদ্দেশহীন অজানার লাগি
অন্তরে গোপনে রয় জাগি—
সবে তারা মিলি নিতি নিতি
নানা আকর্ষণবেগে গড়ি তোলে মানস-আকৃতি ।
কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,
কত-না সংশয় তর্ক, কত না বিশ্বাস,
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত-না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা,—

মনগড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিনে ভেঙে করে ঢেলা,
অতীতের বোঝা হতে আবর্জনা কত
জটিল অভ্যাসে পরিণত,
বাতাসে বাতাসে ভাসা বাক্যহীন কত-না আদেশ
দেহহীন তর্জনীনির্দেশ,
হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি
কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে দেয় পুনঃ মুছি,
কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব তরে
কত-না আকাশযাত্রা কল্পপক্ষভরে,
কত মহিমার পুজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা,
কত জয় কত পরাভব—
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
ভালো মন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।

জন্মদিনে জন্মদিনে গাঁথনির কর্ম হবে শেষ,
সুখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্লেশ,
আরব্ধ ও অনারব্ধ সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ,
তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ
তুমি-রূপে পুঞ্জ হয়ে, শেষে
কয়দিন পূর্ণ করি কোথা গিয়ে মেশে।
যে-চৈতন্যধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতিহারা,
সে কিসের লাগি,—
নিদ্রায় আবিল কভু, কখনো-বা জাগি
বাস্তবে ও কল্পনায় আপনার রচি দিল সীমা,
গড়িল প্রতিমা।

অসংখ্য এ রচনায় উদ্ঘাটিছে মহা ইতিহাস,—
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস।

জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি' প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য করে জানা।
আছ আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আপন গদ্গদ বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
বাধা পায় প্রকাশ আগ্রহে,
মাঝখানে থেমে যায় মৃত্যুর শাসনে।
তোমার যে-সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলেরে নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা।
অপুর্ণতা আপনার বেদনায়
পুর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে-মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।

দার্জিলিং
অগ্রহায়ণ ? ১৩৩৮

আমি

আজ ভাবি মনে-মনে, তাহারে কি জানি
যাহার বলায় মোর বাণী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা,
যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরানে।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা
গণ্ডি দিয়ে মোর মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে।
ভেবেছিনু সে আমারি আমি
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি।

তবে কেন পড়ে মনে, নিবিড় হরষে
প্রেয়সীর দরশে পরশে
বারে বারে
পেয়েছিনু তারে
অতল মাধুরীসিন্ধুতীরে
আমার অতীত সে-আমিরে।
জানি তাই, সে-আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।
যে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।

যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেয়েছে জানিতে।

দিগন্তে বাদলবায়ুবেগে
নীল মেঘে
বর্ষা আসে নাবি।
বসে বসে ভাবি
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

তুমি

সূর্য যখন উড়াল কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে,
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিনু জানতে
সেই ধ্বনি ধায় বকুলশাখায়
প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়,
সুপ্ত কুলায়ে জাগায়ে সে যায়
আকাশপথের পান্থে।

অরুণরথের সে-ধ্বনি পথের
মন্ত্র শুনায়ে দিলে
তাই পায়ে-পায় দোঁহার চলায়
ছন্দ গিয়েছে মিলে।

তিমিরভেদন আলোর বেদন
লাগিল বনের বক্ষে,
নবজাগরণ পরশরতন
আকাশে এল অলক্ষ্যে।
কিশলয়দল হল চঞ্চল,
শিশিরে শিহরি করে ঝলমল,
সুরলক্ষ্মীর স্বর্ণকমল
ছুলে বিশ্বের চক্ষে।
রক্তরঙের উঠে কোলাহল
পলাশকুঞ্জময়,
তুমি আমি দোঁহে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহিনু আলোর জয়।

সংগীতে ভরি এ প্রাণের তরী
অসীমে ভাসিল রঙ্গে,
চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী
চলিলে আমার সঙ্গে।
চক্ষে তোমার উদিত রবির
বন্দনবাণী নীরব গভীর,
অস্তাচলের করুণ কবির
ছন্দ বসনভঙ্গে।
উষারুণ হতে রাঙা গোধূলির
দূরদিগন্তপানে
বিভাসের গান হল অবসান
বিধুর পুরবীতানে।

আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটেছে বিশ্বচিত্র,
তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে
উদ্‌গাথা সুপবিত্র।
অতল তোমার চিত্তগহন,
মোর দিনগুলি সফেন নাচন,
তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
অনিত্য আমি নিত্য।
মোর ফাল্গুন হারায় যখন
আশ্বিনে ফিরে লহ।
তব অপরূপে মোর নবরূপ
দুলাইছ অহরহ।

আসিছে রাত্রি স্বপনধাত্রী,
বনবাণী হল শান্ত।
জলভরা ঘটে চলে নদীতটে
বধূর চরণ ক্লান্ত।
নিখিলে ঘনাল দিবসের শোক,
বাহির-আকাশে ঘুচিল আলোক,
উজ্জ্বল করি অন্তরলোক
হৃদয়ে এলে একান্ত।
লুকানো আলোয় তব কালো চোখ
সন্ধ্যাতারার দেশে
ইঙ্গিত তার গোপনে পাঠাল
জানি না কী উদ্দেশে।

দেখেছি তোমার আঁখি সুকুমার
নবজাগরিত বিশ্বে।
দেখিনু হিরণ হাসির কিরণ
প্রভাতোজ্জ্বল দৃশ্যে।

হয়ে আসে যবে যাত্রাবসান
বিমল আঁধারে ধুয়ে দিলে প্রাণ,
দেখিনু মেলেছ তোমার নয়ান
অসীম দূর ভবিষ্যে।
অজানা তারায় বাজে তব গান
হারায় গগনতলে।
বক্ষ আমার কাঁপে দুরু দুরু,
চক্ষু ভাসিল জলে।

প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি
মোর সংগীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি
তব আলিপনলিপ্তি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এল যে রাতি।

চেনা মুখখানি আর নাহি জানি।
আঁধারে হতেছে গুপ্ত,
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ,
কোথায় সে হায় সুপ্ত।
অবগুণ্ঠিত তব চারিধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত।

শুধু ঝিল্লির ঘন ঝংকার
নীরবের বুকে বাজে।
কাছে আছ তবু গিয়েছ হারায়ে
দিশাহারা নিশামাঝে।

এ জীবনময় তব পরিচয়
এখানে কি হবে শূন্য।
তুমি যে-বীণার বেঁধেছিলে তার
এখনি কি হবে ক্ষুণ্ণ।
যে-পথে আমার ছিলে তুমি সাথী
সে পথে তোমার নিবায়ো না বাতি,
আরতির দীপে আমার এ রাতি
এখনো করিয়ো পুণ্য।
আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়,
মরণসভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকের জয়।

৭ নবেম্বর ১৯৩০
আল্‌গন্ কুয়িন্। নূয়র্ক

আছি

বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে
কুয়োর ধারে কলাগাছের দীর্ণ পাতে পাতে;
গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধুলা উড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায়;

আশুক্লান্ত বেলগুলি সব শীর্ণ হয়ে আসে,
ম্লান গন্ধ কুড়িয়ে তারি ছড়িয়ে বেড়ায় সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ;
শুকনো টগর উড়িয়ে ফেলে,
চিকন কচি অশথ পাতায় যা খুশি তাই খেলে ;
বাঁশের গাছে কী নিয়ে তার কাড়াকাড়ি,
খেজুর গাছের শাখায় শাখায় নাড়ানাড়ি ;
বটের শাখে ঘনসবুজ ছায়ানিবিড় পাখির পাড়ায়
হুহু করে ধেয়ে এসে ঘুঘু দুটির নিদ্রা ছাড়ায় ;
রুক্ষ কঠিন রক্তমাটি ঢেউ খেলিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরে
তার মাঝে ওর থেকে থেকে নাচন ঘুরে ঘুরে ;
খেপে উঠে হঠাৎ ছোটে তালের বনে উত্তরে দিক্‌সীমায়
অস্ফুট ঐ বাষ্পনীলিমায় ;
টেলিগ্রাফের তারে তারে
সুর সেধে নেয় পরিহাসের ঝংকারে ঝংকারে ;
এমনি করে বেলা বহে যায়,
এই হাওয়াতে চুপ করে রই একলা জানালায়।
ঐ যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা।
না থাক্‌ খ্যাতি, না থাক্‌ কীর্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার,—
আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।

১৯ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

বালক

বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুইপহরে
দ্বারের 'পরে হেলিয়ে মাথা
মেঝে মাদুর পাতা,
একা একা কাটত রোদের বেলা,—
না মেনেছি পড়ার শাসন, না করেছি খেলা।
দূর আকাশে ডেকে যেত চিল,
সিসুগাছের ডালপালা সব বাতাসে ঝিলমিল।
তপ্ত তৃষায় চঞ্চু করি ফাঁক
প্রাচীর-'পরে ক্ষণে ক্ষণে বসত এসে কাক।
চড়ুই পাখির আনাগোনা মুখর কলভাষা,
ঘরের মধ্যে কড়ির কোণে ছিল তাদের বাসা।
ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায় গলির ওপার থেকে—
দূরের ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে কে।
কখন্ মাঝে-মাঝে
ঘড়িওয়ালা কোন্ বাড়িতে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।
সামনে বিরাট অজানিত, সামনে দৃষ্টি-পেরিয়ে-যাওয়া দূর
বাজাত কোন্ ঘর-ভোলানো সুর।
কিসের পরিচয়ের লাগি
আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই ছিল জাগি।
অকারণের ভালোলাগা
অকারণের ব্যথায় মিলে গাঁথত স্বপন নাইক গোড়া আগা।
সাথীহীনের সাথী
মনে হত দেখতে পেতেম দিগন্তে নীল আসন ছিল পাতি।

সত্তরে আজ পা দিয়েছি আয়ুশেষের কূলে
অন্তরে আজ জানলা দিলেম খুলে।

তেমনি আবার বালকদিনের মতো
চোখ মেলে মোর সুদূর-পানে বিনা কাজে প্রহর হল গত।
প্রখর তাপের কাল,
ঝরঝরিয়ে কেঁপে ওঠে শিরীষগাছের ডাল;
কুয়োর ধারে তেঁতুলতলায় ঢুকে
পাড়ার কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে ভিজে মাটির স্নিগ্ধ পরশসুখে;
গাড়ির গোরু ক্ষণকালের মুক্তি পেয়ে ক্লান্ত আছে শুয়ে
জামের ছায়ায় তৃণবিহীন ভুঁয়ে।
কাঁকর-পথের পারে
শুকনো পাতার দৈন্য জমে গন্ধরাজের সারে।
চেয়ে আছি দু-চোখ দিয়ে সব-কিছুরে ছুঁয়ে,
ভাবনা আমার সবার মাঝে থুয়ে।
বালক যেমন নগ্ন-আবরণ,
তেমনি আমার মন
ঐ কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে
বিনা বাধায় এক হয়ে যায় মিলে।
সকল জানার মাঝে
চিরকালের না-জানা কার শঙ্খধ্বনি বাজে।
এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার গোপন আনাগোনা
সেই আমারে করেছে আন্‌মনা।

২১ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

বর্ষশেষ

যাত্রা হয়ে আসে সারা,— আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
অস্তসূর্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটি
ছড়ায় ঐশ্বর্য তার ভরি দুই মুঠি।

বর্ণসমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
জীবনের হেরিনু মহিমা।

এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি,—
কত ভালোবেসেছিনু আমি।
অনন্ত রহস্য তারি উচ্ছলি আপন চারিধার
জীবন মৃত্যুরে দিল করি একাকার;
বেদনার পাত্র মোর বারম্বার দিবসে নিশীথে
ভরি দিল অপূর্ব অমৃতে।

দুঃখের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকী,
হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী।
কত দিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা,
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইশারা।
নিন্দার কণ্টকমাল্যে বক্ষ বিঁধিয়াছে বারে বারে,
বরমাল্য জানিয়াছি তারে।

আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে-লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম-উপবনে,
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব অঙ্গে-মনে।
যে-নিশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে,
তারে আমি ধরেছি বাঁশিতে।

যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।

লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি।

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।

যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ,
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে,
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ভুলি কেন নাম,
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম।
অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ;
উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।
এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে।

আজি এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন,
মৃত্যু, তুমি ঘুচাও গুণ্ঠন।
কত কী গিয়েছে ঝরে, জানি জানি কত স্নেহ প্রীতি
নিবায়ে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি।
মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে,
ওগো শেষ অশেষের ধনে।

৩০ চৈত্র ১৩৩৩
[শান্তিনিকেতন]

মুক্তি

১

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর,
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতনপীড়া হতে,
দিয়ো না দুলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে,
ক্ষোভের বিক্ষেপবেগে। শ্রাবণসন্ধ্যার পুষ্পবনে
গ্লানিহীন যে-সাহস সুকুমার যূথীর জীবনে—
নির্মম বর্ষণঘাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর,
মুহূর্তের প্রাণটিতে ভরি তোলে অনন্তের সুর,
সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণশয্যা-'পরে,
পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার বিনম্র অন্তরে
সুগন্ধে রচিয়া তোলে ; দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ
আপনার সুন্দর সীমায় ;— দ্বিধাশূন্য সরলতা
গাঁথুক শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা।

১ জুলাই ১৯২৭

২

আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি
হে সুন্দর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,
তোমার আহ্বানবাণী। আজ তব বাজুক বাঁশরি,
চিত্তভরা শ্রাবণপ্লাবনরাগে,— যেন গো পাসরি
নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবায়ে ক্ষুব্ধ কোলাহল,
ধূলির নিবিড় টান পদতলে। রয়েছি নিশ্চল
সারাদিন পথপার্শ্বে; বেলা হয়ে এল অবসান,
ঘন হয়ে আসে ছায়া, শ্রান্ত সূর্য করিছে সন্ধান
দিগন্তে অন্তিম শান্তি। দিবা যথা চলেছে নির্ভীক
চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক
আপনার কাছ হতে অন্তহীন অজানার পানে
অসীমের সংগীতে উদাসী,— সেইমতো আত্মদানে
আমারে বাহির করো, শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হ'ক সুর,
নিয়ে যাক পথে পথে হে অলক্ষ্য, হে মহাসুদূর।

২ জুলাই ১৯২৭

আহ্বান

আমার তরে পথের 'পরে কোথায় তুমি থাক
সে-কথা আমি শুধাই বারে বারে।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখ
আমার লাগি নিভৃতে একধারে।
বাতাস বেয়ে ইশারা পেয়ে গেছি মিলন-আশে
শিশিরধোয়া আলোতে-ছোঁয়া শিউলিছাওয়া ঘাসে,
খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলিকলভাষে
অধীরধারা নদীর পারে পারে।

আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা,
তটের তলে স্বচ্ছ জলে ছায়ার যেথা খেলা,
অশথশাখে কপোত ডাকে, সেথায় সারাবেলা
তোমার বাঁশি শুনেছি বারে বারে।

কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাক,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরি।
শরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলি নাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।
পাষাণ ভিত টলিছে যেথা ক্ষিতির বুক ফাটি
ধুলায়-চাপা অনলশিখা কাঁপায়ে তোলে মাটি,
নিমেষ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি,
সেথায় ভেরি বাজাও বারে বারে।

৪ শ্রাবণ ১৩৩৪
সিঙাপুর বন্দর

দুয়ার

হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ,
রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।
অন্তরে কী আছে তাহা বোঝে না সে, তাই
প্রবেশিতে সংশয় সদাই।

হে দুয়ার, নিত্য জাগে রাত্রিদিনমান
 সুগম্ভীর তোমার আহ্বান।
সূর্যের উদয়-মাঝে খোল আপনারে।
 তারকায় খোল অন্ধকারে।

হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে
 খোল পথ, ফুল হতে ফলে।
যুগ হতে যুগান্তর কর অবারিত,
 মৃত্যু হতে পরম অমৃত।

হে দুয়ার, জীবলোক তোরণে তোরণে
 করে যাত্রা মরণে মরণে।
মুক্তিসাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
 'মাভৈঃ' বাজে নৈরাশ্যনিশীথে।

[১৩৩৪]

দীপিকা

প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায়,
 জ্বাল তব নব দীপিকা।
প্রত্যূষপটে প্রতিদিন লেখ
 আলোকের নব লিপিকা।
অন্ধকারের সাথে দুর্বার
সংগ্রাম তব হয় বারবার,
দিনে দিনে হয় কত পরাজয়,
 দিনে দিনে জয়সাধনা।
পথ ভুলে ভুলে পথ খুঁজে লও,
সেই উৎসাহে পথদুখ বও,

দেববিদ্রোহে বাঁধা পড় মোহে
তবে হয় দেবারাধনা।

খেলাঘর ভেঙে বাঁধ খেলাঘর,
খেল ভেঙে ভেঙে খেলেনা।
বাসা বেঁধে বেঁধে বাসা ভাঙে মন
কোথাও আসন মেলে না।
জানি পথশেষে আছে পারাবার,
প্রতিখনে সেথা মেশে বারিধার,
নিমেষে নিমেষে তবু নিঃশেষে
ছুটিছে পথিক তটিনী।
ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান,
মরণে মরণে চকিত চরণে
ছুটে চলে প্রাণনটিনী।

২৫ ফাল্গুন [১৩৩৩]

লেখা

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হ'ক লয়
সমাপ্তির রেখাদুর্গ। নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
অনভিজ্ঞ নিক জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে

যায় প্রতিমার দিন। ধুলা তারে ডাক দিয়ে কয়,—
"ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।"

১১ চৈত্র ১৩৩৩

নূতন শ্রোতা

১

শেষ লেখাটার খাতা
পড়ে শোনাই পাতার পরে পাতা,
অমিয়নাথ স্তব্ধ হয়ে দোলায় মুগ্ধ মাথা।
উচ্ছ্বসি কয়, "তোমার অমর কাব্যখানি
নিত্যকালের ছন্দে লেখা সত্যভাষার বাণী।"

দড়িবাঁধা কাঠের গাড়িটারে
নন্দগোপাল ঘটর ঘটর টেনে বেড়ায় সভাঘরের দ্বারে।
আমি বলি, "থাম্ রে বাপু, থাম্,
দুষ্টুমি এর নাম,—
পড়ার সময় কেউ কি অমন বেড়ায় গাড়ি ঠেলে।
দেখ্ দেখি তোর অমিকাকা কেমন লক্ষ্মীছেলে।"

অনেক কষ্টে ভালোমানুষ-বেশে
বসল নন্দ অমিকাকার কোলের কাছে ঘেঁষে।
দুরন্ত সেই ছেলে
আমার মুখে ডাগর নয়ন মেলে

চুপ করে রয় মিনিট কয়েক, অমিরে কয় ঠেলে,
"শোনো অমিকাকা,
গাড়ির ভাঙা চাকা
সারিয়ে দেবে বলেছিলে, দাও এঁটে ইস্ক্রুপ।"
অমি বললে কানে-কানে, "চুপ চুপ চুপ।"
আবার খানিক শান্ত হয়ে শুনল বসে নন্দ
কবিবরের অমর ভাষার ছন্দ।

একটু পরে উস্‌খুসিয়ে গাড়ির থেকে দশবারোটা কড়ি
মেজের 'পরে করলে ছড়াছড়ি।
ঝম্‌ঝমিয়ে কড়িগুলো গুন্‌গুনিয়ে আউড়ে চলে ছড়া,—
এর পরে আর হয় না কাব্য পড়া।
তার ছড়া আর আমার ছড়ায় আর কতখন চলবে রেষারেষি,
হার মানতে হবেই শেষাশেষি।

অমি বললে, "দুষ্টু ছেলে।" নন্দ বললে, "তোমার সঙ্গে আড়ি,—
নিয়ে যাব গাড়ি,
দিন্‌দাদাকে ডাকব ছাতে ইস্টিশনের খেলায়,
গড়গড়িয়ে যাবে গাড়ি বদ্দিবাটির মেলায়।"
এই বলে সে ছল্‌ছলানি চোখে
গাড়ি নিয়ে দৌড়ে গেল কোন্‌ দিকে কোন্‌ ঝোঁকে।

আমি বললেম, যাও অমিয়, আজকে পড়া থাক্‌,
নন্দগোপাল এনেছে তার নতুনকালের ডাক।
আমার ছন্দে কান দিল না ও যে
কী মানে তার আমিই বুঝি আর যারা নাই বোঝে।
যে-কবির ও শুনবে পড়া সেও তো আজ খেলার গাড়ি ঠেলে,
ইস্টিশনের খেলাই সেও খেলে।
আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়ায় পাড়ি,
তার মেলাতে পৌঁছবে তার গাড়ি,

আমার পড়ার মাঝে
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে
নতুন কালের বাঁশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে।
ভরেছিলেম এই ফাগুনের ডালা
তা নিয়ে কেউ নাই-বা গাঁথুক আর-ফাগুনের মালা।

১৯ অগস্ট ১৯২৭
প্লানসিউস জাহাজ

২

বছর বিশেক চলে গেল সাঙ্গ তখন ঠেলাগাড়ির খেলা;
নন্দ বললে, "দাদামশায়, কী লিখেছ শোনাও তো এইবেলা!"
পড়তে গেলেম ভরসাতে বুক বেঁধে,
কণ্ঠ যে যায় বেধে;
টেনে টেনে বাহির করি এ খাতা ওই খাতা,
উলটে মরি এ পাতা ওই পাতা।
ভয়ের চোখে যতই দেখি লেখা,
মনে হয় যে রস কিছু নেই, রেখার পরে রেখা।
গোপনে তার মুখের পানে চাহি,
বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি।
নতুনকালের শানদেওয়া তার ললাটখানি খরখড়্গ-সম,
শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম।
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি,
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি।
সংসারেতে গর্তগুহা যেখানে-যা সবখানে দেয় উঁকি,
অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি।

তীব্র তাহার হাস্য
বিশ্বকাজের মোহমুক্ত ভাষ্য।

একটু কেশে পড়া করলেম শুরু
যৌবনে যা শিখিয়েছিলেন অন্তর্যামী আমার কবিগুরু,—
প্রথম প্রেমের কথা,
আপ্‌নাকে সেই জানে না যেই গভীর ব্যাকুলতা,
সেই যে বিধুর তীব্রমধুর তরাসদোদুল বক্ষ দুরু দুরু,—
উড়ো পাখির ডানার মতো যুগল কালো ভুরু,
নীরব চোখের ভাষা,
এক নিমেষে উচ্ছলি দেয় চিরদিনের আশা,
তাহারি সেই দ্বিধার ঘায়ে ব্যথায় কম্পমান
দুটি-একটি গান।
এড়িয়ে-চলা জলধারার হাস্যমুখর কলকলোচ্ছ্বাস,
পুজায়-স্তব্ধ শরৎপ্রাতের প্রশান্ত নিশ্বাস,
বৈরাগিণী ধূসর সন্ধ্যা অস্তসাগরপারে,
তন্দ্রাবিহীন চিরন্তনের শান্তিবাণী নিশীথ-অন্ধকারে,—
ফাগুনরাতির স্পর্শমায়ায় অরণ্যতল পুষ্পরোমাঞ্চিত,
কোন্ অদৃশ্য সুচিরবাঞ্ছিত
বনবীথির ছায়াটিরে
কাঁপিয়ে দিয়ে বেড়ায় ফিরে ফিরে,
তারি চঞ্চলতা
মর্মরিয়া কইল যে-সব কথা,
তারি প্রতিধ্বনিভরা
দু-একটা চৌপদী আমার সসংকোচে পড়ে গেলেম ত্বরা।

পড়া আমার শেষ হল যেই, ক্ষণেক নীরব থেকে
নন্দগোপাল উৎসাহেতে বলল হঠাৎ ঝোঁকে,—

"দাদামশায়, শাবাশ।
তোমার কালের মনের গতি, পেলেম তারি ইতিহাসের আভাস।"
খাতা নিতে হাত বাড়াল, চাদরেতে দিলেম তাহা ঢাকা,
কইনু তারে, "দেখ্ তো ভায়া, কোথায় আছে তোর অমিয়কাকা।"

২৭ অক্টোবর [১৯২৭]
আবা-মারু জাহাজ। গঙ্গা

আশীর্বাদ

তরুণ আশীর্বাদপ্রার্থীর প্রতি প্রাচীন কবির নিবেদন
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের উদ্দেশে—

নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে।
ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, "আশীর্বাদ মাগি
হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশিস তোমারি তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া
প্রভাতসূর্যের করে; ধ্যানমগ্ন গিরিতপস্বীর
বিগলিত করুণার প্রবাহিত আশীর্বাদনীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায়া হতে,
নির্জনে একান্তে বসি, দেখি নির্বারিত স্রোতে
সংগীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ, পথরোধী পাষাণসঞ্চয়,
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনার জাগায় উৎসাহ।"

১৪ পৌষ ১৩৩৫

মোহানা

ইরাবতীর মোহানামুখে কেন আপনভোলা
সাগর তব বরন কেন ঘোলা।
কোথা সে তব বিমল নীল স্বচ্ছ চোখে চাওয়া,
রবির পানে গভীর গান গাওয়া ?
নদীর জলে ধরণী তার পাঠাল এ কী চিঠি,
কিসের ঘোরে আবিল হল দিঠি।
আকাশ-সাথে মিলায়ে রঙ আছিলে তুমি সাজি,
ধরার রঙে বিলাস কেন আজি।
রাতের তারা আলোকে আজ পরশ করে যবে
পায় না সাড়া তোমার অনুভবে ;
প্রভাত চাহে স্বচ্ছ জলে নিজেরে দেখিবারে,
বিফল করি ফিরায়ে দাও তারে।

নিয়েছ তুমি ইচ্ছা করি আপন পরাজয়,
মানিতে হার নাহি তোমার ভয়।
বরন তব ধূসর কর, বাঁধন নিয়ে খেল,
হেলায় হিয়া হারায়ে তুমি ফেল।
এ-লীলা তব প্রান্তে শুধু তটের সাথে মেশা,
একটুখানি মাটির লাগে নেশা।
বিপুল তব বক্ষ-'পরে অসীম নীলাকাশ,
কোথায় সেথা ধরার বাহুপাশ।
ধুলারে তুমি নিয়েছ মানি, তবুও অমলিন,
বাঁধন পরি স্বাধীন চিরদিন।
কালীরে রহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,
বাঁধে না তাঁরে আলো কলুষজাল।

৭ কার্তিক ১৩৩৪। কালীপূজা
[ইরাবতীসংগম। বঙ্গসাগর]

বক্‌সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।

'অমৃতের পুত্র মোরা'— কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
দার্জিলিং

দুর্দিনে

দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি
কর্মে জড়ায় গ্রন্থি,
মন্থর দিন পাথেয়বিহীন
দীর্ঘ পথের পন্থী;

নির্দয়তম নিন্দার হাস,
নির্মমতম দৈব,
শূন্যে শূন্যে হতাশ বাতাস
ফুকারে 'নৈব নৈব'—
হঠাৎ তখন কহে মোরে মন,
'মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
প্রাণে যদি রয় গান অক্ষয়
সুর যদি রয় চিত্তে।'

চৌদিক করে যুদ্ধঘোষণ,
দুর্গম হয় পন্থা,
চিন্তায় করে রক্ত শোষণ
প্রখর-নখরদন্তা,
নিরানন্দের ঘিরি রহে ঘের,
নাই জীবনের সঙ্গী,
দৈন্য কুরূপ করে বিদ্রূপ
ব্যঙ্গের মুখভঙ্গী—
মন বলে, 'নাই ভাবনা কিছুই
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
অন্তর-মাঝে চিরধনী তুই
অন্তবিহীন বিত্তে।'

ভাষাহীন দিন কুয়াশাবিলীন—
মলিন উষার স্বর্ণ,
কল্পনা যত বাদুড়ের মতো
রাতে ওড়ে কালো বর্ণ ;
আবর্জনার অচলপুঞ্জে
যাত্রার পথ রুদ্ধ,
রিক্তকুসুম শুষ্ক কুঞ্জে
বৈশাখ রহে ক্রুদ্ধ—

মন মোরে কয়, 'এ কিছুই নয়,
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
আপনায় ভুলে গাও প্রাণ খুলে,
নাচো নিখিলের নৃত্যে।'

বদ্ধদুয়ার বিশ্ব বিরাজে,
নিবেছে ঘরের দীপ্তি,
চির-উপবাসী আপনার মাঝে
আপনি না পাই তৃপ্তি,
পদে পদে রয় সংশয় ভয়,
পদে পদে প্রেম ক্ষুণ্ণ,
বৃথা আহ্বান, বৃথা অনুনয়,
সখার আসন শূন্য—
মন বলি উঠে, 'ডুবে যা গভীরে,
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
নিবিড় ধেয়ানে নিখিল লভি রে
আপনারি একাকিত্বে।'

২৬ অক্টোবর ১৯২৭
আবা-মারু। বঙ্গসাগর

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

পৌষ ১৩৩৮

ভিক্ষু

হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর,
নিঃশেষে দে বিদায় রে।
ভিক্ষাতে শুভলগ্নের ক্ষয়
কোন্ ভুলে তুই ভুলিলি,
ভাণ্ডার তোর পণ্ড-যে হয়,
অর্গল নাহি খুলিলি।
আপনারে নিয়ে আবরণ দিয়ে
এ কী কুৎসিত ছলনা;
জীর্ণ এ চীর ছদ্মবেশীর,
নিজেরে সে কথা বল না।

হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
মিথ্যা মায়ার ছায়া ঘুচাবার
মন্ত্র কে নিবি আয় রে

কাঙাল যে জন পায় না সে ধন,
পায় সে কেবল ভিক্ষা।
চির-উপবাসী মিছা-সন্ন্যাসী
দিয়েছে তাহারে দীক্ষা।
তোর সাধনায় রত্নমানিক
পথে পথে যাস ছড়ায়ে,
ভিক্ষার ঝুলি, ধিক্‌ তারে ধিক্‌,
বহিস নে শিরে চড়ায়ে।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বজনের দুঃস্বপনের
বন্ধ, ছিঁড়িস তায় রে।

অঞ্চলে রাতি ভিক্ষার কণা
সঞ্চয় করে তারাতে,
নিয়ে সে পারানি তবু পারিল না
তিমিরসিন্ধু পারাতে।
পূর্বগগন আপনার সোনা
ছড়াল যখন দ্যুলোকে,
পূর্ণের দানে পূর্ণ কামনা
প্রভাত পুরিল পুলকে।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
আপনা-মাঝারে গোপন রাজারে
মন যেন তোর পায় রে।

২৩ জুন ১৯২৮
বাঙ্গালোর

আশীর্বাদী

কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে

তোমারে জননী ধরা
দিল রূপে রসে ভরা
প্রাণের প্রথম পাত্রখানি,
তাই নিয়ে তোলাপাড়া
ফেলাছড়া নাড়াচাড়া
অর্থ তার কিছুই না জানি।
কোন্ মহারঙ্গশালে
নৃত্য চলে তালে তালে,
ছন্দ তারি লাগে রক্তে তব।
অকারণ কলরোলে
তাই তব অঙ্গ দোলে,
ভঙ্গী তার নিত্য নব নব।
চিন্তা-আবরণহীন
নগ্নচিত্ত সারাদিন
লুটাইছে বিশ্বের প্রাঙ্গণে,
ভাষাহীন ইশারায়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়
যাহা-কিছু দেখে আর শোনে।
অস্ফুট ভাবনা যত
অশথপাতার মতো
কেবলি আলোয় ঝিলিমিলি।
কী হাসি বাতাসে ভেসে
তোমারে লাগিছে এসে,
হাসি বেজে ওঠে খিলিখিলি।
গ্রহ তারা শশী রবি
সমুখে ধরেছে ছবি
আপন বিপুল পরিচয়।

কচি কচি দুই হাতে
খেলিছ তাহারি সাথে,
নাই প্রশ্ন, নাই কোনো ভয়।
তুমি সর্ব দেহে মনে
ভরি লহ প্রতিক্ষণে
যে সহজ আনন্দের রস,
যাহা তুমি অনায়াসে
ছড়াইছ চারিপাশে
পুলকিত দরশ পরশ,
আমি কবি তারি লাগি
আপনার মনে জাগি,
বসে থাকি জানালার ধারে।
অমরার দূতীগুলি
অলক্ষ্য দুয়ার খুলি
আসে যায় আকাশের পারে।
দিগন্তে নীলিম ছায়া
রচে দূরান্তের মায়া,
বাজে সেথা কী অশ্রুত বেণু।
মধ্যদিন তন্দ্রাতুর
শুনিছে রৌদ্রের সুর,
মাঠে শুয়ে আছে ক্লান্ত ধেনু।
চোখের দেখাটি দিয়ে
দেহ মোর পায় কী এ,
মন মোর বোবা হয়ে থাকে।
সব আছে আমি আছি,
দুইয়ে মিলে কাছাকাছি
আমার সকল-কিছু ঢাকে।
যে-আশ্বাসে মর্ত্যভূমি
হে শিশু, জাগাও তুমি,
যে নির্মল যে সহজ প্রাণে,

কবির জীবনে তাই
যেন বাজাইয়া যাই
তারি বাণী মোর যত গানে।
ক্লান্তিহীন নব আশা
সেই তো শিশুর ভাষা,
সেই ভাষা প্রাণদেবতার,
জরার জড়ত্ব ত্যেজে
নব নব জন্মে সে যে
নব প্রাণ পায় বারম্বার।
নৈরাশ্যের কুহেলিকা
উষার আলোকটিকা
ক্ষণে ক্ষণে মুছে দিতে চায়,
বাধার পশ্চাতে কবি
দেখে চিরন্তন-রবি
সেই দেখা শিশুচক্ষে ভায়।
শিশুর সম্পদ বয়ে
এসেছ এ-লোকালয়ে,
সে-সম্পদ থাক্ অমলিনা।
যে-বিশ্বাস দ্বিধাহীন
তারি সুরে চিরদিন
বাজে যেন জীবনের বীণা।

৮ কার্তিক ১৩৩৮
দার্জিলিং

অবুঝ মন

অবুঝ শিশুর আবছায়া এই নয়নবাতায়নের ধারে
আপনাভোলা মনখানি তার অধীর হয়ে উঁকি মারে।
বিনাভাষার ভাবনা নিয়ে কেমন আঁকুবাঁকুর খেলা,—
হঠাৎ ধরা, হঠাৎ ছড়িয়ে ফেলা,

হঠাৎ অকারণ
কী উৎসাহে বাহু নেড়ে উদ্দাম গর্জন।
হঠাৎ দুলে দুলে ওঠে,
অর্থবিহীন কোন্ দিকে তার লক্ষ ছোটে।
বাহির-ভুবন হতে
আলোর লীলায় ধ্বনির স্রোতে
যে-বাণী তার আসে প্রাণে
তারি জবাব দিতে গিয়ে কী-যে জানায় কেই তা জানে

এই যে অবুঝ এই যে বোবা মন
প্রাণের 'পরে ঢেউ জাগিয়ে কৌতুকে যে অধীর অনুক্ষণ,
সর্ব দিকেই সর্বদা উন্মুখ,
আপনারি চাঞ্চল্য নিয়ে আপ্‌নি সমুৎসুক,—
নয় বিধাতার নবীন রচনা এ,
ইহার যাত্রা আদিম যুগের নায়ে।
বিশ্বকবির মানস-সরোবরে
প্রাতঃস্নানের পরে
প্রাণের সঙ্গে বাহির হল, তখন অন্ধকার,
নিয়ে এল ক্ষীণ আলোটি তার।
তারি প্রথম ভাষাবিহীন কূজনকাকলি যে
বনে বনে শাখায় পাতায় পুষ্পে ফলে বীজে
অঙ্কুরে অঙ্কুরে
উঠল জেগে ছন্দে সুরে সুরে।
সুর্য-পানে অবাক আঁখি মেলি
মুখরিত উচ্ছল তার কেলি।

নানারূপের খেলনা যে তার নানা বর্ণে আঁকে,
বারেক খোলে, বারেক তারে ঢাকে।

রোদবাদলে করুণ কান্না হাসি
সদাই ওঠে আভাসি উচ্ছ্বাসি।

ওই যে শিশুর অবুঝ ভোলা মন
তরীর কোণে বসে বসে দেখছি তারি আকুল আন্দোলন।
মাঝে-মাঝে সাগর-পানে তাকিয়ে দেখি যত
মনে ভাবি, ও যেন এই শিশু-আঁখির মতো,
আকাশ-পানে আবছায়া ওর চাওয়া
কোন্ স্বপনে-পাওয়া,
অন্তরে ওর যেন সে কোন্ অবুঝ ভোলা মন
এ-তীর হতে ও-তীর পানে দুলছে অনুক্ষণ।
কেমন কলভাষে
প্রলয়কাঁদন কাঁদে ও যে প্রবল হাসি হাসে
আপ্‌নিও তার অর্থ আছে ভুলে,—
ক্ষণে ক্ষণে শুধুই ফুলে ফুলে
অকারণে গর্জি উঠে শূন্যে শূন্যে মূঢ় বাহু তুলে।

বিরাট অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপ্‌নারে তার অধীর অন্বেষণ।
ঘর হতে ধায় আগুন-পানে, আগুন হতে পথে,
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্নবিষম অরণ্যে পর্বতে ;
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে
পায়ের তলায় ধরণীরে আঘাত করে ধুলায় আকাশ ব্যেপে ;
হঠাৎ খেপে উঠে
রুদ্ধ পাষাণভিত্তি-'পরে বেড়ায় মাথা কুটে।
অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপনগড়া
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠাপড়া
হঠাৎ উঠে ঝেঁকে
যায় সে ছুটে কী রাঙা রঙ দেখে
অদৃশ্য কোন্ দূর দিগন্ত-পানে ;

আবছায়া কোন্ সন্ধ্যা-আলোয় শিশুর মতো তাকায় অনুমানে,
তাহার ব্যাকুলতা
স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা।

২০ অক্টোবর ১৯২৭
আবা-মারু জাহাজ

পরিণয়

সুরমা ও সুরেন্দ্রনাথ কর -এর বিবাহ উপলক্ষে

ছিল চিত্রকল্পনায়, এতকাল ছিল গানে গানে,
সেই অপরূপ এল রূপ ধরি তোমাদের প্রাণে।
আনন্দের দিব্যমূর্তি সে-যে,
দীপ্ত বীরতেজে
উত্তরিয়া বিঘ্ন যত দূর করি ভীতি
তোমাদের প্রাঙ্গণেতে হাঁক দিল, 'এসেছি অতিথি'।

জ্বালো গো মঙ্গলদীপ করো অর্ঘ্য দান
তনু মনপ্রাণ।
ও যে সুরভবনের রমার কমলবনবাসী,
মর্ত্যে নেমে বাজাইল সাহানায় নন্দনের বাঁশি।
ধরার ধূলির 'পরে
মিশাইল কী আদরে
পারিজাতরেণু।
মানবগৃহের দৈন্যে অমরাবতীর কল্পধেনু
অলক্ষ্য অমৃতরস দান করে
অন্তরে অন্তরে।
এল প্রেম চিরন্তন, দিল দোঁহে আনি
রবিকরদীপ্ত আশীর্বাণী।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

চিরন্তন

এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ধুলোয় আকাশ ঢেকে
গাড়ি আমার চলতেছিল হেঁকে।
হেনকালে নেবুর ডালে স্নিগ্ধ ছায়ায় উঠল কোকিল ডেকে
পথকোণের ঘন বনের থেকে।

এই পাখিটির স্বরে
চিরদিনের সুর যেন এই একটি দিনের 'পরে
বিন্দু বিন্দু ঝরে।
ছেলেবেলায় গঙ্গাতীরে আপন-মনে চেয়ে জলের পানে
শুনেছিলেম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে
অসীমকালের অনির্বচনীয়
প্রাণে আমার শুনিয়েছিল, "তুমি আমার প্রিয়।"

সেই ধ্বনিটি কানন ব্যেপে পল্লবে পল্লবে
জলের কলরবে
ওপার-পানে মিলিয়ে যেত সুদূর নীলাকাশে।
আজ এই পরবাসে
সেই ধ্বনিটি ক্ষুব্ধ পথের পাশে
গোপন শাখার ফুলগুলিরে দিল আপন বাণী।
বনচ্ছায়ার শীতল শান্তিখানি
প্রভাত-আলোর সঙ্গে করে নিবিড় কানাকানি
ওই বাণীটির বিমল সুরে গভীর রমণীয়,—
"তুমি আমার প্রিয়।"

এরি পাশেই নিত্য হানাহানি;
প্রতারণার ছুরি
পাঁজর কেটে করে চুরি

সরল বিশ্বাস ;
কুটিল হাসি ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্বনাশ।
নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি পৃথ্বীব্যাপী মানববিভীষিকা
জ্বালায় মানবলোকালয়ে প্রলয়বহ্নিশিখা,
লোভের জালে বিশ্বজগৎ ঘেরে,
ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপনহানা অন্ধ মানুষেরে।

হেনকালে স্নিগ্ধ ছায়ায় হঠাৎ কোকিল ডাকে
ফুল্ল অশোকশাখে ;
পরশ করে প্রাণে
যে-শান্তিটি সব-প্রথমে, যে-শান্তিটি সবার অবসানে,
যে-শান্তিতে জানায় আমায় অসীম কালের অনির্বচনীয়,—
"তুমি আমার প্রিয়।"

১৮ অক্টোবর ১৯২৭
পিনাঙ

কণ্টিকারি

শিলঙে এক গিরির খোপে পাথর আছে খসে,—
তারি উপর লুকিয়ে ব'সে
রোজ সকালে গেঁথেছিলেম ভোরের সুরে গানের মালা।
প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে ছিল আমার মুখোমুখির পালা।

ডানদিকেতে অফলা এক পিচের শাখা ভরে
ফুল ফোটে আর ফুল প'ড়ে যায় ঝরে।
কালো ডানায় হলদে আভাস কোন্‌ পাখি সেই অকারণের গানে
ক্লান্তি নাহি জানে,—

তেমনিতরো গোলাপলতা লতাবিতান ঢেকে
অজস্র তার ফুলের ভাষায় অন্ত না পায় উদ্দেশহীন ডেকে।
পাইনবনের প্রাচীন তরু তাকায় মেঘের মুখে,
ডালগুলি তার সবুজ ঝরনা ধরার পানে ঝুঁকে
মন্ত্রে যেন থমক-লেগে আছে।
দুটি দালিম গাছে
ঘনসবুজ পাতার কোলে কোলে
ঘনরাঙা ফুলের গুচ্ছ দোলে।

পায়ের কাছে একটি কণ্টিকারি—
অন্তরঙ্গ কাছের সঙ্গ তারি,
দূরের শূন্যে আপনাকে সে প্রচার নাহি করে।
মাটির কাছে নত হলে পরে
স্নিগ্ধ সাড়া দেয় সে ধীরে ধূলিশয়ন থেকে
নীলবরনের ফুলের বুকে একটুখানি সোনার বিন্দু এঁকে।

সেদিন যত রচেছিলাম গান
কণ্টিকারির দান
তাদের সুরে স্বীকার করা আছে।
আজকে যখন হৃদয় আমার ক্ষণিক শান্তি যাচে
দুঃখদিনের দুর্ভাবনার প্রচণ্ড পীড়নে,
হঠাৎ কেন জাগল আমার মনে,
সেই সকালের টুকরো একটুখানি—
মাটির কাছে কণ্টিকারির নীল-সোনালির বাণী।

৫ আষাঢ় ১৩৩৯

আরেক দিন

স্পষ্ট মনে জাগে,
তিরিশ বছর আগে
তখন আমার বয়স পঁচিশ— কিছুকালের তরে
এই দেশেতেই এসেছিলেম, এই বাগানের ঘরে।
সূর্য যখন নেমে যেত নীচে
দিনের শেষে ওই পাহাড়ে পাইনশাখার পিছে,
নীল শিখরের আগায় মেঘে মেঘে
আগুনবরন কিরণ রইত লেগে,
দীর্ঘ ছায়া বনে বনে এলিয়ে যেত পর্বতে পর্বতে ;—
সামনেতে ঐ কাঁকরঢালা পথে
দিনের পরে দিনে
ডাকপিয়নের পায়ের ধ্বনি নিত্য নিতেম চিনে।
মাসের পরে মাস গিয়েছে, তবু
একবারো তার হয় নি কামাই কভু।

আজো তেমনি সূর্য ডোবে সেইখানেতেই এসে
পাইনবনের শেষে,
সুদূর শৈলতলে
সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝরনাধারার জলে,
সেই সেকেলের মতোই তেমনিধারা
তারার পরে তারা
আলোর মন্ত্র চুপি চুপি শুনায় কানে পর্বতে পর্বতে ;
শুধু আমার কাঁকরঢালা পথে
বহুকালের চেনা
ডাকপিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনো বাজবে না।

আজকে তবু কী প্রত্যাশা জাগল আমার মনে,—
চলতে চলতে গেলেম অকারণে

ডাকঘরে সেই মাইলতিনেক দূরে।
দ্বিধা ভরে মিনিটকুড়িক এদিক ওদিক ঘুরে
ডাকবাবুদের কাছে
শুধাই এসে, "আমার নামে চিঠিপত্তর আছে?"
জবাব পেলেম, "কই, কিছু তো নেই।"
শুনে তখন নতশিরে আপন-মনেতেই
অন্ধকারে ধীরে ধীরে
আসছি যখন শূন্য আমার ঘরের দিকে ফিরে,
শুনতে পেলেম পিছন দিকে
করুণ গলায় কে অজানা বললে হঠাৎ কোন্ পথিকে,—
"মাথা খেয়ো, কাল কোরো না দেরি।"
ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি।
বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশবছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে-ভুবনে সন্ধ্যাতারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দূরে
কাঁকরঢালা পথের 'পরে ডাকপিয়নের পদধ্বনির সুরে।

২৩ অগস্ট ১৯২৭
রফিউস্ জাহাজ

তে হি নো দিবসাঃ

এই অজানা সাগরজলে বিকেলবেলার আলো
লাগল আমার ভালো।
কেউ দেখে কেউ নাই-বা দেখে, রাখবে না কেউ মনে,
এমনতরো ফেলাছড়ার হিসাব কি কেউ গোনে।

এই দেখে মোর ভরল বুকের কোণ;
কোথা থেকে নামল রে সেই খেপা দিনের মন,
যেদিন অকারণ

হঠাৎ হাওয়ায় যৌবনেরি ঢেউ
ছল্‌ছলিয়ে উঠত প্রাণে জানত না তা কেউ।
লাগত আমায় আপন গানের নেশা
অনাগত ফাগুনদিনের বেদন দিয়ে মেশা।

সে গান যারা শুনত তারা আড়াল থেকে এসে
আড়ালেতে লুকিয়ে যেত হেসে।
হয়তো তাদের দেবার ছিল কিছু,
আভাসে কেউ জানায় নি তা নয়ন করে নিচু।
হয়তো তাদের সারাদিনের মাঝে
পড়ত বাধা একবেলাকার কাজে।
চমকলাগা নিমেষগুলি সেই
হয়তো বা কার মনে আছে, হয়তো মনে নেই।
জ্যোৎস্নারাতে একলা ছাদের 'পরে
উদার অনাদরে
কাটত প্রহর লক্ষ্যবিহীন প্রাণে,
মূল্যবিহীন গানে।

মোর জীবনে বিশ্বজনের অজানা সেই দিন,
বাজত তাহার বুকের মাঝে খামখেয়ালী বীন,—
যেমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে
রূপহারানো রাধাশ্যামের দোলন দোঁহায় মিলে,
যেমনতরো ছুটির দিনে এমনি বিকেলবেলা
দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়, শুধু হওয়ার খেলা,
অজানাতে ভাসিয়ে দেওয়া আলোছায়ার ভেলা।

২ অক্টোবর ১৯২৭
মারুর জাহাজ

দীপশিল্পী

হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী,
তোমার অরূপ জ্যোতি
রূপ লবে আমার জীবনে,
তারি লাগি একমনে
রচিলাম এই দীপখানি,
মূর্তিমতী এই মোর অভ্যর্থনাবাণী।

এসো এসো করো অধিষ্ঠান,
মোর দীর্ঘ জীবনেরে করো গো চরম বরদান।
হয় নাই যোগ্য তব,
কতবার ভাঙিয়াছি আবার গড়েছি অভিনব,—
মোর শক্তি আপনারে দিয়েছে ধিক্কার।
সময় নাহি যে আর,
নিদ্রাহারা প্রহর-যে একে একে হয় অপগত,
তাই আজ সমাপিনু ব্রত।
গ্রহণ করো এ মোর চিরজীবনের রচনারে
ক্ষণকাল স্পর্শ করো তারে।
তারপরে রেখে যাব এ জন্মের এক-সার্থকতা,
চিরন্তন সুখ মোর, এই মোর চিরন্তন ব্যথা।

ফাল্গুন ? ১৩৩৮

মানী

উচ্চপ্রাচীরে রুদ্ধ তোমার
ক্ষুদ্র ভুবনখানি,
হে মানী, হে অভিমানী।
মন্দিরবাসী দেবতার মতো

সম্মানশৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে।
সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে
নিজেরে পৃথক করি
আছ দিনরাত গৌরবগুরু
কঠিন মূর্তি ধরি।
সবার যেখানে ঠাঁই
বিপুল তোমার মর্যাদা নিয়ে
সেথায় প্রবেশ নাই।
অনেক উপাধি তব,
মানুষ-উপাধি হারায়েছ শুধু
সে ক্ষতি কাহারে কব।

ভক্তেরা মন্দিরে
পূজারির কৃপা বহু-দামে কিনে
পূজা দিয়ে যায় ফিরে
ঝিল্লিমুখর বেণুবীথিকার ছায়ে
আপন নিভৃত গাঁয়ে।
তখন একাকী বৃথা বিচিত্র
পাষাণভিত্তি-মাঝে
দেবতার বুকে জান সে কী ব্যথা বাজে।
বেদির বাঁধন করি ধূলিসাৎ
অচলেরে দিয়ে নাড়া
মানুষের মাঝে সে-যে পেতে চায় ছাড়া।

হে রাজা, তোমার পূজাঘেরা মন
আপনারে নাহি জানে।
প্রাণহীন সম্মানে
উজ্জ্বল রঙে রঙকরা তুমি ঢেলা,—
তোমার জীবন সাজানো পুতুল

স্থুল মিথ্যার খেলা।
আপনি রয়েছ আড়ষ্ট হয়ে
আপনার অভিশাপে,
নিশ্চল তুমি নিজ গর্বের চাপে।
সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা
মুক্ত ভুবনে ফিরে
মরিবার আগে তাদের পরশ
লাগুক তোমার শিরে।

ফাল্গুন ? ১৩৩৮

রাজপুত্র

রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী
রাজপুত্র কোথা হতে আসি
শুভক্ষণে দেখা দেয় রূপে
চুপে-চুপে,
জানি বলে জেনেছিনু যারে
তারি মাঝে। আমার সংসারে,
বক্ষে মোর আগমনী পদধ্বনি বাজে
যেন বহুদূর হতে আসা।
তার ভাষা
প্রাণে দেয় আনি
সমুদ্রপারের কোন্ অভিনব যৌবনের বাণী।
সেদিন বুঝিতে পারে মন
ছিল সে-যে নিশ্চেতন
তুচ্ছতার অন্তরালে
এতকাল মায়ানিদ্রাজালে।
তার দৃষ্টিপাতে মোরে নূতন সৃষ্টির ছোঁওয়া লাগে,
চিত্ত জাগে।—

বলি তার পদযুগ চুমি,
"রাজপুত্র তুমি।"
এতদিন
আত্মপরিচয়হীন
জড়তার পাষাণপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা
দুর্গ-মাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা।
কোন্ মন্ত্রগুণে
সে দুর্ভেদ বাধা যেন দাহিলে আগুনে,
বন্দিনীরে করিলে উদ্ধার,
করি নিলে আপনার,
নিয়ে গেলে মুক্তির আলোকে।
আজিকে তোমারে দেখি কী নূতন চোখে।
কুঁড়ি আজ উঠেছে কুসুমি,
বারবার মন বলে, "রাজপুত্র তুমি।"

২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮

অগ্রদূত

হে পথিক, তুমি একা।
আপনার মনে জানি না কেমনে
অদেখার পেলে দেখা।
যে-পথে পড়ে নি পায়ের চিহ্ন
সে-পথে চলিলে রাতে,
আকাশে দেখেছ কোন্ সংকেত,
কারেও নিলে না সাথে।
তুঙ্গগিরির উঠিছ শিখরে
যেখানে ভোরের তারা
অসীম আলোকে করিছে আপন
আলোর যাত্রা সারা।

প্রথম যেদিন ফাল্গুনতাপে
নবনির্ঝর জাগে,
মহাসুদূরের অপরূপ রূপ
দেখিতে সে পায় আগে।
আছে আছে আছে, এই বাণী তার
এক নিমেষেই ফুটে,
অচেনা পথের আহ্বান শুনে
অজানার পানে ছুটে।
সেইমতো এক অকথিত ভাষা
ধ্বনিল তোমার মাঝে,
আছে আছে আছে, এ মহামন্ত্র
প্রতি নিশ্বাসে বাজে।

রোধিয়াছে পথ বন্ধুর করি
অচল শিলার স্তূপ।
নহে নহে নহে, এ নিষেধবাণী
পাষাণে ধরেছে রূপ।
জড়ের সে নীতি করে গর্জন
ভীরুজন মরে ভুলে,
জনহীন পথে সংশয়মোহ
রহে তর্জনী তুলে।
অলস মনের আপনারি ছায়া
শঙ্কিল কায়া ধরে,
অতি নিরাপদ বিনাশের তলে
বাঁচিতে চেয়ে সে মরে।

নবজীবনের সংকটপথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।

শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম-মাঝে পথ করি দিবে,—
জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী— 'আছে আছে'

১২ চৈত্র ১৩৩৮

প্রতীক্ষা

তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমার সুপ্তির প্রান্তে, নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাততারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল। চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের 'পরে। স্তম্ভিত সমীরে
রাত্রির প্রহরশেষে সমুদ্রের তীরে
সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে
চেয়ে পূর্বতট-পানে, প্রথম আলোকে
স্পর্শস্নান হবে তার, এই আশা ধরি
অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।
তব নবজাগরণী প্রথম যে-হাসি
কনকচাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
আধোখোলা অধরেতে, নয়নের কোণে,
চয়ন করিব তাই, এই আছে মনে।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮

নির্বাক্

মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু
যে-কথা আমি বলি নি আর-কারে,
সেদিন বনে মাধবীশাখা নিচু
ফুলের ভারে ভারে।
বাঁশিতে লই মনের কথা তুলি
বিরহব্যথাবৃন্ত হতে ভাঙা,—
গোপন রাতে উঠেছে তারা দুলি
সুরের রঙে রাঙা।

শিরীষবন নতুনপাতা-ছাওয়া
মর্মরিয়া কহিল, 'গাহো গাহো।'
মধুমালতীগন্ধে-ভরা হাওয়া
দিয়েছে উৎসাহ।
পূর্ণিমাতে জোয়ারে উছলিয়া
নদীর জল ছলছলিয়া উঠে।
কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া
ঘাসের 'পরে লুটে।

সে মধুরাতে আকাশে ধরাতলে
কোথাও কিছু ছিল না কৃপণতা।
চাঁদের আলো সবার হয়ে বলে
যত মনের কথা।
মনে হল যে, নীরবে কৃপা যাচে
যা-কিছু আছে তোমার চারিদিকে।
সাহস ধরি গেলেম তব কাছে
চাহিনু অনিমিখে।

সহসা মন উঠিল চমকিয়া
　　বাঁশিতে আর বাজিল না তো বাণী।
গহনছায়ে দাঁড়ানু থমকিয়া
　　হেরিনু মুখখানি।

সাগরশেষে দেখেছি একদিন
　　মিলিছে সেথা বহু নদীর ধারা—
ফেনিল জল দিক্‌সীমায় লীন
　　অপারে দিশাহারা।
তরণী মোর নানা স্রোতের টানে
　　অবোধসম কাঁপিছে থরথরি,
ভেবে না পাই কেমনে কোন্‌খানে
　　বাঁধিব মোর তরী।

তেমনি আজি তোমার মুখে চাহি
　　নয়ন যেন কূল না পায় খুঁজি,
অভাবনীয় ভাবেতে অবগাহি
　　তোমারে নাহি বুঝি।
মুখেতে তব শ্রান্ত এ কী আশা,
　　শান্তি এ কী, গোপন এ কী প্রীতি,
বাণীবিহীন এ কী ধ্যানের ভাষা,
　　এ কী সুদূর স্মৃতি।
নিবিড় হয়ে নামিল মোর মনে
　　স্তব্ধ তব নীরব গভীরতা—
রহিনু বসি লতাবিতান-কোণে,
　　কহি নি কোনো কথা।

মাঘ ১৩৩৮

প্রণাম

তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ
যারে তুমি করেছ বরণ।
তুমি মূল্য দিলে তারে
দুর্লভ পূজার অলংকারে।
ভক্তিসমুজ্জ্বল চোখে
তাহারে হেরিলে তুমি যে-শুভ্র আলোকে
সে আলো করালো তারে স্নান ;
দীপ্যমান মহিমার দান
পরাইল ললাটের 'পর।
হ'ক সে দেবতা কিম্বা নর,
তোমারি হৃদয় হতে বিচ্ছুরিত রশ্মির ছটায়
দিব্য আবির্ভাবে তার প্রকাশ ঘটায়।
তার পরিচয়খানি
তোমাতেই লভিয়াছে জয়বাণী।
রচিয়া দিয়াছে তার সত্য স্বর্গপুরী
তোমারি এ প্রীতির মাধুরী
যে-অমৃত করে পান
ঢালে তাহা তোমারি এ উচ্ছ্বসিত প্রাণ।
তব শির নত
দিক্‌রেখায় অরুণের মতো,
তারি 'পরে দেবতার অভ্যুদয়
রূপ লভে সুপ্রসন্ন পুণ্য জ্যোতির্ময়।

১৭ চৈত্র ১৩৩৮

শূন্যঘর

গোধূলি-অন্ধকারে
পুরীর প্রান্তে অতিথি আসিনু দ্বারে।
ডাকিনু, 'আছ কি কেহ,
সাড়া দেহো, সাড়া দেহো।'
ঘরভরা এক নিরাকার শূন্যতা
না কহিল কোনো কথা।

বাহিরে বাগানে পুষ্পিত শাখা
গন্ধের আহ্বানে
সংকেত করে কাহারে তাহা কে জানে।
হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি,
জনশূন্যতা নিবিড় করিয়া
নীরবে দাঁড়ায়ে মালী।
সিঁড়িটা নির্বিকার
বলে, 'এস আর নাই যদি এস
সমান অর্থ তার।'

ঘরগুলো বলে ফিলজফারের গলায়,
'ডুব দিয়ে দেখো সত্তাসাগর-তলায়
বুঝিতে পারিবে, থাকা নাই থাকা
আসা আর দূরে যাওয়া
সবই এক কথা, খেয়ালের ফাঁকা হাওয়া।'
কেদারা এগিয়ে দিতে কারো নেই তাড়া,
প্রবীণ ভৃত্য ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া।
মেয়াদ যখন ফুরোয় কপালে,
হায়রে তখন সেবা
কারেই বা করে কেবা।

মনেতে লাগিল বৈরাগ্যের ছোঁওয়া,
সকলি দেখিনু ধোঁওয়া।
ভাবিলাম এই ভাগ্যের তরী
বুঝি তার হাল নেই,
এলোমেলো স্রোতে আজ আছে কাল নেই।
নলিনীর দলে জলের বিন্দু
চপলম্ অতিশয়,
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষতি সয়।
অতএব— আরে অতএবখানা থাক্
আপাতত ফেরা যাক।

ব্যর্থ আশায় ভারাতুর সেই ক্ষণে
ফিরালেম রথ, ফিরিবার পথ
দূরতর হল মনে।
যাবার বেলায় শুষ্ক পথের
আকাশভরানো ধূলি
সহজে ছিলাম ভুলি।
ফিরিবার বেলা মুখেতে রুমাল,
ধোঁয়াটে চশমা চোখে,
মনে হল যত মাইক্রোব-দল
নাকে মুখে সব ঢোকে।
তাই বুঝিলাম, সহজ তো নয়
ফিলজফারের বুদ্ধি।
দরকার করে বহুৎ চিত্তশুদ্ধি।

মোটর চলিল জোরে,
একটু পরেই হাসিলাম হো হো করে।
সংশয়হীন আশার সামনে
হঠাৎ দরজা বন্ধ,
নেহাত এটার ঠাট্টার মতো ছন্দ।

বোকার মতন গম্ভীর মুখটারে
অট্টহাস্যে সহজ করিনু,
ফিরিনু আপন দ্বারে।

ঘরে কেহ আজ ছিল না যে, তাই
না-থাকার ফিলজাফি
মনটাকে ধরে চাপি।
থাকাটা আকস্মিক,
না-থাকাই সে তো দেশকাল ছেয়ে
চেয়ে আছে অনিমিখ।
সন্ধেবেলায় আলোটা নিবিয়ে
বসে বসে গৃহকোণে
না-থাকার এক বিরাট স্বরূপ
আঁকিতেছি মনে-মনে।
কালের প্রান্তে চাই,
ওই বাড়িটার আগাগোড়া কিছু নাই।
ফুলের বাগান, কোথা তার উদ্দেশ,
বসিবার সেই আরামকেদারা
পুরোপুরি নিঃশেষ।
মাসমাহিনার খাতাটারে নিয়ে পিছে
দুই দুই মালী একেবারে সব মিছে।
ক্রেসান্থেমাম্ কার্নেশনের
কেয়ারি সমেত তারা
নাই গহ্বরে হারা।

চেয়ে দেখি দূর-পানে
সেই ভাবীকালে যাহা আছে যেইখানে
উপস্থিতের ছোটো সীমানায়
সামান্য তাহা অতি—
হেথায় সেথায় বুদ্‌বুদ্‌সংহতি।

যাহা নাই তাই বিরাট বিপুল মহা।
অনাদি অতীত যুগের প্রবাহ-বহা
অসংখ্য ধন, কণামাত্রও তার
নাই নাই হায়, নাই সে কোথাও আর

'দূর করো ছাই' এই বলে শেষে
যেমনি জ্বালিনু আলো
ফিলজফিটার কুয়াশা কোথা মিলাল।
স্পষ্ট বুঝিনু যা-কিছু সমুখে আছে,
চক্ষের 'পরে যাহা বক্ষের কাছে
সেই তো অন্তহীন
প্রতিপল প্রতিদিন
যা আছে তাহারি মাঝে
যাহা নাই তাই গভীর গোপনে
সত্য হইয়া রাজে।
অতীতকালের যে ছিলেম আমি
আজিকার আমি সেই
প্রত্যেক নিমেষেই।
বাঁধিয়া রেখেছে এই মুহূর্তজাল
সমস্ত ভাবীকাল।

অতএব সেই কেদারাটা যেই
জানালায় লব টানি,
বসিব আরামে, সে-মুহূর্তেরে
চিরদিবসের জানি।
অতএব জেনো সন্ন্যাসী হব নাকো,
আরবার যদি ডাক
আবার সে ওই মাইক্রোব-ওড়া পথে
চলিব মোটর-রথে।
ঘরে যদি কেহ রয়

নাই ব'লে তারে ফিলজফারের
হবে নাকো সংশয়।
দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া
দেখি যদি কোনো মিত্রম্
কবি তবে কবে, 'এই সংসার
অতীব বটে বিচিত্রম্।'

চৈত্র ? ১৩৩৮

দিনাবসান

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
নিববে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান বেলা তাসে পাশায়,
নাই বা হল নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনাল দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ।

আমি জানি মনে-মনে,
সেঁউতি যুথী জবা
আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।

বর্ষা-শরৎ-বসন্তেরি
প্রাঙ্গণেতে আমায় ঘেরি
যেথায় বীণা যেথায় ভেরি
 বেজেছে উৎসবে,
সেথায় আমার আসন-'পরে
স্নিগ্ধশ্যামল সমাদরে
আলিপনায় স্তরে স্তরে
 আঁকন আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
 পাখির কলরবে।

জানি আমি এই বারতা
 রইবে অরণ্যেতে—
ওদের সুরে কবির কথা
 দিয়েছিলেম গেঁথে।
ফাগুনহাওয়ায় শ্রাবণধারে
এই বারতাই বারে বারে
দিক্‌বালাদের দ্বারে দ্বারে
 উঠবে হঠাৎ বাজি ;
কভু করুণ সন্ধ্যামেঘে,
কভু অরুণ আলোক লেগে,
এই বারতা উঠবে জেগে
 রঙিন বেশে সাজি।
স্মরণসভার আসন আমার
 সোনায় দেবে মাজি।

আমার স্মৃতি থাক্ না গাঁথা
 আমার গীতি-মাঝে
যেখানে ওই ঝাউয়ের পাতা
 মর্মরিয়া বাজে।

যেখানে ওই শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জ্বলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
কিরণকণামালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
কাজের বেশে করে খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা
নিভৃতে দীপ জ্বালি'
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
ভরে রূপের ডালি।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৩
শান্তিনিকেতন

পথসঙ্গী

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছিলে-যে পথের সাথি,
দিবসে এনেছ পিপাসার জল
রাত্রে জ্বেলেছ বাতি।
আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনায়,
পথ হয় অবসান,
তোমার লাগিয়া রেখে যাই মোর
শুভকামনার দান।
সংসারপথ হ'ক বাধাহীন,
নিয়ে যাক কল্যাণে,
নব নব ঐশ্বর্য আসুক
জ্ঞানে কর্মে ও ধ্যানে।
মোর স্মৃতি যদি মনে রাখ কভু
এই বলে রেখো মনে—

ফুল ফুটায়েছি, ফল যদিও-বা
ধরে নাই এ জীবনে।

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
অন্তরে তাহা রাখি,
কর্মে তাহার শেষ নাহি হয়
প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে
দীপে তেল ভরি দিলে।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
সে-আলোকে যায় মিলে।

৬ মে ১৯৩২
তেহেরান

অন্তর্হিতা

তুমি যে তারে দেখ নি চেয়ে
জানিত সে তা মনে,—
ব্যথার ছায়া পড়িত ছেয়ে
কালো চোখের কোণে
জীবনশিখা নিবিল তার,
ডুবিল তারি সাথে
অবমানিত দুঃখভার
অবহেলার রাতে।
দীপাবলীর থালাতে নাই
তাহার ম্লান হিয়া,
তারায় তারি আলোক তাই
উঠিল উজলিয়া।

স্বাগতবাণী ছিল সে মেলি
ভাষাবিহীন মুখে,
বহুজনের বাণীরে ঠেলি
বাজে কি তব বুকে।
নিকটে তব এসেছিল যে,
সে কথা বুঝাবারে
অসীম দূরে গিয়েছে ও-যে
শূন্যে খুঁজাবারে।
সেখানে গিয়ে করেছে চুপ,
ভিক্ষা গেল থামি,
তাই কি তার সত্যরূপ
হৃদয়ে এল নামি।

১ আষাঢ় ১৩৩৯
উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

আশ্রমবালিকা

শ্রীমতী মমতা সেনের বিবাহ-উপলক্ষে

আশ্রমের হে বালিকা,
আশ্বিনের শেফালিকা
ফাল্গুনের শালের মঞ্জরি
শিশুকাল হতে তব
দেহে মনে নব নব
যে-মাধুর্য দিয়েছিল ভরি,
মাঘের বিদায়ক্ষণে
মুকুলিত আম্রবনে
বসন্তের যে-নবদূতিকা,
আষাঢ়ের রাশি রাশি
শুভ্র মালতীর হাসি,
শ্রাবণের যে-সিক্তযূথিকা,

ছিল ঘিরে রাত্রিদিন
তোমারে বিচ্ছেদহীন
প্রান্তরের যে-শান্তি উদার,
প্রত্যুষের জাগরণে
পেয়েছ বিস্মিত মনে
যে-আস্বাদ আলোকসুধার,
আষাঢ়ের পুঞ্জমেঘে
যখন উঠিত জেগে
আকাশের নিবিড় ক্রন্দন,
মর্মরিত গীতিকায়
সপ্তপর্ণবীথিকায়
দেখেছিলে যে-প্রাণস্পন্দন,
বৈশাখের দিনশেষে
গোধূলিতে রুদ্রবেশে
কালবৈশাখীর উন্মত্ততা—
সে-ঝড়ের কলোল্লাসে
বিদ্যুতের অট্টহাসে
শুনেছিলে যে-মুক্তিবারতা,
পউষের মহোৎসবে
অনাহত বীণারবে
লোকে লোকে আলোকের গান
তোমার হৃদয়দ্বারে
আনিয়াছে বারে বারে
নবজীবনের যে-আহ্বান,
নববরষের রবি
যে উজ্জ্বল পুণ্যছবি
এঁকেছিল নির্মল গগনে,
চিরনূতনের জয়
বেজেছিল শূন্যময়
বেজেছিল অন্তর-অঙ্গনে,

কত গান কত খেলা,
কত-না বন্ধুর মেলা,
　　প্রভাতে সন্ধ্যায় আরাধনা,
বিহঙ্গকূজন-সাথে
গাছের তলায় প্রাতে
　　তোমাদের দিনের সাধনা,
তারি স্মৃতি শুভক্ষণে
সমস্ত জীবনে মনে
　　পূর্ণ করি নিয়ে যাও চলে,
চিত্ত করি ভরপুর
নিত্য তারা দিক সুর
　　জনতার কঠোর কল্লোলে।
নবীন সংসারখানি
রচিতে হবে-যে জানি
　　মাধুরীতে মিশায়ে কল্যাণ,
প্রেম দিয়ে প্রাণ দিয়ে
কাজ দিয়ে গান দিয়ে
　　ধৈর্য দিয়ে, দিয়ে তব ধ্যান,—
সে তব রচনা-মাঝে
সব ভাবনায় কাজে
　　তারা যেন উঠে রূপ ধরি,
তারা যেন দেয় আনি
তোমার বাণীতে বাণী
　　তোমার প্রাণেতে প্রাণ ভরি।
সুখী হও, সুখী রহো
পূর্ণ করো অহরহ
　　শুভকর্মে জীবনের ডালা,
পুণ্যসূত্রে দিনগুলি
প্রতিদিন গেঁথে তুলি
　　রচি লহো নৈবেদ্যের মালা।

সমুদ্রের পার হতে
পূর্বপবনের স্রোতে
ছন্দের তরণীখানি ভ'রে
এ-প্রভাতে আজি তোরি
পূর্ণতার দিন স্মরি
আশীর্বাদ পাঠাইনু তোরে।

১৩ জ্যৈষ্ঠ [১৩৩৩]
রোহিতসাগর

বধূ

শ্রীমতী অমিতা সেনের পরিণয় উপলক্ষে

মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল উদ্বেল উদ্যম
গর্জি উঠে ; অতীত তিমিরগর্ভ হতে তুরঙ্গম
তরঙ্গ ছুটিছে শূন্যে ; উন্মেষিছে মহাভবিষ্যৎ।
বর্তমান কালতটে অগ্নিগর্ভ অপূর্ব পর্বত
সদ্যোজাত মহিমায় উজাড় উজ্জ্বল উত্তরীয়
নব সূর্যোদয়-পানে। যে-অদৃষ্ট, যে-অভাবনীয়
মানুষের ভাগ্যলিপি লিখিতেছে অজ্ঞাত অক্ষরে
দৃপ্ত বীরমূর্তি ধরি, দেখিয়াছি ; তার কণ্ঠস্বরে
শুনেছি দীপকরাগে সৃষ্টিবাণী মরণবিজয়ী
প্রাণমন্ত্রে।
এই ক্ষুব্ধ যুগান্তর-মাঝে বৎসে অয়ি,
তোমারে হেরিনু বধূবেশে, নির্ঝরিণী নৃত্যশীলা,
সহসা মিলিছ সরোবরে, চটুল চঞ্চল লীলা
গভীরে করিছ মগ্ন ; নির্ভয়ে নিখিল করি পণ
নবজীবনের সৃষ্টি-রহস্য করিছ উন্মোচন।
ইতিহাসবিধাতার ইন্দ্রজাল বিশ্বদুঃখসুখে

দেশে দেশে যে-বিস্ময় বিস্তারিছে বিরাট কৌতুকে
যুগে যুগে, নরনারীহৃদয়ের আকাশে আকাশে
এও সেই সৃষ্টিলীলা জ্যোতির্ময় বিশ্ব-ইতিহাসে।

৩ আষাঢ় ১৩৩৯
[শান্তিনিকেতন]

মিলন

শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্রের বিবাহ-উপলক্ষে

সেদিন উষার নববীণাঝংকারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা।
ধেয়ে চলেছিলে কৈশোরপরপারে
পাখিদুটি উন্মনা।
দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রক্তে উঠিল জেগে
স্বপ্নের ছায়া ঢাকা।
সুরভবনের মিলনমন্ত্র লেগে
কবে দুজনের পাখায় ঠেকিল পাখা।

কেটেছিল দিন আকাশে হৃদয় পাতি
মেঘের রঙেতে রাঙায়ে দোঁহার ডানা।
আছিলে দুজনে অপারে ওড়ার সাথি,
কোথাও ছিল না মানা।
দূর হতে এই ধরণীর ছবিখানি
দোঁহার নয়নে অমৃত দিয়েছে আনি—
পুষ্পিত শ্যামলতা।
চারিদিক হতে বিরাটের মহাবাণী
শুনাল দোঁহারে ভাষার-অতীত কথা।

মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী
বেদনা আনিল কী অনির্বচনীয়।
দোঁহার চিত্তে উচ্ছ্বসি উঠে ধ্বনি—
'প্রিয়, ওগো মোর প্রিয়।'
পাখার মিলন অসীমে দিয়েছে পাড়ি,
সুরের মিলনে সীমারূপ এল তারি,
এলে নামি ধরা-পানে।
কুলায়ে বসিলে অকূল শূন্য ছাড়ি,
পরানে পরানে গান মিলাইলে গানে

১৭ কার্তিক ১৩৩৮
দার্জিলিং

স্পাই

শক্ত হল রোগ,
হপ্তা-পাঁচেক ছিল আমার ভোগ।
একটুকু যেই সুস্থ হলেম পরে
লোক ধরে না ঘরে,
ব্যামোর চেয়ে অনেক বেশি ঘটাল দুর্যোগ।
এল ভবেশ, এল পালিত, এল বন্ধু ঈশান,
এল পোলিটিশান,
এল গোকুল সংবাদপত্রের,
খবর রাখে সকল পাড়ার নাড়ীনক্ষত্রের।
কেউ-বা বলে 'বদল করো হাওয়া',
কেউ-বা বলে 'ভালো ক'রে করবে খাওয়াদাওয়া'।
কেউ-বা বলে, 'মহেন্দ্র ডাক্তার
এই ব্যামোতে তার মতো কেউ ওস্তাদ নেই আর

দেয়াল ঘেঁষে ওই যে সবার পাছে
সতীশ বসে আছে।
থাকে সে এই পাড়ায়,
চুলগুলো তার ঊর্ধ্বে তোলা পাঁচ আঙুলের নাড়ায়।
চোখে চশমা আঁটা,
এক কোণে তার ফেটে গেছে বাঁয়ের পরকলাটা।
গলার বোতাম খোলা,
প্রশান্ত তার চাউনি ভাবে-ভোলা।
সর্বদা তার হাতে থাকে বাঁধানো এক খাতা,
হঠাৎ খুলে পাতা
লুকিয়ে লুকিয়ে কী-যে লেখে, হয়তো বা সে কবি,
কিম্বা আঁকে ছবি।
নবীন আমায় শোনায় কানে-কানে,
ওই ছেলেটার গোপন খবর নিশ্চিত সেই জানে—
যাকে বলে 'স্পাই',
সন্দেহ তার নাই।
আমি বলি, হবেও বা, ভক্তিনম্র নিরীহ ওই মুখে
খাতার কোণে রিপোর্ট করার খোরাক নিচ্ছে টুকে।
ও মানুষটা সত্যি যদি তেমনি হেয় হয়,
ঘৃণা করব,— কেন করব ভয়।

এই বছরে বছরখানেক বেড়িয়ে নিলেম পাঞ্জাবে কাশ্মীরে।
এলেম যখন ফিরে;
এল গণেশ, পলটু এল, এল নবীন পাল,
এল মাখনলাল।
হাতে একটা মোড়ক নিয়ে প্রণাম করলে পাঁচু,
মুখটা কাঁচুমাচু।
'মনিব কোথায়' শুধাই আমি তারে,
'সতীশ কোথায় হাঁ রে।'

নবীন বললে, 'খবর পান নি তবে—
দিন-পনেরো হবে
উপোস করে মারা গেল সোনার টুকরো ছেলে
নন্‌-ভায়োলেন্‌স্‌ প্রচার করে গেল যখন আলিপুরের জেলে।'
পাঁচু আমার হাতে দিল খাতা,
খুলে দেখি পাতার পরে পাতা—
দেশের কথা কী বলেছি তাই লিখেছে গভীর অনুরাগে,
পাঠিয়ে দিল জেলে যাবার আগে।
আজকে বসে বসে ভাবি, মুখের কথাগুলো
ঝরা পাতার মতোই তারা ধুলোয় হ'ত ধুলো।
সেইগুলোকে সত্য করে বাঁচিয়ে রাখবে কি এ
মৃত্যুসুধার নিত্যপরশ দিয়ে।

৩ আষাঢ় ১৩৩৯
শান্তিনিকেতন

ধাবমান

'যেয়ো না, যেয়ো না' বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন।
কোথা সে বন্ধন
অসীম যা করিবে সীমারে।
সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে
এ পারের সব-কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে,
কাঁদায়ে হাসায়ে
অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে ;
'নয় নয়' এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে
মহাকাল সমুদ্রের 'পরে।
সেই স্বরে
রুদ্রের ডম্বরুধ্বনি বাজে
অসীম অম্বর-মাঝে—

'নয় নয় নয়'।

ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়।

সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়।

যাবে সব যাবে চলে তবু ভালোবাসি,—

চমকে বিনাশ-মাঝে অস্তিত্বের হাসি

আনন্দের বেগে।

মরণের বীণাতারে উঠে জেগে

জীবনের গান;

নিরন্তর ধাবমান

চঞ্চল মাধুরী।

ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্ফুরি

শাশ্বতের দীপশিখা

উজ্জ্বলিয়া মুহূর্তের মরীচিকা।

অতল কান্নার স্রোত মাতার করুণ স্নেহ বয়,

প্রিয়ের হৃদয়বিনিময়।

বিলোপের রঙ্গভূমে বীরের বিপুল বীর্যমদ

ধরণীর সৌন্দর্যসম্পদ।

অসীমের দান

ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ

সময়ের মাপে নহে।

কাল ব্যাপি রহে নাই রহে

তবু সে মহান;

যতক্ষণ আছে তারে মূল্য দাও পণ করি প্রাণ।

ধায় যবে বিদায়ের রথ

জয়ধ্বনি করি তারে ছেড়ে দাও পথ

আপনারে ভুলি।

যতটুকু ধূলি

আছ তুমি করি অধিকার
তার মাঝে কী রহে না, তুচ্ছ সে বিচার।
বিরাটের মাঝে
এক রূপে নাই হয়ে অন্য রূপে তাহাই বিরাজে।
ছেড়ে এসো আপনার অন্ধকূপ,
মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দস্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্‌বুদ্‌ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে।

৬ আষাঢ় ১৩৩৯

ভীরু

তাকিয়ে দেখি পিছে
সেদিন ভালোবেসেছিলেম,
দিন না যেতেই হয়ে গেল মিছে।
বলার কথা পাই নি আমি খুঁজে,
আপনা হতে নেয় নি কেন বুঝে,
দেবার মতন এনেছিলেম কিছু,
ডালির থেকে পড়ে গেল নীচে।

ভরসা ছিল না যে,
তাই তো ভেবে দেখি নি হায়
কী ছিল তার হাসির দ্বিধা-মাঝে
গোপন বীণা সুরেই ছিল বাঁধা,
ঝংকার তায় দিয়েছিল আধা,
সংশয়ে আজ তলিয়ে গেল কোথা,
পাব কি তায় দুঃখসাগর সিঁচে।

হায় রে গরবিনী,
বারেক তব করুণ চাহনিতে
ভীরুতা মোর লও নি কেন জিনি।
যে-মণিটি ছিল বুকের হারে
ফেলে দিলে কোন্ খেদে হায় তারে,
ব্যর্থ রাতের অশ্রুফোঁটার মালা
আজ তোমার ওই বক্ষে ঝলকিছে।

৯ আষাঢ় ১৩৩৯

বিচার

বিচার করিয়ো না।
যেখানে তুমি রয়েছ, সে তো
জগতে এক কোণা।
যেটুকু তব দৃষ্টি যায়
সেটুকু কতখানি,
যেটুকু শোন তাহার সাথে
মিশাও নিজবাণী।
মন্দ-ভালো সাদা ও কালো
রাখিছ ভাগে ভাগে।
সীমানা মিছে আঁকিয়া তোল
আপন-রচা দাগে।

সুরের বাঁশি যদি তোমার
মনের মাঝে থাকে,
চলিতে পথে আপন-মনে
জাগায়ে দাও তাকে।

গানের মাঝে তর্ক নাই,
কাজের নাই তাড়া।
যাহার খুশি চলিয়া যাবে,
যে খুশি দিবে সাড়া।
হ'ক-না তারা কেহ-বা ভালো
কেহ-বা ভালো-নয়,
এক পথেরি পথিক তারা
লহো এ পরিচয়।

বিচার করিয়ো না।
হায় রে হায়, সময় যায়,
বৃথা এ আলোচনা।
ফুলের বনে বেড়ার কোণে
হেরো অপরাজিতা
আকাশ হতে এনেছে বাণী,
মাটির সে যে মিতা।
ওই তো ঘাসে আষাঢ়মাসে
সবুজে লাগে বান,—
সকল ধরা ভরিয়া দিল
সহজ তার দান।
আপনা ভুলি সহজ সুখে
ভরুক তব হিয়া,
পথিক, তব পথের ধন
পথেরে যাও দিয়া।

১০ আষাঢ় ১৩৩৯
উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

পুরানো বই

আমি জানি
পুরাতন এই বইখানি।—
অপঠিত, তবু মোর ঘরে
আছে সমাদরে।
এর ছিন্ন পাতে পাতে তার
বাষ্পাকুল করুণার
স্পর্শ যেন রয়েছে বিলীন ;
সে-যে আজ হল কতদিন।

সরল দুখানি আঁখি ঢলোঢলো,
বেদনার আভাসেই করে ছলোছলো ;
কালোপাড় শাড়িখানি মাথার উপর দিয়ে ফেরা,
দুটি হাত কঙ্কণে ও সান্ত্বনায় ঘেরা।
জনহীন দ্বিপ্রহরে
এলোচুল মেলে দিয়ে বালিশের 'পরে,
এই বই তুলে নিয়ে বুকে
একমনে স্নিগ্ধমুখে
বিচ্ছেদকাহিনী যায় পড়ে।
জানালা বাহিরে শূন্যে ওড়ে
পায়রার ঝাঁক,
গলি হতে দিয়ে যায় ডাক
ফেরিওলা,
পাপোশের 'পরে ভোলা
ভক্ত সে কুকুর
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ছাড়ে আর্তস্বর।
সময়ের হয়ে যায় ভুল ;
গলির ওপারে স্কুল,
সেথা হতে বাজে যবে
কাংস্যরবে

ছুটির ঘণ্টার ধ্বনি,
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তখনি
তাড়াতাড়ি
ওঠে সে শয়ন ছাড়ি,
গৃহকার্যে চলে যায় সচকিতে
বইখানি রেখে কুলুঙ্গিতে।
অন্তঃপুর হতে অন্তঃপুরে
এই বই ফিরিয়াছে দূর হতে দূরে।
ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে
খ্যাতি এর ব্যাপিয়াছে দক্ষিণে ও বামে।

তার পরে গেল সেই কাল,
ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল আপন সৃষ্টির মায়াজাল।
এ লজ্জিত বই
কোনো ঘরে স্থান এর কই।
নবীন পাঠক আজ বসি কেদারায়
ভেবে নাহি পায়
এ লেখাও কোন্ মন্ত্রে করেছিল জয়
সেদিনের অসংখ্য হৃদয়।

জানালা-বাহিরে নীচে ট্রাম যায় চলি।
প্রশস্ত হয়েছে গলি।
চলে গেছে ফেরিওলা, সে-পসরা তার
বিকায় না আর।
ডাক তার ক্লান্ত সুরে
দূর হতে মিলাইল দূরে।
বেলা চলে গেল কোন্ ক্ষণে,
বাজিল ছুটির ঘণ্টা ও-পাড়ার সুদূর প্রাঙ্গণে।

১১ আষাঢ় ১৩৩৯
কোণার্ক [শান্তিনিকেতন]

বিস্ময়

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।

ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
নিবে গেছে কত তারা, হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগ যুগান্তর। বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়। কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা। সে-বিরাট
ধ্বংসধারা-মাঝে আজি আমার ললাট
পেল অরুণের টিকা আরো একদিন
নিদ্রাশেষে, এই তো বিস্ময় অন্তহীন।

আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্কসভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে। আছি হিমাদ্রির সাথে
আছি সপ্তর্ষির সাথে, আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা। এ বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—

জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।

১২ আষাঢ় ১৩৩৯
কোণার্ক [শান্তিনিকেতন]

অগোচর

হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি,
হাজার হাজার মুখ হাজার হাজার ইতিহাস
ঢাকা দিয়ে আসে যায় দিনের আলোয়
রাতের আঁধারে।
সব কথা তার
কোনো কালে জানবে না কেউ,
নিজেও জানে না কোনো লোক।
মুখর আলাপ তার, উচ্চস্বরে কত আলোচনা,
তারি অন্তস্তলে
বিচিত্র বিপুল
স্মৃতিবিস্মৃতির সৃষ্টিরাশি।
সেখানে তো শব্দ নেই, আলো নেই,
বাইরের দৃষ্টি নেই,
প্রবেশের পথ নেই কারো।
সংখ্যাহীন মানুষের
এই যে প্রচ্ছন্ন বাণী, অশ্রুত কাহিনী
কোন্ আদিকাল হতে
অন্তঃশীল অগণ্য ধারায়
আঁধার মৃত্যুর মাঝে মেশে রাত্রিদিন,
কী হল তাদের,
কী এদের কাজ।

হে প্রিয়, তোমার যতটুকু
দেখেছি শুনেছি
জেনেছি, পেয়েছি স্পর্শ করি'—
তার বহুশতগুণ অদৃশ্য অশ্রুত
রহস্য কিসের জন্য বদ্ধ হয়ে আছে,
কার অপেক্ষায়।

সে নিরালা ভবনের
কুলুপ তোমার কাছে নেই।
কার কাছে আছে তবে।
কে মহা-অপরিচিত যার অগোচর সভাতলে
হে চেনা-অপরিচিত, তোমার আসন ?
সেই কি সবার চেয়ে জানে
আমাদের অন্তরের অজানারে।
সবার চেয়ে কি বড়ো তার ভালোবাসা
যার শুভদৃষ্টি-কাছে
অব্যক্ত করেছে অবগুণ্ঠন মোচন।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

সান্ত্বনা

যে বোবা দুঃখের ভার
ওরে দুঃখী, বহিতেছ, তার কোনো নেই প্রতিকার।
সহায় কোথাও নাই, ব্যর্থ প্রার্থনায়
চিত্তদৈন্য শুধু বেড়ে যায়।

ওরে বোবা মাটি,
বক্ষ তোর যায় না তো ফাটি
বহিয়া বিশ্বের বোঝা দুঃখবেদনার
বক্ষে আপনার
বহু যুগ ধরে।
বোবা গাছ ওরে,
সহজে বহিস শিরে বৈশাখের নির্দয় দাহন,—
তুই সর্বসহিষ্ণু বাহন
শ্রাবণের
বিশ্বব্যাপী প্লাবনের।

তাই মনে ভাবি
যাবে নাবি
সর্ব দুঃখ সন্তাপ নিঃশেষে
উদার মাটির বক্ষোদেশে,
গভীর শীতল
যার স্তব্ধ অন্ধকারতল
কালের মথিত বিষ নিরন্তর নিতেছে সংহরি।
সেই বিলুপ্তির 'পরে দিবাবিভাবরী
তুলিছে শ্যামল তৃণস্তর
নিঃশব্দ সুন্দর।
শতাব্দীর সব ক্ষতি সব মৃত্যুক্ষত
যেখানে একান্ত অপগত
সেইখানে বনস্পতি প্রশান্ত গম্ভীর
সূর্যোদয়-পানে তোলে শির,
পুষ্প তার পত্রপুটে
শোভা পায় ধরিত্রীর মহিমামুকুটে।

বোবা মাটি, বোবা তরুদল,
ধৈর্যহারা মানুষের বিশ্বের দুঃসহ কোলাহল
স্তব্ধতায় মিলাইছ প্রতি মুহূর্তেই,—
নির্বাক সান্ত্বনা সেই
তোমাদের শান্তরূপে দেখিলাম,
করিনু প্রণাম।
দেখিলাম সব ব্যথা প্রতিক্ষণে লইতেছে জিনি
সুন্দরের ভৈরবী রাগিণী
সর্ব অবসানে
শব্দহীন গানে।

১৫ আষাঢ় ১৩৩৯

ছোটো প্রাণ

ছিলাম নিদ্রাগত,
সহসা আর্তবিলাপে কাঁদিল
রজনী ঝঞ্ঝাহত।
জাগিয়া দেখিনু পাশে
কচি মুখখানি সুখনিদ্রায়
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে।
সংসার-'পরে এই বিশ্বাস
দৃঢ় বাঁধা স্নেহডোরে
বজ্র-আঘাতে ভাঙে তা কেমন ক'রে

সৈন্যবাহিনী বিজয়কাহিনী
লিখে ইতিহাস জুড়ে।
শক্তিদম্ভ জয়স্তম্ভ
তুলিছে আকাশ ফুঁড়ে।
সম্পদসমারোহ
গগনে গগনে ব্যাপিয়া চলেছে
স্বর্ণমরীচিমোহ।
সেথায় আঘাতসংঘাতবেগে
ভাঙাচোরা যত হ'ক
তার লাগি বৃথা শোক।

কিন্তু হেথায় কিছু তো চাহে নি এরা।
এদের বাসাটি ধরণীর কোণে
ছোটো-ইচ্ছায় ঘেরা।
যেমন সহজে পাখির কুলায়
মৃদুকণ্ঠের গীতে
নিভৃত ছায়ায় ভরা থাকে মাধুরীতে।

হে রুদ্র, কেন তারো 'পরে বাণ হান,
কেন তুমি নাহি জান
নির্ভয়ে ওরা তোমারে বেসেছে ভালো,
বিস্মিত চোখে তোমারি ভুবনে
দেখেছে তোমার আলো

১৬ আষাঢ় ১৩৩৯

নিরাবৃত

যবনিকা-অন্তরালে মর্ত্য পৃথিবীতে
ঢাকাপড়া এই মন। আভাসে ইঙ্গিতে
প্রমাণে ও অনুমানে আলোতে আঁধারে
ভাঙা খণ্ড জুড়ে সে-যে দেখেছে আমারে
মিলায়ে তাহার সাথে নিজ অভিরুচি
আশা তৃষা। বারবার ফেলেছিল মুছি
রেখা তার ; মাঝে-মাঝে করিয়া সংস্কার
দেখেছে নূতন করে মোরে। কতবার
ঘটেছে সংশয়। এই যে সত্যে ও ভুলে
রচিত আমার মূর্তি, সংসারের কূলে
এ নিয়ে সে এতদিন কাটায়েছে বেলা।
এরে ভালোবেসেছিল, এরে নিয়ে খেলা
সাঙ্গ করে চলে গেছে।

বসে একা ঘরে
মনে-মনে ভাবিতেছি আজ,— লোকান্তরে
যদি তার দিব্য আঁখি মায়ামুক্ত হয়
অকস্মাৎ, পাবে যার নব পরিচয়
সে কি আমি। স্পষ্ট তারে জানুক যতই
তবু যে অস্পষ্ট ছিল তাহারি মতোই

এরে কি আপনি রচি বাসিবে সে ভালো।
হায় রে মানুষ এ যে। পরিপূর্ণ আলো
সে তো প্রলয়ের তরে, সৃষ্টির চাতুরী
ছায়াতে আলোতে নিত্য করে লুকোচুরি।
সে-মায়াতে বেঁধেছিনু মর্ত্যে মোরা দোঁহে
আমাদের খেলাঘর, অপূর্ণের মোহে
মুগ্ধ ছিনু, মর্ত্যপাত্রে পেয়েছি অমৃত।
পূর্ণতা নির্মম সে যে স্তব্ধ অনাবৃত।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,—
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, 'আরো কিছু আছে না কি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত?'
নামিল আঘাত।

এইমাত্র ? আর কিছু নয় ?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো ব'লে নিয়েছিনু গনি।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

অবাধ

সরে যা, ছেড়ে দে পথ,
দুর্ভর সংশয়ে ভারী তোর মন পাথরের পারা।
হালকা প্রাণের ধারা
দিকে দিকে ওই ছুটে চলে
কলকোলাহলে
দুরন্ত আনন্দভরে।
ওরাই যে লঘু করে
অতীতের পুরাতন বোঝা।
ওরাই তো করে দেয় সোজা
সংসারের বক্র ভঙ্গী চঞ্চল সংঘাতে।
ওদের চরণপাতে
জটিল জালের গ্রন্থি যত
হয় অপগত।

মলিনতা দেয় মেজে,
শ্রান্তি দূর করে ওরা ক্লান্তিহীন তেজে।

ওরা সব মেঘের মতন
প্রভাতকিরণপায়ী,— সিন্ধুর তরঙ্গ অগণন,
ওরা যেন দিশাহারা হাওয়ার উৎসাহ,
মাটির হৃদয়জয়ী নিরন্তর তরুর প্রবাহ ;
প্রাচীন রজনীপ্রান্তে ওরা সবে প্রথম-আলোক।
ওরা শিশু, বালিকা বালক,
ওরা নারী তারুণ্যে উচ্ছল।
ওরা যে নির্ভীক বীরদল
যৌবনের দুঃসাহসে বিপদের দুর্গ হানে,
সম্পদেরে উদ্ধারিয়া আনে।
পায়ের শৃঙ্খল ওরা চলে ঝংকারিয়া
অন্তরে প্রবল মুক্তি নিয়া।
আগামী কালের লাগি নাই চিন্তা, নাই মনে ভয়,
আগামী কালেরে করে জয়।

চলেছে চলেছে ওরা চারিদিক হতে
আঁধারে আলোতে,
সম্মুখের পানে
অজ্ঞাতের টানে।
তুই সরে যা রে
ওরে ভীরু, ভারাতুর সংশয়ের ভারে

১৮ আষাঢ় ১৩৩৯

যাত্রী

যে-কাল হরিয়া লয় ধন
সেই কাল করিছে হরণ
সে ধনের ক্ষতি।
তাই বসুমতী
নিত্য আছে বসুন্ধরা।
একে একে পাখি যায়, গানের পসরা
কোথাও না হয় শূন্য,
আঘাতের অন্ত নেই, তবুও অক্ষুণ্ন
বিপুল সংসার।
দুঃখ শুধু তোমার, আমার,
নিমেষের বেড়াঘেরা এখানে ওখানে।
সে-বেড়া পারায়ে তাহা পৌঁছায় না নিখিলের পানে।
ওরে তুমি, ওরে আমি,
যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
তরঙ্গের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গতি।
কান্না আর হাসি
এক বীণাতন্ত্রীতারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
একই শমে এসে
মহামৌনে মিলে যায় শেষে।
তোমার হৃদয়তাপ
তোমার বিলাপ
চাপা থাক্ আপনার ক্ষুদ্রতার তলে।
যেইখানে লোকযাত্রা চলে
সেখানে সবার সাথে নির্বিকার চলো একসারে,
দেখা দাও শান্তিসৌম্য আপনারে—
যে-শান্তি মৃত্যুর প্রান্তে বৈরাগ্যে নিভৃত,
আত্মসমাহিত;

দিবসের যত
ধূলিচিহ্ন, যত কিছু ক্ষত
লুপ্ত হল যে শান্তির অন্তিম তিমিরে ;
সংসারের শেষ তীরে
সপ্তর্ষির ধ্যানপুণ্য রাতে
হারায় যে-শান্তিসিন্ধু আপনারি অন্ত আপনাতে ;
যে-শান্তি নিবিড় প্রেমে
স্তব্ধ আছে থেমে,
যে-প্রেম শরীরমন অতিক্রম করিয়া সুদূরে
একান্ত মধুরে
লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি।
সে পরম শান্তি-মাঝে হ'ক তব অচঞ্চল স্থিতি।

১৮ আষাঢ় ১৩৩৯

মিলন

তোমারে দিব না দোষ। জানি মোর ভাগ্যের ভ্রূকুটি,
ক্ষুদ্র এই সংসারের যত ক্ষত, যত তার ত্রুটি,
যত ব্যথা আঘাত করিছে তব পরম সত্তারে
অহরহ। জানি যে তুমি তো নাই ছাড়ায়ে আমারে
নির্লিপ্ত সুদূর স্বর্গে। আমি মোর তোমাতে বিরাজে ;
দেওয়ানেওয়া নিরন্তর প্রবাহিত তুমি-আমি-মাঝে
দুর্গম বাধারে অতিক্রমি। আমার সকল ভার
রাত্রিদিন রয়েছে তোমারি 'পরে, আমার সংসার
সে শুধু আমারি নহে। তাই ভাবি এই ভার মোর
যেন লঘু করি নিজবলে, জটিল বন্ধনডোর

একে একে ছিন্ন করি যেন, মিলিয়া সহজ মিলে
দ্বন্দ্বহীন বন্ধহীন বিচরণ করি এ নিখিলে
না চেয়ে আপনা-পানে। অশান্তিরে করি দিলে দূর
তোমাতে আমাতে মিলি ধ্বনিয়া উঠিবে এক স্থর।

১৯ আষাঢ় ১৩৩৯

আগন্তুক

এসেছি স্থদূর কাল থেকে।
তোমাদের কালে
পৌঁছলেম যে-সময়ে
তখন আমার সঙ্গী নেই।
ঘাটে ঘাটে কে কোথায় নেবে গেছে।
ছোটো ছোটো চেনা স্থখ যত,
প্রাণের উপকরণ,
দিনের রাতের মুষ্টিদান
এসেছি নিঃশেষ করে বহুদূর পারে।
এ জীবনে পা দিয়েছি প্রথম যে-কালে
সে কালের 'পরে অধিকার
দৃঢ় হয়েছিল দিনে দিনে
ভাবে ও ভাষায়,
কাজে ও ইঙ্গিতে,
প্রণয়ের প্রাত্যহিক দেনাপাওনায়।
হেসে খেলে কোনোমতে সকলের সঙ্গে বেঁচে থাকা,
লোকযাত্রারথে
কিছু কিছু গতিবেগ দেওয়া,
শুধু উপস্থিত থেকে প্রাণের আসরে

ভিড় জমা করা,
এই তো যথেষ্ট ছিল

আজ তোমাদের কালে
প্রবাসী অপরিচিত আমি।
আমাদের ভাষার ইশারা
নিয়েছে নূতন অর্থ তোমাদের মুখে।
ঋতুর বদল হয়ে গেছে,—
বাতাসের উলটো-পালটা ঘ'টে
প্রকৃতির হল বর্ণভেদ।
ছোটো ছোটো বৈষম্যের দল
দেয় ঠেলা,
করে হাসাহাসি।
রুচি আশা অভিলাষ
যা মিশিয়ে জীবনের স্বাদ,
তার হল রসবিপর্যয়।

আমাদের সেকালকে যে-সঙ্গ দিয়েছি
যতই সামান্য হ'ক মূল্য তার
তবু সেই সঙ্গসূত্রে গাঁথা হয়ে মানুষে মানুষে
রচেছিল যুগের স্বরূপ,—
আমার সে-সঙ্গ আজ
মেলে না যে তোমাদের প্রত্যহের মাপে।
কালের নৈবেদ্যে লাগে যে সকল আধুনিক ফুল
আমার বাগানে ফোটে না সে।
তোমাদের যে-বাসার কোণে থাকি
তার খাজনার কড়ি হাতে নেই।
তাই তো আমাকে দিতে হবে
বড়ো কিছু দান
দানের একান্ত দুঃসাহসে।

উপস্থিত কালের যা দাবি
মিটাবার জন্যে সে তো নয়,
তাই যদি সেই দান তোমাদের রুচিতে না লাগে,
তবে তার বিচার সে পরে হবে।
তবু যা সম্বল আছে তাই দিয়ে
একালের ঋণ শোধ ক'রে অবশেষে
ঋণী তারে রেখে যাই যেন।
যা আমার লাভক্ষতি হতে বড়ো,
যা আমার সুখদুঃখ হতে বেশি—
তাই যেন শেষ করে দিয়ে চলে যাই
স্তুতি নিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে।

১১ জুলাই ১৯৩২

জরতী

হে জরতী,
অন্তরে আমার
দেখেছি তোমার ছবি।
অবসানরজনীতে দীপবর্তিকার
স্থিরশিখা আলোকের আভা
অধরে ললাটে— শুভ্র কেশে।
দিগন্তে প্রণামনত শান্ত-আলো প্রত্যুষের তারা
মুক্ত বাতায়ন থেকে
পড়েছে নিমেষহীন নয়নে তোমার।
সন্ধ্যাবেলা
মল্লিকার মালা ছিল গলে
গন্ধ তার ক্ষীণ হয়ে
বাতাসকে করুণ করেছে—

উৎসবশেষের যেন অবসন্ন অঙ্গুলির
বীণাগুঞ্জরণ।
শিশিরমন্থর বায়ু,
অশথের শাখা অকম্পিত।
অদূরে নদীর শীর্ণ স্বচ্ছ ধারা কলশব্দহীন,
বালুতটপ্রান্তে চলে ধীরে
শূন্যগৃহ-পানে
ক্লান্তগতি বিরহিণী বধূর মতন।

হে জরতী মহাশ্বেতা,
দেখেছি তোমাকে
জীবনের শারদ অম্বরে
বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুভ্র লঘু স্বচ্ছ মেঘে।
নিম্নে শস্যে ভরা খেত দিকে দিকে,
নদী ভরা কূলে কূলে,
পূর্ণতার স্তব্ধতায় বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সুগম্ভীর

হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণে ডুবিছে অতলে।
নিস্তরঙ্গ সেই সিন্ধুনীরে
তীর্থস্নান করি'
রাত্রির নিকষকৃষ্ণ শিলাবেদিমূলে
এলোচুলে করিছ প্রণাম
পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে।
চঞ্চলের অন্তরালে অচঞ্চল যে শান্ত মহিমা
চিরন্তন,
চরম প্রসাদ তার

নামিল তোমার নম্র শিরে
মানসসরোবরের অগাধ সলিলে
অস্তগত তপনের সর্বশেষ আলোর মতন।

১৩ জুলাই ১৯৩২

প্রাণ

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্‌বুদ ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।
সে না হলে বিরাটের নিখিলমন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।

১৪ জুলাই ১৯৩২

সাথী

তখন বয়স সাত।
মুখচোরা ছেলে,
একা একা আপনারি সঙ্গে হত কথা।
মেঝে বসে

ঘরের গরাদেখানা ধরে
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে
বয়ে যেত বেলা।
দূরে থেকে মাঝে-মাঝে ঢঙ ঢঙ করে
বাজত ঘণ্টার ধ্বনি,
শোনা যেত রাস্তা থেকে সইসের হাঁক।
হাঁসগুলো কলরবে ছুটে এসে নামত পুকুরে।
ও-পাড়ার তেলকলে বাঁশি ডাক দিত।
গলির মোড়ের কাছে দত্তদের বাড়ি,
কাকাতুয়া মাঝে-মাঝে উঠত চীৎকার করে ডেকে
একটা বাতাবিলেবু, একটা অশথ,
একটা কয়েতবেল, একজোড়া নারকেলগাছ,
তারাই আমার ছিল সাথী।
আকাশে তাদের ছুটি অহরহ,
মনে-মনে সে ছুটি আমার।
আপনারি ছায়া নিয়ে
আপনার সঙ্গে যে-খেলাতে
তাদের কাটত দিন
সে আমারি খেলা।
তারা চিরশিশু
আমার সমবয়সী।
আষাঢ়ে বৃষ্টির ছাঁটে, বাদলহাওয়ায়,
দীর্ঘ দিন অকারণে
তারা যা করেছে কলরব
আমার বালকভাষা
হো হা শব্দ করে
করেছিল তারি অনুবাদ।

তারপরে একদিন যখন আমার
বয়স পঁচিশ হবে,

বিরহের ছায়াম্লান বৈকালেতে
ওই জানালায়
বিজনে কেটেছে বেলা।
অশথের কম্পমান পাতায় পাতায়
যৌবনের চঞ্চল প্রত্যাশা
পেয়েছে আপন সাড়া।
সকরুণ মুলতানে গুন্ গুন্ গেয়েছি যে-গান
রৌদ্রে-ঝিলিমিলি সেই নারকেলডালে
কেঁপেছিল তারি স্বর।
বাতাবিফুলের গন্ধ ঘুমভাঙা সাথীহারা রাতে
এনেছে আমার প্রাণে
দূর শয্যাতল থেকে
সিক্ত আঁখি আর কার উৎকণ্ঠিত বেদনার বাণী।
সেদিন সে গাছগুলি
বিচ্ছেদে মিলনে ছিল যৌবনের বয়স্য আমার।

তারপরে অনেক বৎসর গেল
আরবার একা আমি।
সেদিনের সঙ্গী যারা
কখন্ চিরদিনের অন্তরালে তারা গেছে সরে।
আবার আরেকবার জানলাতে
বসে আছি আকাশে তাকিয়ে।
আজ দেখি সে অশ্বত্থ, সেই নারকেল
সনাতন তপস্বীর মতো।
আদিম প্রাণের
যে-বাণী প্রাচীনতম
তাই উচ্চারিত রাত্রিদিন
উচ্ছ্বসিত পল্লবে পল্লবে।
সকল পথের আরম্ভেতে
সকল পথের শেষে

পুরাতন যে নিঃশব্দ মহাশান্তি স্তব্ধ হয়ে আছে,
নিরাসক্ত নির্বিচল সেই শান্তি-সাধনার
মন্ত্র ওরা প্রতিক্ষণে দিয়েছে আমার কানে-কানে

১৬ জুলাই ১৯৩২

বোবার বাণী

আমার ঘরের সম্মুখেই
পাকে পাকে জড়িয়ে শিমুলগাছে
উঠেছে মালতীলতা।
আষাঢ়ের রসস্পর্শ
লেগেছে অন্তরে তার।
সবুজ তরঙ্গগুলি হয়েছে উচ্ছল
পল্লবের চিক্কণ হিল্লোলে।
বাদলের ফাঁকে ফাঁকে মেঘচ্যুত রৌদ্র এসে
ছোঁয়ায় সোনার-কাঠি অঙ্গে তার,
মজ্জায় কাঁপন লাগে,
শিকড়ে শিকড়ে বাজে আগমনী।
যেন কত-কী-যে কথা নীরবে উৎসুক হয়ে থাকে
শাখাপ্রশাখায়।
এই মৌনমুখরতা
সারারাত্রি অন্ধকারে
ফুলের বাণীতে হয় উচ্ছ্বসিত,
ভোরের বাতাসে উড়ে পড়ে।

আমি একা বসে বসে ভাবি
সকালের কচি আলো দিয়ে রাঙা
ভাঙা ভাঙা মেঘের সমুখে ;

বৃষ্টিধোওয়া মধ্যাহ্নের
গোরুচরা মাঠের উপরে আঁখি রেখে ;
নিবিড় বর্ষণে আর্ত্ত
শ্রাবণের আর্দ্র অন্ধকার রাতে ;
নানা কথা ভিড় করে আসে
গহন মনের পথে,
বিবিধ রঙের সাজ,
বিবিধ ভঙ্গীতে আসাযাওয়া,—
অন্তরে আমার যেন
ছুটির দিনের কোলাহলে
কথাগুলো মেতেছে খেলায়।

তবুও যখন তুমি আমার আঙিনা দিয়ে যাও
ডেকে আনি, কথা পাই নে তো।
কখনো যদি বা ভুলে কাছে আস
বোবা হয়ে থাকি।
অবারিত সহজ আলাপে
সহজ হাসিতে
হল না তোমার অভ্যর্থনা।
অবশেষে ব্যর্থতার লজ্জায় হৃদয় ভরে দিয়ে
তুমি চলে যাও,
তখন নির্জন অন্ধকারে
ফুটে ওঠে ছন্দে-গাঁথা সুরে-ভরা বাণী—
পথে তারা উড়ে পড়ে,
যার খুশি সাজি ভরে নিয়ে চলে যায়।

৩ শ্রাবণ ১৩৩৯

আঘাত

সোঁদালের ডালের ডগায়
মাঝে মাঝে পোকাধরা পাতাগুলি
কুঁকড়ে গিয়েছে ;
বিলিতি নিমের
বাকলে লেগেছে উই ;
কুরচির গুঁড়িটাতে পড়েছে ছুরির ক্ষত,
কে নিয়েছে ছাল কেটে ;
চারা অশোকের
নিচেকার দুয়েকটা ডালে
শুকিয়ে পাতার আগা কালো হয়ে গেছে।
কত ক্ষত, কত ছোটো মলিন লাঞ্ছনা,
তারি মাঝে অরণ্যের অক্ষুণ্ণ মর্যাদা
শ্যামল সম্পদে
তুলেছে আকাশ-পানে পরিপূর্ণ পুজার অঞ্জলি
কদর্যের কদাঘাতে
দিয়ে যায় কালিমার মসীরেখা,
সে-সকলি অধঃসাৎ ক'রে
শান্ত প্রসন্নতা
ধরণীরে ধন্য করে পূর্ণের প্রকাশে।

ফুটিয়েছে ফুল সে যে,
ফলিয়েছে ফলভার,
বিছিয়েছে ছায়া-আস্তরণ,
পাখিরে দিয়েছে বাসা,
মৌমাছিরে জুগিয়েছে মধু,
বাজিয়েছে পল্লবমর্মর।
পেয়েছে সে প্রভাতের পুণ্য আলো,
শ্রাবণের অভিষেক,
বসন্তের বাতাসের আনন্দমিতালি,—

পেয়েছে সে ধরণীর প্রাণরস,
সুগভীর সুবিপুল আয়ু,.
পেয়েছে সে আকাশের নিত্য আশীর্বাদ।
পেয়েছে সে কীটের দংশন।

১৯ জুলাই ১৯৩২

শান্ত

বিদ্রূপবাণ উদ্যত করি
এসেছিল সংসার,
নাগাল পেল না তার।
আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
শান্ত মনের স্তব্ধ গহনে
ধ্যানের বীণার সুরে
রেখেছে তাহারে ঘিরি।
হৃদয়ে তাহার উচ্চ উদয়গিরি।
সেথা অন্তরলোকে
সিন্ধুপারের প্রভাত-আলোক
জ্বলিছে তাহার চোখে।
সে আলোকে এই বিশ্বের রূপ
অপরূপ হয়ে জাগে।
তার দৃষ্টির আগে
বিরূপ বিকল খণ্ডিত যত-কিছু
বিদ্রোহ ছেড়ে বিরাটের পায়ে
করে এসে মাথা নিচু।

সিন্ধুতীরের শৈলতটের 'পরে
হিংসামুখর তরঙ্গদল
যতই আঘাত করে,

কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত
অতলের মহালীলা,
ফেনিল নৃত্যে দামামা বাজায় শিলা।
হে শান্ত, তুমি অশান্তিরেই
মহিমা করিছ দান,
গর্জন এসে তোমার মাঝারে
হল ভৈরব গান।
তোমার চোখের গভীর আলোকে
অপমান হল গত
সন্ধ্যামেঘের তিমিররন্ধ্রে
দীপ্ত রবির মতো।

১৪ চৈত্র ১৩৩৮

জলপাত্র

প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত,
জান তাহা হে জীবননাথ।
তবুও সবার দ্বার ঠেলে
কেন এলে
কোন্ দুখে
আমার সম্মুখে।
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে
মাঠের পথের বাঁকে বাঁকে
তীব্র দ্বিপ্রহরে
আসিতেছিলাম ধেয়ে আপনার ঘরে।
চাহিলে তৃষ্ণার বারি,
আমি হীন নারী

তোমারে করিব হেয়,
সে কি মোর শ্রেয়।
ঘটখানি নামাইয়া চরণে প্রণাম ক'রে
কহিলাম, "অপরাধী করিয়ো না মোরে।"
শুনিয়া আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী,
হাসিয়া কহিলে, "হে মৃন্ময়ী,
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা,
সেইমতো তুমি
লক্ষ্মীর আসন, তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোনো জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই।
তাহারে অরুণরাঙা উষা
পরায় আপন ভূষা;
তারাময়ী রাতি
দেয় তার বরমাল্য গাঁথি।
মোর কথা শোনো,
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।
যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল অভিরুচি
সেও কি অশুচি।
বিধাতা প্রসন্ন যেথা আপনার হাতের সৃষ্টিতে
নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিসবৃষ্টিতে।"
জলভরা মেঘস্বরে এই কথা ব'লে
তুমি গেলে চলে।

তার পর হতে
এ ভঙ্গুর পাত্রখানি প্রতিদিন উষার আলোতে
নানা বর্ণে আঁকি,
নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।

হে মহান, নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ,
সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমা-পানে করুক বহন।

২৪ জুলাই ১৯৩২

আতঙ্ক

বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে
গোধূলিবেলায়
বাগানের জীর্ণ পাঁচিলেতে
সাদাকালো দাগগুলো
দেখা দিত ভয়ংকর মূর্তি ধরে
ওইখানে দৈত্যপুরী,
অদৃশ্য কুঠরি থেকে তার
মনে-মনে শোনা যেত হাঁউমাউখাঁউ।
লাঠি হাতে কুঁজোপিঠ
খিলিখিলি হাসত ডাইনিবুড়ী।
কাশীরাম দাস
পয়ারে যা লিখেছিল হিড়িম্বার কথা
ইঁট-বের-করা সেই পাঁচিলের 'পরে
ছিল তারি প্রত্যক্ষ কাহিনী।
তারি সঙ্গে সেইখানে নাককাটা সূর্পণখা
কালো কালো দাগে
করেছিল কুটুম্বিতা।

সতেরো বৎসর পরে
গিয়েছি সে সাবেক বাড়িতে।
দাগ বেড়ে গেছে,
মুগ্ধ নতুনের তুলি পুরোনোকে দিয়েছে প্রশ্রয়।

ইঁটগুলো মাঝে-মাঝে খসে গিয়ে
পড়ে আছে রাশকরা।
গায়ে গায়ে লেগেছে অনন্তমূল,
কালমেঘ লতা,
বিছুটির ঝাড় ;
ভাঁটিগাছে হয়েছে জঙ্গল।
পুরোনো বটের পাশে
উঠেছে ভেরেণ্ডাগাছ মস্তবড়ো হয়ে।
বাইরেতে স্থর্পণখা-হিড়িম্বার চিহ্নগুলো আছে,
মনে তারা কোনোখানে নেই।

স্টেশনে গেলেম ফিরে একবার খুব হেসে নিয়ে।
জীবনের ভিত্তিটার গায়ে
পড়েছে বিস্তর কালো দাগ
মূঢ় অতীতের মসীলেখা ;
ভাঙা গাঁথুনিতে
ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহ্নগুলো।
মাঝে-মাঝে
যেদিন বিকেলবেলা
বাদলের ছায়া নামে
সারি সারি তালগাছে
দিঘির পাড়িতে,
দূরের আকাশে
স্নিগ্ধ সুগম্ভীর
মেঘের গর্জন ওঠে গুরুগুরু,
ঝিঁঝিঁ ডাকে বুনো খেজুরের ঝোপে,
তখন দেশের দিকে চেয়ে
বাঁকাচোরা আলোহীন পথে
ভেঙেপড়া দেউলের মূর্তি দেখি ;
দীর্ণ ছাদে, তার জীর্ণ ভিতে

নামহীন অবসাদ,—
অনির্দিষ্ট শঙ্কাগুলো নিদ্রাহীন পেঁচা,
নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি যত,
দুর্বলের স্বরচিত শত্রুর চেহারা।
ধিক্ রে ভাঙনলাগা মন,
চিন্তায় চিন্তায় তোর কত মিথ্যা আঁচড় কেটেছে
দুষ্টগ্রহ সেজে ভয়
কালোচিহ্নে মুখভঙ্গী করে।
কাঁটা-আগাছার মতো
অমঙ্গল নাম নিয়ে
আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে।
চারিদিকে সারি সারি জীর্ণ ভিতে
ভেঙেপড়া অতীতের বিরূপ বিকৃতি
কাপুরুষে করিছে বিদ্রূপ।

২৩ জুলাই ১৯৩২

আলেখ্য

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটনলেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি,
যে-সংসারে হতেছে বিচার
নিন্দাপ্রশংসার।
এই আস্পর্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।
অব্যক্ত আছিলি যবে
বিশ্বের বিচিত্ররূপ চলেছিল নানা কলরবে

নানা ছন্দে লয়ে
স্বজনে প্রলয়ে।
অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি'
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।
পথে আমি চলেছিনু। তোর আবেদন
করিল ভেদন
নাস্তিত্বের মহা-অন্তরাল,
পরশিল মোর ভাল
চুপে-চুপে
অর্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্তিরূপে।
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে
আনিয়াছি তোকে।
ব্যথা কি কোথাও বাজে
মূর্তির মর্মের মাঝে।
সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লজ্জিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।
যদিও তাই-বা হয়
নাই ভয়,
প্রকাশের ভ্রম কোনো
চিরদিন রবে না কখনো।
রূপের মরণত্রুটি
আপনিই যাবে টুটি
আপনারি ভারে,
আরবার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে।

২৪ জুলাই ১৯৩২

সান্ত্বনা

সকালের আলো এই বাদলবাতাসে
মেঘে রুদ্ধ হয়ে আসে
ভাঙা কণ্ঠে কথার মতন।
মোর মন
এ অস্ফুট প্রভাতের মতো
কী কথা বলিতে চায়, থাকে বাক্যহত।
মানুষের জীবনের মজ্জায় মজ্জায়
যে-দুঃখ নিহিত আছে অপমানে শঙ্কায় লজ্জায়,
কোনো কালে যার অন্ত নাই,
আজি তাই
নির্যাতন করে মোরে। আপনার দুর্গমের মাঝে
সান্ত্বনার চির-উৎস কোথায় বিরাজে,
যে-উৎসের গূঢ় ধারা বিশ্বচিত্ত-অন্তঃস্তরে
উন্মুক্ত পথের তরে
নিত্য ফিরে যুঝে,
আমি তারে মরি খুঁজে।
আপন বাণীতে
কী পুণ্যে বা পারিব আনিতে
সেই সুগম্ভীর শান্তি, নৈরাশ্যের তীব্র বেদনারে
স্তব্ধ যা করিতে পারে।
হায় রে ব্যথিত,
নিখিল-আত্মার কেন্দ্রে বাজে অকথিত
আরোগ্যের মহামন্ত্র, যার গুণে
সৃজনের হোমের আগুনে
নিজেরে আহুতি দিয়া নিত্য সে নবীন হয়ে উঠে,—
প্রাণেরে ভরিয়া তুলে নিত্যই মৃত্যুর করপুটে।
সেই মন্ত্র শান্ত মৌনতলে
শুনা যায় আত্মহারা তপস্যার বলে।

মাঝে-মাঝে পরম বৈরাগী
সে-মন্ত্র চেয়েছে দিতে সর্বজন লাগি।
কে পারে তা করিতে বহন,
মুক্ত হয়ে কে পারে তা করিতে গ্রহণ।
গতিহীন আর্ত অক্ষমের তরে
কোন্ করুণার স্বর্গে মন মোর দয়া ভিক্ষা করে
ঊর্ধ্বে বাহু তুলি।
কে বন্ধু রয়েছ কোথা, দাও দাও খুলি
পাষাণকারার দ্বার—
যেথায় পুঞ্জিত হল নিষ্ঠুরের অত্যাচার,
বঞ্চনা লোভীর,
যেথায় গভীর
মর্মে উঠে বিষাইয়া সত্যের বিকার।
আমিত্ববিমুগ্ধ মন যে দুর্বহ ভার
আপনার আসক্তিতে জমায়েছে আপনার 'পরে,
নির্মম বর্জনশক্তি দাও তার অন্তরে অন্তরে।
আমার বাণীতে দাও সেই সুধা
যাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধা।

হেনকালে সহসা আসিল কানে
কোন্ দূর তরুশাখে শ্রান্তিহীন গানে
অদৃশ্য কে পাখি
বারবার উঠিতেছে ডাকি।
কহিলাম তারে, 'ওগো, তোমার কণ্ঠেতে আছে আলো,
অবসাদ-আঁধার ঘুচাল।
তোমার সহজ এই প্রাণের প্রোল্লাস
সহজেই পেতেছে প্রকাশ।
আদিম আনন্দ যাহা এ বিশ্বের মাঝে,
যে-আনন্দ অস্তিমে বিরাজে,

যে পরম আনন্দলহরী
যত দুঃখ যত সুখ নিয়েছে আপনা-মাঝে হরি,
আমারে দেখালে পথ তুমি তারি পানে
এই তব অকারণ গানে।

২৭ জুলাই ১৯৩২

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী

তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে।
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন্ সে পুবেন বায়ে
দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছায়ে।
গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
তোমার বাণী এপার হতে মিলল তারি মাঝে।
বিষ্ণু আমায় কইল কানে, বললে দশভুজা,
"অজানা ওই সিন্ধুতীরে নেব আমার পুজা।"
মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো
পুব সাগরে হাত বাড়িয়ে বললে, "চলো, চলো।"
রামায়ণের কবি আমায় কইল আকাশ হতে,
"আমার বাণী পার করে দাও দূর সাগরের স্রোতে।"
তোমার ডাকে উতল হল বেদব্যাসের ভাষা—
বললে, "আমি ওই পারেতে বাঁধব নূতন বাসা।"
আমার দেশের হৃদয় সেদিন কইল আমার কানে,
"আমায় বয়ে যাও গো লয়ে সুদূর দেশের পানে।"

সেদিন প্রাতে সুনীল জলে ভাসল আমার তরী,—
শুভ্র পালে গর্ব জাগায় শুভ হাওয়ায় ভরি।
তোমার ঘাটে লাগল এসে, জাগল সেথায় সাড়া,
কূলে কূলে কাননলক্ষ্মী দিল আঁচল নাড়া।
প্রথম দেখা আবছায়াতে আঁধার তখন ধরা,
সেদিন সন্ধ্যা সপ্তঋষির আশীর্বাদে ভরা।
প্রাতে মোদের মিলনপথে উষা ছড়ায় সোনা,
সে-পথ বেয়ে লাগল দোঁহার প্রাণের আনাগোনা।

দুইজনেতে বাঁধনু বাসা পাথর দিয়ে গেঁথে,
দুইজনেতে বসনু সেথায় একটি আসন পেতে।

বিরহরাত ঘনিয়ে এল কোন্ বরষের থেকে,
কালের রথের ধুলা উড়ে দিল আসন ঢেকে।
বিস্মরণের ভাঁটা বেয়ে কবে এলেম ফিরে
ক্লান্তহাতে রিক্তমনে একা আপন তীরে।
বঙ্গসাগর বহুবরষ বলে নি মোর কানে
সে যে কভু সেই মিলনের গোপন কথা জানে।
জাহ্নবীও আমার কাছে গাইল না সেই গান
সুদূর পারের কোথায় যে তার আছে নাড়ীর টান।

এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে।
মুখের পানে চেয়ে তোমার আবার পড়ে মনে
আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।
হয়েছিল রাখিবাঁধন সেদিন শুভ প্রাতে,
সেই রাখি যে আজো দেখি তোমার দখিন হাতে।
এই সে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
সে চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে
সেই সেদিনের প্রদীপজ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো,
নূতনপাওয়া পুরানোকে আপন ব'লে জেনো।

৪ ভাদ্র ১৩৩৪

[বাটাভিয়া] যবদ্বীপ

বোরোবুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দনমর্মরে ;
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি'
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।

নারিকেল-বনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছুসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগযুগান্তরে।
অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা ; সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা—
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে-ভাষার লিপির লিখন।

সে-লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে
সে-লিপির বাণী সনাতন
করেছে গ্রহণ
প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।
অদূরে নদীর কিনারাতে
আলবাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে ;—
আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।

কালের সে-লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম,—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'
প্রাণ যার দুদিনের, নাম যার মিলাল নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম,—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

কত যাত্রী কতকাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কত দিন,
তাদের আপনকণ্ঠ ক্ষীণ।
ইঙ্গিতপুঞ্জিত তুঙ্গ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি,—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

অর্থ আজ হারায়েছে সে-যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতিকুহেলিকা।
অর্ঘ্যশূন্য কৌতুহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী,—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।
চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা ;
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে,
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে ;

অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া ;
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র,—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭
বোরোবুদুর [যবদ্বীপ]

সিয়াম

প্রথম দর্শনে

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পুরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে
আনন্দমুখর উদ্বোধন,—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে, কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,—
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে,—

সে-মন্ত্র অমৃতবাণী হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থসমীরণে।

সে-মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে-মন্ত্রভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুব কেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে ;—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে,
এক ধর্ম, এক সঙ্ঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে
সে-বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ,
নবযুগ-যাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ ;
সে-বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসরত্নহার।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,—
পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে,—
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সে-অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,—
আজি আমি তারে দেখি লব,—
ভারতের যে-মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে-নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে—
যে-যুগের গিরিশৃঙ্গ-'পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

11 October 1927
Phya Thai Palace Hotel
[Bangkok]

সিয়াম

বিদায়কালে

কোন্ সে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমার গোপন ধ্যানে
চিহ্নিত করেছে তব নাম,
হে সিয়াম,
বহু পূর্বে যুগান্তরে মিলনের দিনে।
মুহূর্তে লয়েছি তাই চিনে
তোমারে আপন বলি,
তাই আজ ভরিয়াছি ক্ষণিকের পথিক-অঞ্জলি
পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে,
সপ্তাহ হয়েছে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহীন গানে।
চিরন্তন আত্মীয়জনারে
দেখিয়াছি বারে বারে
তোমার ভাষায়,
তোমার ভক্তিতে, তব মুক্তির আশায়,
সুন্দরের তপস্যাতে
যে-অর্ঘ্য রচিলে তব সুনিপুণ হাতে
তাহারি শোভন রূপে—
পূজার প্রদীপে তব, প্রজ্জ্বলিত ধূপে।

আজি বিদায়ের ক্ষণে
চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়নে,
দাঁড়ানু ক্ষণিক তব অঙ্গনের তলে,
পরাইনু গলে
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে—
অম্লান কুসুম যার ফুটেছিল বহুযুগ আগে।

৩০ আশ্বিন ১৩৩৪
ইণ্টরন্যাশনাল রেলোয়ে [সিয়াম]

বুদ্ধদেবের প্রতি

সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হ'ক, মুক্ত হ'ক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হ'ক প্রাণবান।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

24. 10. 31.
Darjeeling

পারস্যে জন্মদিনে

ইরান, তোমার যত বুলবুল
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনাল তাহারে অভিনন্দনবাণী।

ইরান, তোমার বীর সন্তান,
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।

ইরান, তোমার সম্মানমালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক,—
ইরানের জয় হ'ক।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৯
[তেহেরান]

ধর্মমোহ

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা,—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্বরতার বিকারবিড়ম্বনা,
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।—
প্রলয়ের ওই শুনি শৃঙ্গধ্বনি,
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী।

যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া,
যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে,—
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে।

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে-পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

৩১ বৈশাখ ১৩৩৩
রেলপথ

সংযোজন

প্রাচী

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !
ঢেকেছে তোমারে নিবিড় তিমির
যুগযুগব্যাপী অমারজনীর ;
মিলেছে তোমার সুপ্তির তীর
লুপ্তির কাছাকাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

জীবনের যত বিচিত্র গান
ঝিল্লিমন্দ্রে হল অবসান ;
কবে আলোকের শুভ আহ্বান
নাড়ীতে উঠিবে নাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

সঁপিবে তোমারে নবীন বাণী কে।
নবপ্রভাতের পরশমানিকে
সোনা করি দিবে ভুবনখানিকে,
তারি লাগি বসি' আছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

জরার জড়িমা-আবরণ টুটে
নবীন রবির জ্যোতির মুকুটে
নব রূপ তব উঠুক-না ফুটে,
করপুটে এই যাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

'খোলো খোলো দ্বার, ঘুচুক আঁধার',
নবযুগ আসি ডাকে বারবার—
দুঃখ-আঘাতে দীপ্তি তোমার
সহসা উঠুক বাঁচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

ভৈরবরাগে উঠিয়াছে তান,
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ,
নবীনের হাতে লহো তব দান
জ্বালাময় মালাগাছি
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী

[জ্যৈষ্ঠ ? ১৩৩০
শিলঙ]

আশীর্বাদ

শ্রীমতী লীলা দেবী কল্যাণীয়াসু

বিশ্ব-পানে বাহির হবে
আপন কারা টুটি—
এই সাধনায় কুঁড়ি ওঠে
কুসুম হয়ে ফুটি।
বীজ আপনার বাঁধন ছিঁড়ে
ফলেরে দেয় সাড়া।
সূর্যতারা আঁধার চিরে
জ্যোতিরে দেয় ছাড়া।
এই সাধনায় যোগযুক্ত
সাধু তাপসবর
মৃত্যু হতে করেন মুক্ত
অমৃতনির্ঝর।
এই সাধনায় বিশ্বকবির
আনন্দবীন বাজে,—
আপ্‌নারে দেয় উৎস্রাবিয়া
আপন সৃষ্টি-মাঝে।
সেই ফল পাও প্রেমের যোগে
পুণ্য মিলনব্রতে ;
আপ্‌নারে দাও ছুটি তুমি
আপন বন্ধ হতে।
আত্মভোলা দুইটি প্রাণে
মিলবে একাকার,
সেই মিলনে বিকাশ হবে
নূতন সংসার।

১১ আষাঢ় ১৩৩০

আশীর্বাদ

শ্রীমতী কল্পনা দেবীর প্রতি

সুন্দর ভক্তির ফুল অলক্ষ্যে নিভৃত তব মনে
যদি ফুটে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমীরণে,
হে শোভনে, আজি এই নির্মল কোমল গন্ধ তার
দিয়েছ দক্ষিণা মোরে, কবির গভীর পুরস্কার।

লহো আশীর্বাদ বৎসে, আপন গোপন অন্তঃপুরে
ছন্দের নন্দনবন সৃষ্টি করো সুধাস্নিগ্ধ সুরে,—
বঙ্গের নন্দিনী তুমি, প্রিয়জনে করো আনন্দিত,
প্রেমের অমৃত তব ঢেলে দিক গানের অমৃত।

২২ ভাদ্র ১৩৩০
শান্তিনিকেতন

লক্ষ্যশূন্য

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি,—
"থামো থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।" রথী কহে, "ওই মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।"
গৃহী কহে, "নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।" রথী কহে, "যেতে হবে আগে।"
"কোন্‌খানে" শুধাইল। রথী বলে, "কোনোখানে নহে,—
শুধু আগে।" "কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে" গৃহী কহে।
"কোথাও না, শুধু আগে।" "কোন্ বন্ধু-সাথে হবে দেখা।"
"কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।"
ঘর্ঘরিত রথবেগে গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস

সন্ধ্যার আকাশে। আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া জাহাজ

প্রবাসী

পরবাসী চলে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণভরে।
বারে বারে শুভদিন
ফিরে গেল অর্থহীন,
চেয়ে আছে সবে তোমা-তরে,
ফিরে এসো ঘরে।

আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
বন ভরা ফুলে ফুলে,
এসো এসো, লহো তুলে,
উঠে ডাক মর্মরে মর্মরে।

ফসলে ঢাকিয়া যায় মাটি,
তুমি কি লবে না তাহা কাটি।
ওই দেখো কতবার
হল খেয়া পারাপার,
সারিগান উঠিল অম্বরে।

কোথা যাবে সে কি জানা নেই।
যেথা আছ ঘর সেখানেই।

মন যে দিল না সাড়া,
তাই তুমি গৃহছাড়া,
পরবাসী বাহিরে অন্তরে।

আঙিনায় আঁকা আলিপনা,
আঁখি তব চেয়ে দেখিল না।
মিলনঘরের বাতি
জ্বলে অনিমেষভাতি
সারারাতি জানালার 'পরে

বাঁশি পড়ে আছে তরুমূলে,
আজ তুমি আছ তারে ভুলে।
কোনোখানে সুর নাই,
আপন ভুবনে তাই
কাছে থেকে আছ দূরান্তরে

এসো এসো মাটির উৎসবে,
দক্ষিণবায়ুর বেণুরবে।
পাখির প্রভাতীগানে,
এসো এসো পুণ্যস্নানে
আলোকের অমৃতনির্ঝরে।

ফিরে এসো তুমি উদাসীন,
ফিরে এসো তুমি দিশাহীন।
প্রিয়েরে বরিতে হবে,
বরমাল্য আনো তবে,
দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে।

দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে,
বীর তুমি বক্ষে লহো তারে।

পথের কণ্টক দলি
ক্ষতপদে এসো চলি
ঝটিকার মেঘমন্দ্রস্বরে।

বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে, তবে
ঘর তব আপনার হবে।
তুফান তুলিবে কূলে,
কাঁটাও ভরিবে ফুলে,
উৎসধারা ঝরিবে প্রস্তরে।

[চৈত্র ১৩৩২]

বুদ্ধজন্মোৎসব

সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম-অনুসারে পঠনীয়

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি,
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার,
লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম
চিরমধুনিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

এস দানবীর, দাও
ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু, লও সবার
অহংকার ভিক্ষা।

লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল কর জ্ঞানসূর্য-উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন,
নয়ন লভুক অন্ধ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয়
তাপদহনদীপ্ত।
বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ
খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন, তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সংগীতরাগ,
তব সুন্দর ছন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

১৩৩৩

প্রথম পাতায়

লিখতে যখন বল আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা কলম
নাচবে আজো আমার হাতে,—
সেই কলমে আছে মিশে
ভাদ্রমাসের কাশের হাসি,

সেই কলমে সাঁঝের মেঘে
লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।
সেই কলমে শিশু দোয়েল
শিস দিয়ে তার বেড়ায় উড়ি।
পারুলদিদির বাসায় দোলে
কনকচাঁপার কচি কুঁড়ি।
খেলার পুতুল আজো আছে
সেই কলমের খেলাঘরে ;
সেই কলমে পথ কেটে দেয়
পথহারানো তেপান্তরে।
নতুন চিকন অশথপাতা
সেই কলমে আপনি নাচে।
সেই কলমে মোর বয়সে
তোমার বয়স বাঁধা আছে।

৮ বৈশাখ ১৩৩৪

নূতন

আমরা খেলা খেলেছিলেম,
আমরাও গান গেয়েছি ;
আমরাও পাল মেলেছিলেম,
আমরা তরী বেয়েছি।
হারায় নি তা হারায় নি,
বৈতরণী তা পারায় নি,
নবীন আঁখির চপল আলোয়
সে কাল ফিরে পেয়েছি।

দূর রজনীর স্বপন লাগে
আজ নূতনের হাসিতে।

দূর ফাগুনের বেদন জাগে
আজ ফাগুনের বাঁশিতে।
হায় রে সেকাল, হায় রে
কখন্ চলে যায় রে
আজ একালের মরীচিকায়
নতুন মায়ায় ভাসিতে।

যে-মহাকাল দিন ফুরালে
আমার কুসুম ঝরাল,
সেই তোমারি তরুণ ভালে
ফুলের মালা পরাল।
কইল শেষের কথা সে,
কাঁদিয়ে গেল হতাশে,
তোমার মাঝে নতুন সাজে
শূন্য আবার ভরাল।

আনলে ডেকে পথিক মোরে
তোমার প্রেমের আগুনে।
শুকনো ঝোরা দিল ভ'রে
এক পসলায় শাগুনে।
সন্ধ্যামেঘের কোনাতে
রক্তরাগের সোনাতে
শেষ নিমেষের বোঝাই দিয়ে
ভাসিয়ে দিলে ভাগুনে।

৩০ বৈশাখ ১৩৩৪
শিলঙ

শুকসারী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পাহাড়-আঁকা চিত্রপত্রিকার উত্তরে

শুক বলে, গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য ;
সারী বলে, মেঘমালা, সেই বা কী সামান্য,—
গিরির মাথায় থাকে।
শুক বলে, গিরিরাজের দৃঢ় অচল শিলা ;
সারী বলে, মেঘমালার আদি-অন্তই লীলা,—
বাঁধবে কে-বা তাকে ?

শুক বলে, নদীর জলে গিরি ঢালেন প্রাণ ;
সারী বলে, তার পিছনে মেঘমালার দান,—
তাই তো নদী আছে।
শুক বলে, গিরীশ থাকেন গিরিতে দিনরাত্র ;
সারী বলে, অন্নপূর্ণা ভরেন ভিক্ষাপাত্র,—
সে তো মেঘের কাছে।

শুক বলে, হিমাদ্রি যে ভারত করে ধন্য ;
সারী বলে, মেঘমালা বিশ্বেরে দেয় স্তন্য,—
বাঁচে সকল জন।
শুক বলে, সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি,—
সারী বলে, মেঘমালার নিত্যনূতন সৃষ্টি ;
তাই সে চিরন্তন।

৩১ বৈশাখ ১৩৩৪
শিলঙ

সুসময়

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যাসোনার ভাণ্ডারদ্বার-পানে,
দস্যুর বেশে যতই করে সে দাবি
কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি,
গগন সঘন অবগুণ্ঠন টানে।

'খোলো খোলো মুখ' বনলক্ষ্মীরে ডাকে,
নিবিড় ধুলায় আপনি তাহারে ঢাকে।
'আলো দাও' হাঁকে, পায় না কাহারো সাড়া,
আঁধার বাড়ায়ে বেড়ায় লক্ষ্মীছাড়া,
পথ সে হারায় আপন ঘূর্ণিপাকে।

তারপরে যবে শিউলিফুলের বাসে
শরৎলক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
কুন্দকলির স্নিগ্ধশীতল কথা,
মৃদু উচ্ছ্বাস মর্মরে ঘাসে ঘাসে,—

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
সবুজ খেতের নবীনধানের শিষে
ঢেউ খেলে যায় আলোকছায়ায় মিশে,
গগনসীমায় কাশের কাঁপন লাগে,—

হঠাৎ তখন সূর্যডোবার কালে
দীপ্তি লাগায় দিক্‌ললনার ভালে;
মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দা আঁধার-কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
চরম খনের পরম প্রদীপ জ্বালে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

নূতন কাল

নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বললে আমায় হেসে,—
"আমার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখ্‌খনো কি পার,
বারে বারেই হার।"
আমি বললেম, "তাই বই কি! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হ'ক দেখি তো লড়াই।"
"আচ্ছা তবে দেখাই তোমায়" এই ব'লে সে যেমনি টানলে হাত
দাদামশাই তখ্‌খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আনলে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত।

বারে বারে শুধায় আমায়, "বলো তোমার হার হয়েছে না কি।"
আমি কইলেম, "বলতে হবে তা কি।
ধুলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি।
এই কথা কি জান—
আমার কাছে নন্দগোপাল যখনি হার মান
আমারি সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধুলোয় যেদিন পড়ব যেন এই জানি নিশ্চিত,
তোমারি শেষ জিত।"

২৩ অগস্ট [১৯২৭]
রুম্‌ফিউস জাহাজ

পরিণয়মঙ্গল

হৈমন্তী দেবী ও অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পরিণয়-উপলক্ষে

উত্তরে দুয়াররুদ্ধ হিমানীর কারাদুর্গতলে
প্রাণের উৎসবলক্ষ্মী বন্দী ছিল তন্দ্রার শৃঙ্খলে।
যে নীহারবিন্দু ফুল ছিঁড়ি তার স্বপ্নমন্ত্রপাশ
কঠিনের মরুবক্ষে মাধুরীর আনিল আশ্বাস,

হৈমন্তী নিঃশব্দে কবে গেঁথেছে তাহারি শুভ্রমালা
নিভৃত গোপন চিত্তে ; সেই অর্ঘ্যে পূর্ণ করি ডালা
লাবণ্যনৈবেদ্যখানি, দক্ষিণসমুদ্র-উপকূলে
এনেছে অরণ্যচ্ছায়ে, যেথায় অগণ্য ফুলে ফুলে
রবির সোহাগগর্ব বর্ণগন্ধমধুরসধারে
বৎসরের ঋতুপাত্র উচ্ছলিয়া দেয় বারে বারে।
বিস্ময়ে ভরিল মন, এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল,
কোথা করে অন্তর্ধান মুহূর্তে দুস্তর অন্তরাল—
দক্ষিণপবনসখা উৎকণ্ঠিত বসন্ত কেমনে
হৈমন্তীর কণ্ঠ হতে বরমাল্য নিল শুভক্ষণে।

১ পৌষ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন

জীবনমরণ

জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি
নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
অধীরা হল ধরা মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।
আজিকে আলো ছায়া করিছে কোলাকুলি,
আজিকে এক দোলে দুজনে দোলাদুলি
শুকানো পাতা আর মুকুলে।
আজিকে শিরীষের মুখর উপবনে
জড়িত পাশাপাশি নূতনে পুরাতনে
চিকন শ্যামলের দুকূলে।

বিরহে টানে মিড় মিলন-বীণাতারে,
সুখের বুকে বাজে বেদনা

কপোত কাকলিতে করুণা সঞ্চারে,
কাননদেবী হল বিমনা।
আমারো প্রাণে বুঝি বহেছে ওই হাওয়া,
কিছু-বা কাছে আসা, কিছু-বা চলে যাওয়া,
কিছু-বা স্মরি কিছু পাসরি।
যে আছে যে-বা নাই আজিকে দোঁহে মিলি
আমার ভাবনাতে ভ্রমিছে নিরিবিলি
বাজায়ে ফাগুনের বাঁশরি।

[ফাল্গুন ১৩৩৪]

গৃহলক্ষ্মী

নবজাগরণ-লগনে গগনে বাজে কল্যাণশঙ্খ—
এসো তুমি উষা ওগো অকলুষা, আনো দিন নিঃশঙ্ক
দ্যুলোকভাসানো আলোকসুধায়
অভিষেক তুমি করো বসুধায়,
নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার এনে দাও অকলঙ্ক।

সম্মুখ-পানে নবযুগ আজি মেলুক উদার চিত্র।
অমৃতলোকের দ্বার খুলে দিন্ চিরজীবনের মিত্র।
বিশ্বের পথে আসিয়াছে ডাক,
যাত্রীরা সবে যাক ধেয়ে যাক,
দেহমন হতে হ'ক অপগত অবসাদ অপবিত্র।

মৌন যে ছিল বক্ষে তাহার বাজুক বীণার তন্ত্র,
নব বিশ্বাসে আশ্বাসহীন শুনুক বিজয়মন্ত্র।
এসো আনন্দ, দুঃখহরণ,
দুঃখেরে দাও করিতে বরণ,
মরণতোরণ পার হয়ে পাই অমর প্রাণের পন্থ।

কল্যাণী, তব অঙ্গনে আজি হবে মঙ্গলকর্ম,—
শুভসংগ্রামে যে যাবে তাহারে পরাও বীরের বর্ম।
বলো সবে ডাকি "ছাড়ো সংশয়",
বলো যাত্রীরে "হয়েছে সময়",
বলো "নাহি ভয়", বলো "জয় জয়, জয়ী যেন হয় ধর্ম"।

পশ্চাৎ-পানে ফিরায়ে ডেকো না, মনে জাগায়ো না দ্বন্দ্ব,
দুর্বল শোকে অশ্রুসলিলে নয়ন কোরো না অন্ধ।
সংকট-মাঝে ছুটিবার কালে
বাঁধিয়া রেখো না আবেশের জালে,
যে-চরণ বাধা লঙ্ঘিবে, তাহে জড়ায়ো না মোহবন্ধ।

? বৈশাখ ১৩৩৪

রঙিন

ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে।
কেউ-বা জলে কেউ-বা তারা স্থলে।
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে
পায়ের কাছের পথটি চিনে
দুঃসাহসে এগিয়ে তারা চলে।

কোন্ মহারাজ রথের 'পরে একা,
ভালো করে যায় না তাঁরে দেখা
সূর্যতারা অন্ধকারে
ডাইনে বাঁয়ে উঁকি মারে,
আপন আলোয় দৃষ্টি তাদের ঠেকা।

আমার মশাল সামনে ধরি না যে,
তাই তো আলো চক্ষে নাহি বাজে।

অন্তরে মোর রঙের শিখা
চিত্তকে দেয় আপন টিকা,
রঙিনকে তাই দেখি মনের মাঝে।

পাখিরা রঙ ওড়ায় আকাশতলে,
মাছেরা রঙ খেলায় গভীর জলে ;
রঙ জেগেছে বনসভায়
গোলাপ চাঁপা রঙন জবায়,
মেঘেরা রঙ ফোটায় পলে পলে।

নীরব ডাকে রঙমহালের রাজা
হুকুম করেন, 'রঙের আসর সাজা।'—
অমনি ফাগুন কোথা হতে
ভেসে আসে হাওয়ার স্রোতে,
পুরানোকে রাঙিয়ে করে তাজা।

তাদের আসর বাহির-ভুবনেতে,
ফেরে সেথায় রঙের নেশায় মেতে।
আমার এ রঙ গোপন প্রাণে,
আমার এ রঙ গভীর গানে,
রঙের আসন ধেয়ানে দিই পেতে।

২৬ ভাদ্র ১৩৩৫

আশীর্বাদী

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সংবর্ধনা উপলক্ষে

আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়,
নবীন বটে ছিলেম কোনো কালে।
বসন্তে আজ কত নূতন বোঁটায়
ধরল কুঁড়ি বাণীবনের ডালে।

কত ফুলের যৌবন যায় চুকে
একবেলাকার মৌমাছিদের প্রেমে।
মধুর পালা রেণুকণার মুখে
ঝরা পাতায় ক্ষণিকে যায় থেমে।

ফাগুনফুলে ভরেছিলে সাজি,
শ্রাবণমাসে আনো ফলের ভিড়।
সেতারেতে ইমন উঠে বাজি
সুরবাহারে দিক কানাড়ার মিড়।

২ ভাদ্র ১৩৩৮

বসন্ত-উৎসব

এ-বৎসর দোলপূর্ণিমা ফাল্গুন পার হয়ে চৈত্রে পৌঁছল। আমের মুকুল নিঃশেষিত, আমবাগানে মৌমাছির ভিড় নেই, পলাশ-ফোটার পালা ফুরল, গাছের তলায় শুকনো শিমুল তার শেষমধু পিঁপড়েদের বিলিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। কাঞ্চনশাখা প্রায় দেউলে, ঐশ্বর্যের অল্প কিছু বাকি। কেবল শালের বীথিকা ভরে উঠেছে মঞ্জরিতে। উৎসব-প্রভাতে আশ্রমকন্যারা ঋতুরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলে এই পুষ্পিত শালের বনে, তার বল্কলে আবির মাখিয়ে দিলে, তার ছায়ায় রাখলে মাল্যপ্রদীপের অর্ঘ্য। চতুর্দশীর চাঁদ যখন অস্তদিগন্তে, প্রভাতের ললাটে যখন অরুণ-আবিরের তিলকরেখা ফুটে উঠল, তখন আমি এই ছন্দের নৈবেদ্য বসন্ত-উৎসবের বেদির জন্য রচনা করেছি।

আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পতি,
লহো আমাদের নতি।
তুমি এসেছিলে মোদের সবার আগে
প্রাণের পতাকা রাঙায়ে হরিৎরাগে,
সংগ্রাম তব কত ঝঞ্ঝার সাথে,
কত দুর্দিনে কত দুর্যোগরাতে
জয়গৌরবে ঊর্ধ্বে তুলিলে শির
হে বীর, হে গম্ভীর।

তোমার প্রথম অতিথি বনের পাখি,
শাখায় শাখায় নিলে তাহাদের ডাকি,
স্নিগ্ধ আদরে গানেরে দিয়েছ বাসা,
মৌন তোমার পেয়েছে আপন ভাষা,
স্থরে কিশলয়ে মিলন ঘটালে তুমি—
মুখরিত হল তোমার জন্মভূমি।

আমরা যেদিন আসন নিলেম আসি
কহিল স্বাগত তব পল্লবরাশি,
তার পর হতে পরিচয় নব নব
দিবসরাত্রি ছায়াবীথিতলে তব
মিলিল আসিয়া নানা দিগ্‌দেশ হতে
তরুণ জীবনস্রোতে।

বৈশাখতাপ শান্ত শীতল করো,
নববর্ষারে করি দাও ঘনতর,
শুভ্র শরতে জ্যোৎস্নার রেখাগুলি
ছায়ায় মিলায়ে সাজাও বনের ধূলি,
মধুলক্ষ্মীরে আনিয়াছে আহ্বানি
মঞ্জরিভরা স্থন্দর তব বাণী।

নীরব বন্ধু, লহো আমাদের প্রীতি,
আজি বসন্তে লহো এ কবির গীতি,
কোকিলকাকলি শিশুদের কলরবে
মিলেছে আজি এ তব জয়-উৎসবে,
তোমার গন্ধে মোর আনন্দে আজি
এ পুণ্যদিনে অর্ঘ্য উঠিল সাজি

গম্ভীর তুমি, সুন্দর তুমি, উদার তোমার দান,
লহো আমাদের গান।

দোলপূর্ণিমা ১৩৩৮
শান্তিনিকেতন

আশীর্বাদ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে

অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা
কোণে কোণে তারি পুঞ্জিত হল জীবনের ভাঙা আশা।
ঘরের মধ্যে বুকের কাঁদনগুলা
উড়িয়ে বেড়ায় ধুলা।
ফুষিয়া রুষিয়া উঠে নিরুদ্ধ বায়ু,
শোষণ করিছে আয়ু।
যেখানে-সেখানে মলিনের লাগে ছোঁওয়া,
দীপ নিভে যায়, তীব্রগন্ধ ধোঁওয়া
রোধ করে নিশ্বাস,
কঠোর ভাগ্য হানে নিষ্ঠুর ভাষ।

ওরে দরিদ্র, চেয়ে দেখ্ তোর ভাঙা ভিত্তির ধারে,
অসীম আকাশ, কে তারে রোধিতে পারে।
সেথা নাই বন্ধন,
প্রভাত-আলোকে প্রতিদিন আসে তব অভিনন্দন।
সন্ধ্যার তারা তোমারি মুখেতে চাহে,
তোমারি মুক্তি গাহে।
তব সত্তার মহিমা ঘোষিছে সব সত্তার মাঝে,
হে মানব, তুমি কোথায় লুকাও লাজে।
যেখানে ক্ষুদ্র সেখানে পীড়িত তুমি,
কর্কশ হাসি হাসিছে যেথায় দৈন্যের মরুভূমি

তাহার বাহিরে তোমার উদার স্থান,
বিশ্ব তোমারে বক্ষ মেলিয়া করিতেছে আহ্বান।

১৮ আশ্বিন
শুক্ল পঞ্চমী ১৩৩৯

আশীর্বাদ

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে

প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক প্রথম সোপান,
দ্বিতীয় পঞ্চাশ তাহে গৌরবে করুক অভ্যুত্থান।

২ পৌষ
১৩৩৯

তোমার মুখর দিন হে দিনেন্দ্র, লইয়াছে তুলি
আপনার দিগ্‌ দিগন্তে রবির সংগীতরশ্মিগুলি
প্রহর করিয়া পূর্ণ। মেঘে মেঘে তারি লিপি লিখে
বিরহমিলনবাণী পাঠাইলে বহু দূর দিকে
উদার তোমার দান। রবিকর করি মর্মগত
বনস্পতি আপনার পত্রপুষ্পে করে পরিণত,
তাহারি নৈবেদ্য দিয়ে বসন্তের রচে আরাধনা
নিত্যোৎসব-সমারোহে। সেইমতো তোমার সাধনা।
রবির সম্পদ হ'ত নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।
সুরে সুরে রূপ নিল তোমা-'পরে স্নেহ সুগভীর
রবির সংগীতগুলি আশীর্বাদ রহিল রবির।

২ পৌষ
১৩৩৯

উত্তিষ্ঠত নিবোধত

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা দেবী

আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ—
জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ
আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে ; যা পেয়েছ দান
তার মূল্য দিতে হবে, দিতে হবে তাহারে সম্মান
নিত্য তব নির্মল নিষ্ঠায়। নহে ভোগ, নহে খেলা
এ জীবন, নহে ইহা কালস্রোতে ভাসাইতে ভেলা
খেয়ালের পাল তুলে। আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসারপথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো,
সত্যলক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর,
জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর—
দুঃখেরে স্বীকার করি ; অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে নিরালস্যে করিবে মার্জনা
প্রতিক্ষণে সাবধানে, এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত
চিন্তায় বচনে কর্মে তব— উত্তিষ্ঠত নিবোধত।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০
গ্লেন্ এডেন, দার্জিলিঙ

প্রার্থনা

কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিদারুণ দ্বন্দ্ব যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে ; দেখি অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রয়াসে
বুভুক্ষার বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে
নিঃসহায় দুর্ভাগার সকরুণ সকল প্রত্যাশা,
জীবনের সকল সম্বল ; দুঃখীর আশ্রয়বাসা

নিশ্চিন্তে ভাঙিয়া আনে দুর্দাম দুরাশাহোমানলে
আহুতি-ইন্ধন জোগাইতে ; নিঃসংকোচ গর্বে বলে,
আত্মতৃপ্তি ধর্ম হতে বড়ো ; দেখি আত্মম্ভরী প্রাণ
তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান
গৌরবের মৃগতৃষ্ণিকায় ; সিদ্ধির স্পর্ধার তরে
দীনের সর্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় ধূলি-'পরে
জয়যাত্রাপথে ;— দেখি' ধিক্কারে ভরিয়া উঠে মন,
আত্মজাতি-মাংসলুব্ধ মানুষের প্রাণনিকেতন
উন্মীলিছে নখে দন্তে হিংস্র বিভীষিকা ;— চিত্ত মম
নিষ্কৃতিসন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গমসম,
মুহূর্তে মুহূর্তে বাজে শৃঙ্খলবন্ধন-অপমান
সংসারের। হেনকালে জ্বলি উঠে বজ্রাগ্নি-সমান
চিত্তে তাঁর দিব্যমূর্তি, সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
বর্তমানকাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল-মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা-বন্দীশালা হতে।— ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রেই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
তোমারি করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,—
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।— আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি', বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি' ; প্রমাদবিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি ; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।

২৯ জুলাই ১৯৩৩

অতুলপ্রসাদ সেন

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত কর নি কভু কারে
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে।

মৈত্রী তব সমুচ্ছল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধাঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলাল,
রসতৈলে জ্বেলেছিল আলো।

দিন পরে গেছে দিন, মাস পরে মাস,
তোমা হতে দূরে ছিল আমার আবাস।
'হবে হবে, দেখা হবে'—
এ-কথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে।

আমারো যাবার কাল এল শেষে আজি,
'হবে হবে, দেখা হবে' মনে ওঠে বাজি।
সেখানেও হাসিমুখে
বাহু মেলি লবে বুকে
নবজ্যোতির্দীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে-মনে জাগে।

এখানে গোপন চোর ধরার ধুলায়
করে সে বিষম চুরি যখন ভুলায়।
যদি ব্যথাহীন কাল
বিনাশের ফেলে জাল,
বিরহের স্মৃতি লয় হরি,
সব-চেয়ে সে-ক্ষতিরে ডরি।

তাই বলি, দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।
অনেক হারাতে হয়,
তারেও করিনে ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি,
তার বেশি যেন নাহি থাকি।

১৯ ভাদ্র ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

—

নাটক ও প্রহসন

বসন্ত

উৎসর্গ

শ্রীমান কবি নজ্‌রুল ইস্‌লাম

স্নেহভাজনেষু

১০ ফাল্গুন

১৩২৯

বসন্ত

রাজা। কবি!

কবি। কী মহারাজ।

রাজা। আমি মন্ত্রণাসভা থেকে পালিয়ে এসেছি।

কবি। সৎকার্য করেছেন। কিন্তু মহারাজের এমন সুমতি হল কেন।

রাজা। বৎসর শেষ হয়ে এল, রাজকোষ শূন্যপ্রায়। মন্ত্রণাসভায় বসলেই সচিবরা আসেন তাঁদের নিজ বিভাগের জন্যে টাকা দাবি করতে। কাজেই পলায়ন ছাড়া গতি নেই।

কবি। এতে উপকার হবে।

রাজা। কার উপকার হবে।

কবি। রাজ্যের।

রাজা। সে-কি কথা।

কবি। রাজা মাঝে-মাঝে সরে দাঁড়ালে প্রজারা রাজত্ব করবার অবকাশ পায়।

রাজা। তার অর্থ কী হল।

কবি। রাজার অর্থ যখন শূন্যে এসে ঠেকে প্রজা তখন নিজের অর্থ খুঁজে বের করে, তাতেই তার রক্ষা।

রাজা। কবি, তোমার কথাগুলো বাঁকা ঠেকছে। মন্ত্রণাসভা ছেড়ে এসেছি, আবার তোমার সঙ্গও ছাড়তে হবে নাকি।

কবি। না, তার দরকার হবে না। আপনি যখন পলাতক তখন তো আমাদেরই দলে এসে পড়েছেন।

রাজা। তোমার দলে?

কবি। হাঁ মহারাজ, আমি জন্মপলাতক।

গান

আমরা বাস্তুছাড়ার দল,
ভবের পদ্মপত্রে জল।
আমরা করছি টলমল।
মোদের আসাযাওয়া শূন্য হাওয়া
নাইকো ফলাফল।

রাজা। তুমি আমাকে দলে টানতে চাও? অতদূর এগোতে পারব না। আমাকে মন্ত্রীরা মিলে সভাছাড়া করেছে, তাই বলে কি কবির দলে ভিড়ে শেষে—

কবি। শুধু আমাকে দেখে ভয় পাবেন না, এ দলে আপনি রাজসঙ্গীও পাবেন।

রাজা। রাজসঙ্গী? কে বলো তো।

কবি। ঋতুরাজ।

রাজা। ঋতুরাজ? বসন্ত?

কবি। হাঁ মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি—

রাজা। বুঝেছি, বোধ করি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে করছেন।

কবি। পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।

রাজা। কী দুঃখে।

কবি। দুঃখে নয়, আনন্দে।

রাজা। কবি, তোমার হেঁয়ালি রাখো; আমার অধ্যাপকের দল তোমার হেঁয়ালি শুনে রাগ করে, বলে ওগুলোর কোনো অর্থ নেই। আজ বসন্ত-উৎসবে কী পালা তৈরি করেছ সেইটে বলো।

কবি। আজ সেই পলাতকার পালা।

রাজা। বেশ বেশ। বুঝতে পারব তো?

কবি। বোঝাবার চেষ্টা করি নি।

রাজা। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু না-বোঝাবার চেষ্টা কর নি তো?

কবি। না মহারাজ, এতে মূলেই অর্থ নেই, বোঝা না-বোঝার কোনো বালাই নেই, কেবল এতে সুর আছে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শুরু হ'ক। কিন্তু ওদিকে মন্ত্রণাসভার কাজ চলছে, আওয়াজ শুনে মন্ত্রীরা তো—

কবি। হাঁ মহারাজ, তাঁরাসুদ্ধ হয়তো পলাতকার দলে যোগ দিতে পারেন। তাতে দোষ কী হয়েছে। ফাল্গুন-যে পড়েছে।

রাজা। সর্বনাশ! এখানে এসে যদি আবার—

কবি। ভয় নেই। শূন্যকোষের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার ভারই মন্ত্রীদের বটে, কিন্তু শূন্যকোষের কথা ভুলিয়ে দেবার ভারই তো কবির উপরে।

রাজা। তাহলে ভালো কথা। তাহলে আর দেরি নয়। ভোলবার অত্যন্ত দরকার হয়েছে। দলবল সব প্রস্তুত তো? আমাদের নাট্যাচার্য দিনপতি—

কবি। ওই তো তিনি ভারতীর কমলবনের মধুগন্ধে বিহ্বল হয়ে বসে আছেন।

রাজা। দেখে মনে হচ্ছে বটে শূন্য রাজকোষের কথায় ওঁর কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

কবি। উনি আমাদের উৎসবের বন্ধু, দুর্ভিক্ষের দিনে ওঁকে না হলে চলে না। কারণ উনি ক্ষুধার কথা সুধা দিয়ে ভোলান।

রাজা। সাধু! আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। বিশেষত আমার অর্থসচিবের সঙ্গে। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আছেন। তাঁর মনে যদি পুলক সঞ্চার করতে পারেন তাহলে—

কবি। ফস করে বেশি আশা দিয়ে ফেলবেন না— রাজকোষের অবস্থা যে রকম—

রাজা। হাঁ হাঁ, বটে বটে।—আচ্ছা, তবে তোমার পালা আরম্ভ হবে কী দিয়ে।

কবি। ঋতুরাজ আসবেন, প্রস্তুত হবার জন্যে আকাশে একটা ডাক পড়েছে।

রাজা। বলছে কী।

কবি। বলছে, সব দিয়ে ফেলতে হবে।

রাজা। নিজেকে একেবারে শূন্য ক'রে? সর্বনাশ!

কবি। না, নিজেকে পূর্ণ ক'রে। নইলে দেওয়া তো ফাঁকি দেওয়া।

রাজা। মানে কী হ'ল।

কবি। যে-দেওয়া সত্যি, সে দেওয়াতে ভরতি করে। বসন্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে উঠবে।

রাজা। তাহলে ধরণীর সঙ্গে ধরণীপতির ওইখানে অমিল দেখতে পাচ্ছি। আমি তো দান করতে গিয়ে প্রায়ই বিপদে পড়ি— অর্থসচিবের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হতে থাকে।

কবি। যে-দান সত্য তার দ্বারা বাইরের ধন বিনাশ পায়, অন্তরের ধন বিকাশ পেতে থাকে।

রাজা। ও আবার কী। এটা উপদেশের মতো শোনাচ্ছে, কবি।

কবি। তাহলে আর দেরি নয়, গান শুরু হ'ক।

বসন্তের পরিচরগণ

সব দিবি কে, সব দিবি পায়,
আয় আয় আয়।
ডাক পড়েছে ওই শোনা যায়,
আয় আয় আয়।
আসবে-যে সে স্বর্ণরথে,
জাগবি কারা রিক্ত পথে
পৌষরজনী তাহার আশায়।
আয় আয় আয়।
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা,
হায় হায় হায়।
তার পরে তার যাবার বেলা,
হায় হায় হায়।
চলে গেলে জাগবি যবে
ধনরতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে-যে দায়।
হায় হায় হায়।

রাজা। দাবি তো কম নয়।

কবি। দাবি বড়ো হলেই দান সহজ হয় ; ছোটো হলেই কৃপণতা জাগায়

রাজা। তা এরা সব রাজী আছে ?

কবি। ওদের মুখেই শুনে নিন।

বনভূমি

বাকি আমি রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে
ছেয়ে দেব ভুঁই।

ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে
বকুল বেলা জুঁই।
দখিনসাগর পার হয়ে-যে
এলে পথিক তুমি।
আমার সকল দেব অতিথিরে
আমি বনভূমি।
আমার কুলায়ভরা রয়েছে গান,
সব তোমারেই করেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায়
চরণ যখন ছুঁই।

আম্রকুঞ্জ

ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।
বসন্তগান পাখিরা গায়,
বাতাসে তার সুর ঝরে যায়,
মুকুল ঝরার ব্যাকুল খেলা
আমারি সেই রাগিণী রে।
জানি নে ভাই, ভাবি নে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে
বাজবে সেদিন তালে তালে,
'চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধুর মধুযামিনীরে।'

রাজা। ভাবখানা বুঝেছি কবি।

কবি। কী বুঝলেন।

রাজা। 'ফল ফলাব' বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে

'ফল চাই নে' বলতে পারলে, ফল আপনি ফলে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।

কবি। মহারাজ, এটা যেন উপদেশের মতো শোনাচ্ছে।

রাজা। ঠিক কথা। তাহলে গান ধরো।

করবী

যদি তারে নাই চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে।
(জানি নে জানি নে)
সে কি আমার কুঁড়ির কানে
ক'বে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানি নে জানি নে)
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার।
গোপন কথা নেবে জিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানি নে জানি নে)

রাজা। ওদিকে ও কিসের গোলমাল শুনতে পাই।

কবি। দখিনহাওয়া-যে এল।

রাজা। তা হয়েছে কী।

কবি। বাইরের বেণুবন উতলা হয়ে উঠেছে, কিন্তু ঘরের কোণের দীপশিখাটি নববধূর মতো শঙ্কিত।

বেণুবন

দখিনহাওয়া, জাগো জাগো
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
আমি বেণু, আমার শাখায়
নীরব-যে হায় কত-না গান।
(জাগো জাগো)

দীপশিখা

ধীরে ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।
নিশীথরাতের বাঁশি বাজে,
শান্ত হও গো, শান্ত হও

বেণুবন

পথের ধারে আমার কারা
ওগো পথিক বাঁধনহারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তিদোলা করে যে দান।

দীপশিখা

আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি
ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে-কানে
মৃদু মৃদু কও।

বেণুবন

গানের পাখা যখন খুলি
বাধাবেদন তখন ভুলি।

দীপশিখা

তোমার দূরের গাথা বনের বাণী
ঘরের কোণে দেয়-যে আনি।

বেণুবন

যখন আমার বুকের মাঝে
তোমার পথের বাঁশি বাজে,
বন্ধভাঙার ছন্দে আমার
মৌন কাঁদন হয় অবসান।
দখিনহাওয়া, জাগো জাগো,
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ

দীপশিখা

আমার কিছু কথা আছে
ভোরের বেলার তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও।
ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।

ঋতুরাজের পরিচরবর্গ

সহসা ডালপালা তোর উতলা-যে!
(ও চাঁপা, ও করবী)
কারে তুই দেখতে পেলি
আকাশ-মাঝে
জানি না যে।
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
(ও চাঁপা, ও করবী)

কার নাচনের নূপুর বাজে
জানি না যে।
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান যে তোর
মনে জাগে।
কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে
ফুলে ফুলে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কে সাজালে রঙিন সাজে
জানি না যে।

কবি। ঋতুরাজের দূতেরা ভাবছে কেউ খবর পায় নি— পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু পায়ের শব্দ যে হৃৎকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।

মাধবী

সে কি ভাবে গোপন রবে
লুকিয়ে হৃদয় কাড়া।
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা,
সে যে সৃষ্টিছাড়া।
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
'ওই এল যে', 'ওই এল যে'
পরান দিল সাড়া।
এই তো আমার আপনারি এই
ফুল ফোটানোর মাঝে
তারে দেখি নয়ন ভ'রে
নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখির গানে গানে
চরণধ্বনি বয়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এই তো দিল নাড়া।

রাজা। কবি, ওই তো পূর্ণচন্দ্র উঠেছে দেখছি।

কবি। দখিনহাওয়ায় যেন কোন্ দেবতার স্বপ্ন ভেসে এল।

রাজা। শুধু দখিনহাওয়ায় ওকে ভাসালে চলবে না কবি, তোমার গানের সুরও চাই। জগতে কেবল যে দেবতাই আছেন তা তো নয়।

শালবীথিকা

ভাঙল হাসির বাঁধ।
অধীর হয়ে মাতল কেন
পূর্ণিমার ওই চাঁদ।
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
মুকুলছাওয়া বকুলবনে
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়
ঘটায় পরমাদ।
ঘুমের আঁচল আকুল হল
কী উল্লাসের ভরে।
স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল
দিকে দিগন্তরে।
আজ রাতের এই পাগলামিরে
বাঁধবে ব'লে কে ওই ফিরে,
শালবীথিকায় ছায়া গেঁথে
তাই পেতেছে ফাঁদ।

বকুল

ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে-গান তোমার সুরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,

মোর আঙিনায় বাজল সে-সুর
আমার প্রাণের তালে তালে।
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিনহাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল
আমার প্রাণে রঙের হিলোল,
মর্মরিত মর্ম আমার
জড়ায় তোমার হাসির জালে।

রাজা। সব তো বুঝলুম। আকাশ থেকে চাঁদ দেখছি পৃথিবীর হৃদয়কে দোলা লাগিয়েছে। কিন্তু ওঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে কষে দোলা না দিতে পারলে তো জবাব দেওয়া হয় না। তার কী করলে।

কবি। তার তো ব্যবস্থা হয়েছে মহারাজ। আমাদের নদীর ঢেউ আছে তো, সেদিকে চেয়ে দেখো না। চাঁদ টলোমলো।

নদী

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা।
আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল ভোলা।
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগাল
ওই চাহনি তুফানতোলা।
আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধুরীর কমলকানন
দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্বদোলন দোলার বেগে
উঠল জেগে আমার গানের
কল্লোলিনী কলরোলা।

রাজা। এবার ওই কে আসে।

কবি। বলব না। চিনতে পারেন কিনা দেখতে চাই

দখিনহাওয়া

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
উদাসকরা কোন্ সুরে।
ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী
জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে।
চিনি চিনি হেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেল,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো,
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে।

রাজা। ওহে কবি, তোমার এ পালাটা কী রকম করে তুলেছ। বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমার ঋতুরাজ কই।

কবি। ওই যে, এই খানিক আগে দেখলেন।

রাজা। ওই জীর্ণ বসন প'রে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না। ও তো মূর্তিমান পুরাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি, ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,— তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরি, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতনপুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। তাহলে নবীন মূর্তিটা একবার দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন।

কবি। ওই-যে এসেছেন। পথিকবেশে, নূতনপুরাতনের মাঝখানকার নিত্যযাতায়াতের পথে।

রাজা। তোমার পলাতকা বুঝি পথে-পথেই থাকেন?

কবি। হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি, আমি ওঁরই গানের তলপি বয়ে বেড়াই।

গান

গানগুলি মোর শৈবালেরি দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চ'লে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে,
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে,
পায় না কোনো ফল।
ওদের সাধন তো নাই—
কিছু সাধন তো নাই;
ওদের বাঁধন তো নাই—
কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে-যাওয়ার স্রোতের 'পরে
করে টলমল।

রাজা। আর দেরি নয়, কবি। ওই দেখো, মন্ত্রণাসভা থেকে অর্থসচিব এসেছে। রাজকোষের কথা পাড়বার পুর্বেই ঋতুরাজের আসর জমাও।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

তোমার বাস কোথা-যে পথিক ওগো,
দেশে কি বিদেশে।
তুমি হৃদয়-পুর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্বনেশে।

ঋতুরাজ

আমার বাস কোথা-যে জান নাকি,
শুধাতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী, ও মালতী।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।
মনে করি আমার তুমি,
বুঝি নও আমার।
বলো বলো বলো পথিক,
বলো তুমি কার।

ঋতুরাজ

আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে
ও মাধবী, ও মালতী।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।

বনপথ

আজ দখিনবাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফুল
ফুটল বনের ঘাসে।

ঋতুরাজ

ও মোর পথের সাথী, পথে পথে
গোপনে যায় আসে।

বনপথ

কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,

শিরীষ তোমার ভরবে সাজি—
ফুটেছে সেই আশে।

ঋতুরাজ

এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে।

বনপথ

ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে
যাও বা না-যাও ভুলে।
ওরে নাই-বা দিলে দোলা, ওরে
নাই-বা নিলে তুলে।
সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে একপাশে।

ঋতুরাজ

ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

রাজা। খুব জমেছে, কবি। সুরের দোলায় চাঁদকে দুলিয়েছ। ওই দেখো-না, আমার অর্থসচিবসুদ্ধ দুলছে।

কবি। এবার সময় হয়েছে।

রাজা। কিসের সময়।

কবি। ঋতুরাজের যাবার সময়।

রাজা। আমাদের অর্থসচিবকে চোখে পড়েছে নাকি।

কবি। বলেইছি তো, পুর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পুর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ওও তেমনি এক খেলা।

রাজা। আমি কিন্তু ওই পুর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।

কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় থাকে না।

রাজা। বোধ হচ্ছে যেন এখনি উপদেশ দিতে শুরু করবে।

কবি। আচ্ছা তাহলে আবার গান শুরু হ'ক।

ঋতুরাজ

এখন আমার সময় হল,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হল দেখা, হল মেলা,
আলোছায়ায় হল খেলা,
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো।
আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ বলে দাও পরানবঁধুর,
সব আবরণ তোলো তোলো।

মাধবী

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে,
তোমায় ডাকব না তো ফিরে।
করব তোমায় কী সম্ভাষণ।
কোথায় তোমার পাতব আসন
পাতাঝরা কুসুমঝরা নিকুঞ্জকুটিরে।
তুমি আপ্‌নি যখন আস তখন
আপ্‌নি কর ঠাঁই,
আপ্‌নি কুসুম ফোটাও, মোরা
তাই দিয়ে সাজাই।
তুমি যখন যাও, চলে যাও,
সব আয়োজন হয়-যে উধাও,
গান ঘুচে যায়, রং মুছে যায়,
তাকাই অশ্রুনীরে।

ঋতুরাজ

এবেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে
ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে।
সেখানে স্তব্ধ বীণার তারে তারে,
সুরের খেলা ডুবসাঁতারে,
সেখানে চোখ মেলে যার পাই নে দেখা
তাহারে মন জানে গো, মন জানে।
এবেলা মন যেতে চায় কোন্‌খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।
সেখানে মিলনদিনের ভোলা হাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে-কথাটি হয় না বলা
সে কথা রয় কানে গো, রয় কানে।

ঝুমকোলতা

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসী মোরা,
কথা রাখো, কথা রাখো।
আজো বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফুল ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো।
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো— গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্ বেদনায় হায় রে,
মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী।
পথিক, তারে ডাকো ডাকো।

আকন্দ

এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো,
(ও চাঁপা, ও করবী)
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো।
যাবার পথে আকাশতলে
মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝর ঝর।
হেরো হেরো ওই রুদ্র রবি
স্বপ্ন ভাঙায় রক্তছবি।
খেয়াতরীর রাঙা পালে
আজ লাগল হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থর থর।

ধুতুরা

আজ খেলাভাঙার খেলা খেলবি আয়।
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলনমালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুনদিনের আজ স্বপন তো ছুটবে,
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ওই শিখরচূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণবাঁচন,
হাসিকাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।

জবা

ভয় করব না রে
বিদায়বেদনারে।

আপন সুধা দিয়ে
ভরে দেব তারে।
চোখের জলে সে-যে নবীন র'বে,
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বুকের হারে।
নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে,
মিলবে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহব্যথায় বিধুর দিনে
দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে,
এ মোর সাধনা রে।

সকলে

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন পূর্ণ হবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।
তাণ্ডবে ওই তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণি লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়,
ঝংকারিয়া উঠল আকাশ ঝঞ্ঝারবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।

রাজা। আমার মন্ত্রণাসভার দশা করলে কী। সব মন্ত্রী-যে এখানে এসে জুটেছে। ওই দেখো, আমার অর্থসচিবসুদ্ধ-যে নাচতে শুরু করে দিলে। বড়ো লঘু হয়ে পড়ছেন না?

কবি। ওঁর-যে থলি শূন্য হয়ে গেছে, তাই নাচে টেনেছে। বোঝা ভারি থাকলে গৌরবে নড়তে পারতেন না। আজ আমাদের অগৌরবের উৎসব।

রাজা। রাজগৌরব?

কবি। সেও টি঳কল না। তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলেছেন। এবার ধরণীতে তপস্যার দিন এসেছে, অর্থসচিবদের হাতে কাজ থাকবে না।

ভাঙনধরার ছিন্ন-করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,
স্তব্ধ বাণী নীরব স্বরে কথা কবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।

রক্তকরবী

নাট্যপরিচয়

এই নাটকটি সত্যমূলক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কী সে-সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাকনাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ-নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। যে-জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ-খোদাই চলছে, এইজন্যেই লোকে আদর ক'রে একে যক্ষপুরী নাম দিয়েছে। এই নাটকে এখানকার সুড়ঙ্গ-খোদাইকরদের সঙ্গে যথাকালে আমাদের পরিচয় হবে।

যক্ষপুরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করে না। এইটুকু জানি যে, এর একটি ডাকনাম আছে— মকররাজ। যথাসময়ে লোকমুখে এই নামকরণের কারণ বোঝা যাবে।

রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করে থাকেন। কেন তাঁর এমনতরো অদ্ভুত ব্যবহার তা নিয়ে নাটকের পাত্রগণ যেটুকু আলাপ আলোচনা করেছেন তার বেশি আমরা কিছু জানি নে।

এই রাজ্যের যাঁরা সর্দার তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুরীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা একসময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে

তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দারদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপুরীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচন্দ্র বলা যায়, তবে তার কলঙ্কবিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের 'পরে।

এছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নামগ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্নগ্রহণ করেন সর্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে-মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেটভরা বা ট্যাঁকভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে-বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিঁকতে দেয় না বুঝি।

নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জানলার বাহির-বারান্দায় এই কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে। জানলাটি যে কি-রকম তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিগর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে।

নাট্যঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলার বাহির-বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে, তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই।

রক্তকরবী

এই নাট্যব্যাপার যে-নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা

নন্দিনী ও কিশোর, সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক

কিশোর। নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!

নন্দিনী। আমাকে এত করে ডাকিস কেন, কিশোর। আমি কি শুনতে পাই নে।

কিশোর। শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার-যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তাহলে আনতে যাই।

নন্দিনী। যা যা, এখনি কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।

কিশোর। সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনী। ওরে কিশোর, জানতে পারলে-যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর। তুমি-যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজেপেতে একজায়গায় জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী। আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

কিশোর। অমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হয়ো না। ওই গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী। কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার-যে বুক ফেটে যায়।

কিশোর। সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী। কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সইব কী করে।

কিশোর। কিসের দুঃখ। একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে-মনে ভাবি।

নন্দিনী। তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্ তো, কিশোর।

কিশোর। এই সত্যটি কর্ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী। আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর। না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব। [প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

অধ্যাপক। নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী। কী অধ্যাপক।

অধ্যাপক। ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না-হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী। আমাকে তোমার কিসের দরকার।

অধ্যাপক। দরকারের কথা যদি বললে, ওই চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন— সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে-যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী। বারে বারে ওই একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক।

অধ্যাপক। সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।

নন্দিনী। অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক। আমরা-যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী। তার পরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে-যে মানুষ পাছে সে-কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী। এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক। বানিয়ে-তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ-বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরী। এসো আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

নন্দিনী। তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন।

অধ্যাপক। আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

নন্দিনী। না না, এখন না। আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব।

অধ্যাপক। সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

নন্দিনী। আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক। জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে? মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

নন্দিনী। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন।

অধ্যাপক। সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।

অধ্যাপক। একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কী।

নন্দিনী। ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তাহলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক। দেবতার হাসি সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনীনদীর মতো। ওই নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। অধ্যাপক, তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক। জানলে কী করে।

নন্দিনী। হবে হবে, দেখা হবে। খবর এসেছে।

অধ্যাপক। সর্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে।

নন্দিনী। যে-পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক। তার মানে, আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে।

নন্দিনী। যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেব উড়ো খবর কেমন করে মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক। রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্‌গে,

আমার তো আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়িগে, আর সাহস হচ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করছে না ?

নন্দিনী। ভয় করবে কেন।

অধ্যাপক। গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ সূর্যকে ভয় করে না। যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে ওই গর্তগুলো আমাদের সামনে আরো হাঁ করে উঠবে ; তবু বলছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি ক'রে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকোগে। (কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ওই যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে ?

নন্দিনী। কেন, কী করবে তুমি।

অধ্যাপক। কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর, তার একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী। আমি তো জানি নে কী মানে।

অধ্যাপক। হয়তো তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। এই রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়।

নন্দিনী। আমার মধ্যে ভয় ?

অধ্যাপক। সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানি নে, রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি ; সব বাদ দিয়ে এ-ফুল কেন বেছে নিলে। জান, মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয় ?

নন্দিনী। রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর ক'রে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।

অধ্যাপক। তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী। এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম। [অধ্যাপকের প্রস্থান

সুড়ঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। একবার মুখ ফেরাও তো দেখি।— তোমাকে বুঝতেই পারলুম না। তুমি কে।

নন্দিনী। আমাকে যা দেখছ তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝবার তোমার দরকার কী।

গোকুল। না বুঝলে ভালো ঠেকে না। এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে।

নন্দিনী। অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল। একটা কী মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলেছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ওই সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সিঁথিতে তোমার ওই কী ঝুলছে।

নন্দিনী। রক্তকরবীর মঞ্জরি।

গোকুল। ওর মানে কী।

নন্দিনী। ওর কোনো মানেই নেই।

গোকুল। আমি কিচ্ছু তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফন্দি করেছ। আজ দিন না যেতেই একটা-কিছু বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী।

নন্দিনী। আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন।

গোকুল। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বুঝিয়ে বলিগে, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান।' [প্রস্থান

নন্দিনী। (জালের দরজায় ঘা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছ ?

নেপথ্যে। নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী। আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে। না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী। কুঁদফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথ্যে। নিজে পরো।

নন্দিনী। আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্তকরবীর।

নেপথ্যে। আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী। সেই চূড়ার বুকেও ঝরনা ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে। আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নন্দিনী। দূর থেকে ওই গান শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। কিসের গান।

নন্দিনী। পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারি ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে— আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা-যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।

দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে?

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধুরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায় হায় হায়।

তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশী হল,—
ঘরেতে আজ কে রবে গো। খোলো দুয়ার খোলো।

নেপথ্যে। আমি মাঠে যাব? কোন্ কাজে লাগব।

নন্দিনী। মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে। সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝরনার মতো নাচতে পারে। যাও যাও, আর কথা কয়ো না, সময় নেই।

নন্দিনী। অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চূড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না ?

নেপথ্যে। কেন, ভয় কিসের।

নন্দিনী। পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশী হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য ব'লে ছিনিয়ে নিয়ে আস, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে ?

নেপথ্যে। অভিসম্পাত ?

নন্দিনী। হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে। শাপের কথা জানি নে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশী হও, নন্দিন ?

নন্দিনী। ভারি খুশি লাগে। তাই তো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশী হয়ে উঠুক।

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায়।

নেপথ্যে। নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ ক'রে রেখেছেন ? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নন্দিনী। ও কী বলছ তুমি।

নেপথ্যে। তোমার ওই রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন ক'রে পরতে পারি নে কেন। সামান্য পাপড়িক'টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে— কোমল ব'লেই কঠিন। আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো।

নন্দিনী। সে আরেক দিন বলব। আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে। না না, যেয়ো না, বলে যাও ; আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী। কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো— দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন-যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী। সে কথা থাক্‌, তোমার তো সময় নেই।

নেপথ্যে। আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে যাও।

নন্দিনী। সে-নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।

নেপথ্যে। বুঝব। বুঝতে চাই।

নন্দিনী। সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কিনা।

নন্দিনী। হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে। রঞ্জনের মতোই ?

নন্দিনী। ঘুরে-ফিরে একই কথা। এ-সব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে। কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী। জাদু বলছ কাকে।

নেপথ্যে। বুঝিয়ে বলব ? পৃথিবীর নিচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে— সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি ; সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।

নন্দিনী। তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বল কেন।

নেপথ্যে। আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না,— শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই ; রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি ক'রে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী। তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তার পরে কেন এমন ছটফট করছ বুঝতে পারি নে।

নেপথ্যে। বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি— তোমার মতো একটি

ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে-প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

নন্দিনী। তুমি-যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

নেপথ্যে। নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর, তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি —সে এর উলটো।

নন্দিনী। আমার মধ্যে কী দেখছ।

নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী। বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

নন্দিনী। তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন।

নেপথ্যে। নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে-দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।

নন্দিনী। তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝতে পরি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। আচ্ছা যেয়ো,— কিন্তু জানলার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী। না না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে। কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি, নন্দিন।

নন্দিনী। তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এ-সব বলছ।

নেপথ্যে। আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে-হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয় নি।

নন্দিনী। আমি তোমাকে বলছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আনবে রঞ্জন। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।

নেপথ্যে। তোমার রঞ্জন যে-ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কি জানি নে। নন্দিন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব।

নন্দিনী। আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে। না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

নন্দিনী। ছুটি কী ক'রে মধুতে ভরে, তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড়ো সুন্দর।

নেপথ্যে। সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়। আর নয়, যাও তুমি চলে যাও— নইলে বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। যাচ্ছি, কিন্তু বলে গেলুম, আজ আমার রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে,— কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না। [প্রস্থান

ফাগুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল। আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা। ওকি কথা। সকাল থেকেই মদ ?

ফাগুলাল। আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ ধ্বজাপুজা, সেই সঙ্গে অস্ত্রপুজা।

চন্দ্রা। বল-কি। ওরা কি ঠাকুরদেবতা মানে।

ফাগুলাল। দেখ নি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে?

চন্দ্রা। তা ছুটি পেয়েছ বলেই মদ? গাঁয়ে থাকতে পার্বণের ছুটিতে তো—

ফাগুলাল। বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা। কাজ ছেড়ে দাও-না, চলো-না ঘরে ফিরে।

ফাগুলাল। ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি?

চন্দ্রা। কেন বন্ধ।

ফাগুলাল। আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোনো মুনফা নেই।

চন্দ্রা। আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট ক'রে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুঁষ? ফালতো কিছুই নেই?

ফাগুলাল। আমাদের বিশুপাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার; যারা তাকে খায়, তার হাড়গোড় খুরলেজ বাদ দিয়েই খায়। এমন-কি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভ্যাঁ করে ডাকে, সেটাকেও বাহুল্য বলে আপত্তি করে। ওই-যে বিশুপাগল গান গাইতে গাইতে আসছে।

চন্দ্রা। কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেছে।

ফাগুলাল। তাই তো দেখছি।

চন্দ্রা। ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে, সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগুলাল। তাতে আর আশ্চর্যটা কী।

চন্দ্রা। না, আশ্চর্য কিছুই নেই। ওগো সাবধান থেকো, কোন্ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের করবে— সেদিন পাড়ার লোকের কী দশা হবে। মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ ঘটাবে।

ফাগুলাল। বিশুর বিপদ আজ ঘটে নি, এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, শুনে যাও, শুনে যাও। যাও কোথায়। গান শোনাবার লোক এখানেও এক-আধজন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

বিশুর প্রবেশ ও গান

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।
লাগল পালে নেশার হাওয়া,

পাগল পরান চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্ রে বেয়ে।

চন্দ্রা। তবে তো আশা নেই, আমরা-যে বড়ো কাছে।

বিশু। আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে

চন্দ্রা। তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশু। বাইরে থেকে কেমন করে জানবে। আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখ নি।

চন্দ্রা। তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী।

গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ

গোকুল। দেখো বিশু, তোমার ওই নন্দিনীকে ভালো ঠেকছে না।

বিশু। কেন, কী করেছে।

গোকুল। কিছুই করে না, তাই তো খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে কেন। ওর রকমসকম কিছুই বুঝি নে।

চন্দ্রা। বেয়াই, এ আমাদের দুঃখের জায়গা, ও-যে এখানে অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরিপনা করে বেড়ায়, এ আমরা দেখতে পারি নে।

গোকুল। আমরা বিশ্বাস করি সাদা মোটাগোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারী।

বিশু। যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড়ো সাজা তাই।

চন্দ্রা। আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মূর্খ, কিন্তু এখানকার সর্দার পর্যন্ত ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তা জান?

বিশু। দেখো দেখো চন্দ্রা, সর্দারের দুচক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে না লাগে, তাহলে আমাদের দেখেও তোমার চক্ষু লাল হয়ে উঠবে।— আচ্ছা, তুই কী বলিস ফাগুলাল।

ফাগুলাল। সত্যি কথা বলি দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।

গোকুল। বিশুভাই, ওই মেয়েকে দেখে তোমার মন ভুলেছে সেইজন্যে দেখতে পাচ্ছ না ও কী অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। বুঝতে বেশি দেরি হবে না, বলে রাখলুম।

ফাগুলাল। বিশুভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।

বিশু। স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চারদিকেই, এমন-কি, তোমাদের ওই চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরি করতে হয়, আবার মজুরি ভুলতেও হয়। মদ না হলে ভোলাবে কিসে।

চন্দ্রা। তাই বই কি। তোমাদের মতো জন্মমাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় করে দিয়েছেন।

বিশু। একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে,— বলছে, কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে,— বলছে, ছুটি ছুটি।

চন্দ্রা। এইগুলোকে মদ বলে নাকি।

বিশু। প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখো। এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁধকাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

গান

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে-যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয়-যে রঙিন করে।

চন্দ্রা। এসো-না বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু। সেই নীল চাঁদোয়ার নিচে, খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ংকর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি একচুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।

> তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
> তোর দিন মরেছে অকাজেরি কাজে,
> তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি,
> লুপ্তিনেশার চরম সাথী,
> তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি দিকভোলাবার ঘোরে।

চন্দ্রা। যাই বল বিশুবেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছ। আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয় নি।

বিশু। হয় নি তো কী। তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

চন্দ্রা। কথ্‌খনো না।

বিশু। আমি বলছি 'হাঁ'। ওই যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ ক'রে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা। আচ্ছা বেশ, তা চলো-না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশু। সর্দার কেবল-যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি-বা দেশে যাও টিঁকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।

ফাগুলাল। আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি তো একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ খোয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মতো মুর্খদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন।

চন্দ্রা। এতদিন আছি, এই কথাটির জবাব বেয়াই-এর কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেল না।

ফাগুলাল। অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশু। কী বলো দেখি।

ফাগুলাল। আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

বিশু। সবাই জানতিস যদি তো আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন।

ফাগুলাল। এও জানি এ কাজ তোমার দ্বারা হল না।

চন্দ্রা। এমন আরামের কাজেও টিঁকতে পারলে না, বেয়াই ?

বিশু। আরামের কাজ ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা ! বললুম, 'দেশে যাব, শরীর বড়ো খারাপ।' সর্দার বললেন, 'আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে। তবু চেষ্টা দেখো।' চেষ্টা দেখলুম। শেষে দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি। এখন তোতে-আমাতে তফাত এই যে, সর্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা করে আমাকে তার চেয়েও বেশী। ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল। দুঃখ কী, বিশুদাদা। আমরা তো তোমাকে মাথায় করে রেখেছি।

বিশু। প্রকাশ পেলেই মারা যাব। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই, সোনাব্যাঙ যতই মক্‌মক্ শব্দে কোলাব্যাঙের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়াসাপের।

চন্দ্রা। কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরবে ?

বিশু। পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। এক দিনের পর দু দিন, দু দিনের পর তিন দিন ; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা।

ফাগুলাল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ ফ।

বিশু। আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশপঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।

চন্দ্রা। বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জমল, আরো কি দরকার।

বিশু। দরকার বলে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায় ; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ওই সোনার তালগুলো-যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না ?

চন্দ্রা। না।

বিশু। মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্যের গণ্ডির মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে সর্বসাধারণের মাটির টান ওতে পৌঁছয় না, অসাধারণের আসমানে ও উড়ছে।

চন্দ্রা। নবান্নের সময় এল ব'লে, গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চলছে। পায়ে পড়ি, ঘরে চলো। একবার সর্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

বিশু। স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দারকে এখনো চেন নি বুঝি ?

চন্দ্রা। কেন, ওকে দেখে তো আমার বেশ—

বিশু। হাঁ, বেশ ঝক্‌ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না।

চন্দ্রা। ওই-যে সর্দার।

বিশু। তবেই হয়েছে। আমাদের কথা নিশ্চয়ই শুনেছে।

চন্দ্রা। কেন, এমন তো কিছু বলি নি যাতে—

বিশু। বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে-যে করে ওরা। কাজেই কোন্ কথার টিকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

সর্দারের প্রবেশ

চন্দ্রা। সর্দারদাদা !

সর্দার। কী নাতনী, খবর ভালো তো ?

চন্দ্রা। একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও।

সর্দার। কেন। যে-বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারী খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে। কী হে ৬৯ ঙ, তোমাকে এদের মধ্যে দেখলে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশু। সর্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুনে আমোদ লাগছে না। নাচাবার মতো পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে টেনে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।

সর্দার। নাতনী, একটা সুখবর আছে। এদের ভালোকথা শোনাবার জন্যে

কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। গোঁসাইজির কাছ থেকে রোজ সন্ধেবেলায় এরা—

ফাগুলাল। না না, সে হবে না, সর্দারজি। এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড়ো-জোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।

বিশু। চুপ চুপ, ফাগুলাল।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

সর্দার। এই-যে বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে-মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন— ভারি দরকার।

গোঁসাই। এই এদের কথা বলছ? আহা, এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নিচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিঁকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে-মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে-নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। একি কম কথা। আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তাহলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালকা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

চন্দ্রা। আহা, কী মধুর। বাবা, অনেকদিন এমন কথা শুনি নি। দাও দাও, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।

ফাগুলাল। এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারি নে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে। প্রণামী আদায় করতে চাও রাজী আজি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।

বিশু। ফাগুলাল খেপলে আর রক্ষে নেই, চুপ চুপ।

চন্দ্রা। ইহকাল পরকাল তুমি দু-ই খোয়াতে বসেছ? তোমার গতি হবে কী। এমন মতি তোমার আগে ছিল না, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপরে ওই নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

গোঁসাই। যাই বল সর্দার, কী সরলতা। পেটে-মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেছ?

সর্দার। বুঝেছি বই-কি। এও বুঝেছি উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের

ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রভুপাদ বরঞ্চ ওপাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা যেন একটু খিটখিট শুরু করছে।

গোঁসাই। কোন্ পাড়া বললে, সর্দারবাবা।

সর্দার। ওই-যে ট ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ ট হচ্ছে মোড়ল। মূর্ধন্য-ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ওই পাড়ার শেষ।

গোঁসাই। বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়্নড় করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল ব'লে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা। প্রভু, আশীর্বাদ করো, এই এদের যেন সুমতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোঁসাই। ভয় নেই মা-লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। [প্রস্থান

সর্দার। ওহে ৬৯ ঙ, তোমাদের ওপাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখছি!

বিশু। তা হতে পারে। গোঁসাইজি এদের কূর্ম-অবতার বললেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, একটু থামো। সর্দারদাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সর্দার। কিছুতেই না। শুনে রাখলুম, মনেও রাখব। [প্রস্থান

চন্দ্রা। আহা দেখলে? সর্দার লোকটি কী সরেস। সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশু। মকরের দাঁতের শুরুতে হাসি, অন্তিমে কামড়।

চন্দ্রা। কামড়টা এর মধ্যে কোথায়!

বিশু। জান না, ওরা ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না?

চন্দ্রা। কেন।

বিশু। সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

চন্দ্রা। ওমা! ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই। তারা কী বলে।

বিশু। তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁশ। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাদের চোখেই পড়ি নে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, তোমার ঘরে তো স্ত্রী ছিল, তার হল কী। অনেকদিন খবর পাই নি।

বিশু। যতদিন চরের উচ্চপদে ভরতি ছিলুম, সর্দারনীদের কোঠাবাড়িতে তার তাসখেলার ডাক পড়ত। যখন ফাগুলালদের দলে যোগ দিলুম, ওপাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিক্কারে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

চন্দ্রা। ছি, এমন পাপও করে।

বিশু। এ পাপের শাস্তিতে আর-জন্মে সে সর্দারনী হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, দেখো দেখো, ওই কারা ধুম করে চলেছে। সারে সারে ময়ূরপঙ্খি, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ। ঝলমল করছে। কী চমৎকার ঘোড়-সওয়ার। বর্শার ডগায় যেন এক-এক টুকরো সূর্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু। ওই তো সর্দারনীরা ধ্বজাপুজার ভোজে যাত্রা করেছে।

চন্দ্রা। আহা, কী সাজের ধুম। কী চেহারা। আচ্ছা বেয়াই, যদি কাজ ছেড়ে না দিতে, তুমিও ওদের দলে অমনি ধুম করে বেরতে? আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু। হাঁ, আমাদেরো ওই দশা ঘটত।

চন্দ্রা। এখন আর ফেরবার পথ নেই? একেবারে না?

বিশু। আছে, নর্দমার ভিতর দিয়ে।

নেপথ্যে। পাগলভাই!

বিশু। কী পাগলী।

ফাগুলাল। ওই তোমার নন্দিনীর ডাক পড়ল। আজকের মতো বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা। তোমার বিশুদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি, বেয়াই।

বিশু। ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা। বেয়াই অমন উলটিয়ে কথা কও কেন।

বিশু। তোরা বুঝবি নে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।

ফাগুলাল। বিশুদাদা, পস্ট করে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে।

বিশু। বলছি শোন্, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে-দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে-দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রা। এ-সব কথা বুঝি নে বেয়াই, একটা কথা বুঝি যে, যে-মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ সেই তোমাদের তত বেশী টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর

কম, তবু যা হ'ক তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে রাখলুম, ওই মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।

[চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী। পাগলভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?

বিশু। আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে, গান শুনতে পাব। এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী। আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু। আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী। তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশু। তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে।

নন্দিনী। কেন।

বিশু। যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন-সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী। পাগলভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝ-খানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু। সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

গান

তোমায় গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ,
ওগো ঘুমভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক,
ওগো দুখজাগানিয়া।

এল আঁধার ঘিরে,
পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,
ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী। বিশুপাগল, তুমি আমাকে বলছ ‘দুখজাগানিয়া’?

বিশু। তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না-যে।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক,
ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী। তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে-দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাই নি।

বিশু। কেন, রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী। না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কী মনে করে বাজিখেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না— তার পরে কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।

বিশু। **গান**

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী। সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনলে।

বিশু। একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে পড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে; আমি নিজেকে ভুলে ছিলুম।

নন্দিনী। তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে।

বিশু। তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখছিল সর্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে বললে, 'ওইখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড়ো তোমার সামর্থ্য।' আমি স্পর্ধা করে বললুম, 'যাব নিয়ে।' আনলুম তাকে সোনার চূড়ার নিচে। তখন আমার ঘোর ভাঙল।

নন্দিনী। আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।

বিশু। তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ, তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে। আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না?

নন্দিনী। এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি-যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।

বিশু। কী রকম দেখলে।

নন্দিনী। দেখলুম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশু। ঘরে ঢুকে কী দেখলে।

নন্দিনী। ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল; তাকে দাঁড়ের উপর

বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তার পরে, যেমন বাজপাখির পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে ভয় করে না ?' আমি বললুম, 'একটুও না।' তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল।

বিশু। তোমার কেমন লাগল।

নন্দিনী। ভালো লাগল। কি-রকম বলব ? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই, নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুশি লাগে। ওই একলা প্রাণকে সেই খুশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশু। তার পরে ও কী বললে।

নন্দিনী। একসময় ঝোঁকে উঠে ওর বর্শাফলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমাকে জানতে চাই।' আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললুম, 'জানবার কী আছে। আমি কি তোমার পুঁথি।' সে বললে, 'পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।' তার পরে কি-রকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, 'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কি-রকম ভালোবাস।' আমি বললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে— পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।' মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার ?' আমি বললুম, 'এখ্‌খনি।' ও যেন রেগে গর্জন করে বললে, 'কখ্‌খনো না।' আমি বললুম, 'হাঁ পারি।' 'তাতে তোমার লাভ কী।' বললুম, 'জানি নে।' তখন ছটফট করে বলে উঠল, 'যাও, আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নষ্ট করো না।' মানে বুঝতে পারলুম না।

বিশু। সব কথার পস্ট মানে ও জানতে চায়। যেটা ও বুঝতে পারে না, সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে দেয়, তাতেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী। পাগলভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার ?

বিশু। যেদিন ওর 'পরে বিধাতার দয়া হবে, সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী। না না, তুমি জান না, বেঁচে থাকবার জন্যে ও কি-রকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশু। ওর বাঁচা বলতে কী বোঝায়, সে তুমি আজই দেখতে পাবে; জানিনে সইতে পারবে কিনা।

নন্দিনী। ওই দেখো পাগলভাই, ওই ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনেছে।

বিশু। এখানে তো চারদিকেই সর্দারের ছায়া, এড়িয়ে চলবার জো কী।— সর্দারকে কেমন লাগে ?

নন্দিনী। ওর মতো মরা জিনিস দেখিনি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিকলিক করছে।

বিশু। প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।

নন্দিনী। চুপ করো, শুনতে পাবে।

বিশু। চুপ করাটাকেও যে শুনতে পায়, তাতে আপদ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি, তখন কথায়বার্তায় সর্দারকে সামলে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ বলে অশ্রদ্ধা করেই বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু পাগলী, তোর সামনে মনটা স্পর্ধিত হয়ে ওঠে, সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী। না না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না। ওই-যে সর্দার এসে পড়েছে।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। কিগো ৬৯ ঙ, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছবিচার নেই ?

বিশু। এমন কি, তোমার সঙ্গেও শুরু হয়েছিল, বাছবিচার করতে গিয়েই বেধে গেল।

সর্দার। কী নিয়ে আলাপ চলছে।

বিশু। তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।

সর্দার। বল-কি, এত সাহস ? কবুল করতেও ভয় নেই ?

বিশু। সর্দার, মনে-মনে তো সব জানই। খাঁচার পাখি শলাগুলোকে ঠোকরায়, সে তো আদর করে নয়। এ কথা কবুল করলেই কী, না-করলেই কী।

সর্দার। আদর করে না, সে জানা আছে ; কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না, সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান দিচ্ছে।

নন্দিনী। সর্দারজি, তুমি-যে বলেছিলে, আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই কথা রাখলে না ?

সর্দার। আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী। সে আমি জানতুম। তবু আশা দিলে যখন, জয় হ'ক তোমার সর্দার, এই নাও কুন্দফুলের মালা।

বিশু। ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে। রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন।

নন্দিনী। তার জন্যে মালা আছে।

সর্দার। আছে বই-কি, ওই বুঝি গলায় দুলছে? জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ-যে হাতের দান,—আর বরণমালা ওই রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো ভালো, হাতের দান হাতে-হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে ; হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে। [প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলার কাছে) শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। কী বলতে চাও বলো।

নন্দিনী। একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

নেপথ্যে। এই এসেছি।

নন্দিনী। ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে। বারবার কেন মিছে অনুরোধ করছ। এখনো সময় হয় নি। ও কে তোমার সঙ্গে। রঞ্জনের জুড়ি নাকি।

বিশু। না রাজা, আমি রঞ্জনের ওপিঠ, যে-পিঠে আলো পড়ে না— আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে। তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার। নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে।

নন্দিনী। ও আমার সাথী, ও আমাকে গান শেখায়। ওই তো শিখিয়েছে—

গান

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।

নেপথ্যে। ওই তোমার সাথী? ওকে এখনি যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তা-হলে কী হয়।

নন্দিনী। তোমার গলার সুর ও কি-রকম হয়ে উঠল। থামো তুমি। তোমার কেউ সঙ্গী নেই নাকি।

নেপথ্যে। আমার সঙ্গী? মধ্যাহ্নসূর্যের কেউ সঙ্গী আছে?

নন্দিনী। আচ্ছা, থাক্ ও-কথা। মা গো, তোমার হাতে ওটা কী।

নেপথ্যে। একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী। কী করবে ওকে নিয়ে।

নেপথ্যে। এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এইভাবে কী করে টিঁকে থাকতে হয় তারি রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিঁকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?

নন্দিনী। আমারো চারিদিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে। তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী। জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

নেপথ্যে। ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

নন্দিনী। তাতে কী হবে।

নেপথ্যে। আমি জানতে চাই।

নন্দিনী। তুমি যখন জানবার কথা বল, কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে। কেন।

নন্দিনী। মনে হয়, যে-জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট কোরো না।— না না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ওই যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাকে দাও।

নন্দিনী। এ নিয়ে কী হবে।

নেপথ্যে। ওই ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ওই যেন আমারি রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, আবার ভাবছি, নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ওই মঞ্জরি আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তা হলে—

নন্দিনী। তা-হলে কী হবে।

নেপথ্যে। তা-হলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।

নন্দিনী। একজন মানুষ রক্তকরবী ভালোবাসে, আমি তাকে মনে করে ওই ফুলে আমার কানের দুল করেছি।

নেপথ্যে। তা হলে বলে দিচ্ছি, ও আমারো শনিগ্রহ তারো শনিগ্রহ।

নন্দিনী। ছি ছি, ওকি কথা বলছ। আমি যাই।

নেপথ্যে। কোথায় যাবে।

নন্দিনী। তোমার দুর্গদুয়ারের কাছে বসে থাকব।

নেপথ্যে। কেন।

নন্দিনী। রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারি জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে যদি দ'লে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়।

নন্দিনী। আজ তোমার কী হয়েছে। আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন।

নেপথ্যে। মিছিমিছি ভয়? জান না, আমি ভয়ংকর?

নন্দিনী। হঠাৎ তোমার একি ভাব। লোকে তোমাকে ভয় করে, এইটেই দেখতে ভালোবাস? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে— সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারি খুশী হয়। তোমারো-যে সেই দশা। আমার কী মনে হয় সত্যি বলব? রাগ করবে না?

নেপথ্যে। কী বলো দেখি।

নন্দিনী। ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না?

নেপথ্যে। কী বলছ, নন্দিনী।

নন্দিনী। এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকত, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারি রাশকরা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে—

নন্দিনী। তার পরে কী।

নেপথ্যে। তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে— যাও যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি।

নন্দিনী। এই রইলুম দাঁড়িয়ে! কী করতে পার করো। অমন বিশ্রী করে গর্জন করছ কেন।

নেপথ্যে। আমি যে কী অদ্ভুত নিষ্ঠুর, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্তনাদ শোন নি?

নন্দিনী। শুনেছি, সে কিসের আর্তনাদ।

নেপথ্যে। সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী। কেন তুমি নিষ্ঠুর।

নেপথ্যে। আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাই নে তাকে দয়া করতে পারি নে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।

নন্দিনী। ওকি, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করছ কেন।

নেপথ্যে। আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি, পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।

নন্দিনী। আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাব না।

নেপথ্যে। শোনো শোনো, ফিরে এস তুমি। নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী। কী বলো।

নেপথ্যে। সামনে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো-চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর-কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুচ্ছগুচ্ছ কালোচুলের নিচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী। তুমি কি কখনো ঘুমোও না।

নেপথ্যে। ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী। তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই—

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে। থাক্‌ থাক্‌ থামো তুমি, আর গেয়ো না।

নন্দিনী। সেই সুরে সাগরকূলে
বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদনহাসি।

পাগলভাই, ওই-যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়ে কখন্‌ পালিয়েছে। গান শুনতে ও ভয় পায়।

বিশু। ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকলকরম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।— পাগলী, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখছি, মনের মধ্যে কোন্‌ ভাবনার অরুণোদয় হয়েছে আমাকে বলবি নে?

নন্দিনী। মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁচেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে।

বিশু। নিশ্চয় খবর এল কোন্‌ দিক থেকে।

নন্দিনী। তবে শোনো বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠপাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব, আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি উত্তরে-হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।

বিশু। তাই তো দেখছি, আর দেখছি কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ পরেছ।

নন্দিনী। দেখা হলে এই পালক আমি তার চুড়োয় পরিয়ে দেব।

বিশু। লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।

নন্দিনী। রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে।

বিশু। পাগলী, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে।

নন্দিনী। না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না।

বিশু। কী করব বলো।

নন্দিনী। গান করো।

বিশু। কী গান করব।

নন্দিনী। পথচাওয়ার গান।

বিশু। গান

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন্ তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে,
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে সেই আলোকে দেখা হবে, এক পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

নন্দিনী। পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারি নি।

বিশু। তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।— এখন কোথায় যাবি।

নন্দিনী। পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে আবার তোমার গান শুনব। [উভয়ের প্রস্থান

সর্দার ও মোড়লের প্রবেশ

সর্দার। না, এপাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।

মোড়ল। ওকে দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুড়ঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দার। তা কি হল।

মোড়ল। কিছুতেই পারা গেল না। সে বললে, 'হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।'

সর্দার। অভ্যেস এখনি শুরু করাতে দোষ কী।

মোড়ল। সে-চেষ্টা করা গেল। বড়ো মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয়ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি।'

সর্দার। ওকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন।

মোড়ল। দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উলটো হল, খোদাই-করদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে, বললে, 'আজ আমাদের খোদাইনৃত্য হবে।'

সর্দার। খোদাইনৃত্য ? তার মানে কী।

মোড়ল। রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বললে, 'মাদল পাই কোথায়', ও বললে, 'মাদল না থাকে, কোদাল আছে।' তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল ; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি। বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা।' রঞ্জন বললে, 'কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।'

সর্দার। লোকটা পাগল দেখছি।

মোড়ল। ঘোর পাগল। বললুম, 'কোদাল ধরো।' ও বলে, 'তার চেয়ে বেশী কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।'

সর্দার। তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবেরগড়ে এল কী করে।

মোড়ল। কী জানি, প্রভু। শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে— ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায়-কথায় সাজ বদল ক'রে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দার। ওকি। ওই-না রঞ্জন, রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে ? একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল। তাই তো। কখন্ গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে। ভেলকি জানে।

সর্দার। যাও, এই বেলা ধরোগে ওকে। এপাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।

মোড়ল। দেখতে দেখতে ওর দল ভারী হয়ে উঠছে। কখন্ আমাদের সুদ্ধ নাচিয়ে তুলবে।

ছোটো সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। কোথায় চলেছ।

ছোটো সর্দার। রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সর্দার। তুমি কেন। মেজো সর্দার কোথায়।

ছোটো সর্দার। ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, 'আমরা সর্দাররা কি-রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।'

সর্দার। শোনো, ওকে বাঁধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোটো সর্দার। ও তো রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সর্দার। ওকে বলোগে, রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।

ছোটো সর্দার। কিন্তু রাজা যদি—

সর্দার। কিছু ভাবতে হবে না। চলো, আমি নিজে যাচ্ছি। [সকলের প্রস্থান

অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ

পুরাণবাগীশ। ভিতরে একি প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো তো। ভয়ংকর শব্দ-যে!

অধ্যাপক। রাজা বোধহয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরী একটা-কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ। মনে হচ্ছে, বড়ো বড়ো থাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। আমাদের ওই পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনীনদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তাঁর বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাত হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্‌খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।

পুরাণবাগীশ। বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আনলে, আর কী করতেই বা আনলে।

অধ্যাপক। জগতে যা-কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে, এখন থেকে থেকে

রেগে উঠে বলছে, 'তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আরেকটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায়।' ভাবলুম, এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক— আমার থলে ঝাড়া হয়ে গেছে, এখন পুরাবৃত্তের গাঁঠকাটা চলুক। ওই দেখতে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে ?

পুরাণবাগীশ। একটি মেয়ে ধানীরঙের-কাপড়-পরা।

অধ্যাপক। পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চারদিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা। এক-একদিন ওর চলে-যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনোপাখির মতো হুশ ক'রে উড়ে পালায়।

পুরাণবাগীশ। বল-কি হে, তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে নাকি।

অধ্যাপক। জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশী হলেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক সামলানো যায় না।

পুরাণবাগীশ। এখন বলো তো, তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়।

অধ্যাপক। দেখার উপায় নেই, ওই জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পুরাণবাগীশ। বল-কি হে। এই জালের আড়াল থেকে ?

অধ্যাপক। তা নয় তো কী। ঘোমটার আড়াল থেকে যেরকম রসালাপ হতে পারে সে ধরনের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধহয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ। বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই তো পণ্ডিতের অভিপ্রায়।

অধ্যাপক। কিন্তু বিধাতার নয়। তিনি আসল জিনিস সৃষ্টি করেছেন বাজে জিনিসকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন ফলের শাঁসকে।

পুরাণবাগীশ। আজকাল দেখছি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানীরঙের দিকে একটানা ছুটে চলেছে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য কর কী করে।

অধ্যাপক। সত্যি কথা বলব ? আমি ওকে ভালোবাসি।

পুরাণবাগীশ। বল-কি হে।

অধ্যাপক। তুমি জান না, ও এত বড়ো যে, ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট করতে পারে না।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেছ বুঝি! ওঁর বিদ্যের বিবরণ শুনেই আমাদের রাজা খেপে উঠেছে।

অধ্যাপক। কি-রকম।

সর্দার। রাজা বলে, পুরাণ ব'লে কিছু নেই। বর্তমানকালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।

পুরাণবাগীশ। পুরাণ যদি নেই তা-হলে কিছু আছে কী করে। পিছন যদি না থাকে তো সামনেটা কি থাকতে পারে।

সর্দার। রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে, মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধরতে পারছেন না, রেগে উঠছেন আমার বস্তুতত্ত্বর উপর।

নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ

নন্দিনী। সর্দার, সর্দার, ওকি! ও কারা!

সর্দার। কিগো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো-আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন হয়তো ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী। চেয়ে দেখো, ও কী ভয়ানক দৃশ্য। প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি। ওই কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ওই-যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কিদরজা দিয়ে?

সর্দার। ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।

নন্দিনী। মানে কী।

সর্দার। মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক্।

নন্দিনী। কিন্তু এ-সব কী চেহারা। ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে।

সর্দার। হয়তো নেই।

নন্দিনী। কোনো দিন ছিল ?

সর্দার। হয়তো ছিল।

নন্দিনী। এখন গেল কোথায়।

সর্দার। বস্তুবাগীশ, পার তো বুঝিয়ে দাও, আমি চললুম। [প্রস্থান

নন্দিনী। ওকি, ওই সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি। ওই তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। মরে যাই, ওদের এমন দশা কে করলে। ওই-যে দেখি শক্‌লু, তলোয়ারখেলায় সব্বার আগে পেত মালা। অনূ—প, শক্‌লু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানী-পাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ওকি, কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল ; যে-ঘাটে জল আনতে যেতুম, তারি কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে বসে থাকত, ভাণ করত যেন তীর বানাবার জন্য শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টমি ক'রে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল। অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মরচেটাই বাকি! এমন কেন হল।

অধ্যাপক। নন্দিনী, যে-দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লকলক করছে।

নন্দিনী। তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

অধ্যাপক। রাজাকে তো দেখেছ ? তার মূর্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে ?

নন্দিনী। হয়েছে বই-কি। সে-যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক। সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভুতটি হল তার খরচ। ওই ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী। ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

অধ্যাপক। তত্ত্বর উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী। এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয়, তা-হলে চাই নে আমি হওয়া— আমি ওই ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক। রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা ব'লে কোনো বালাই নেই। দেখো-না, পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন্ সরে পড়েছেন, ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচবেন। একটু এগোলেই বুঝবেন বেড়াজাল এখান থেকে শুরু করে বহু যোজন দূর পর্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা। নন্দিনী, রাগ করছ তুমি। তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

নন্দিনী। (জানলা ঠেলে) শোনো, শোনো!

অধ্যাপক। কাকে ডাকছ তুমি।

নন্দিনী। জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক। ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে, ডাক শুনতে পাবে না।

নন্দিনী। বিশুপাগল, পাগলভাই!

অধ্যাপক। তাকে ডাকছ কেন।

নন্দিনী। এখনো-যে সে ফিরল না। আমার ভয় করছে।

অধ্যাপক। একটু আগেই তোমার সঙ্গেই তো দেখেছি।

নন্দিনী। সর্দার বললে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েছে। সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না।— ও কিসের আর্তনাদ।

অধ্যাপক। এ বোধ হচ্ছে সেই পালোয়ানের।

নন্দিনী। কে সে।

অধ্যাপক। সেই-যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু, যার ভাই ভজন স্পর্ধা করে রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল, তার পরে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতো কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এল তাল ঠুকে। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম, 'এ-রাজ্যে সুড়ঙ্গ খুদতে চাও তো এসো, মরতে-মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। আর যদি পৌরুষ দেখাতে চাও তো একমুহূর্ত সইবে না। এ বড়ো কঠিন জায়গা।'

নন্দিনী। দিনরাত এই মানুষধরা ফাঁদের খবরদারি করে এরা একটুও কি ভালো থাকে।

অধ্যাপক। ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাকতেই হবে।

নন্দিনী। থাকতেই হবে? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী।

অধ্যাপক। আবার সেই রাগ? সেই রক্তকরবীর ঝংকার? খুব মধুর, তবুও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্যে মরতে হবে, এ কথা বলে সুখ পাও তো বলো। কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে, এ কথা যারা বলে তারাই থাকে। তোমরা বল এতে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

পালোয়ানের প্রবেশ

নন্দিনী। আহা, ওই দেখো, কি-রকম টলতে টলতে আসছে। পালোয়ান, এইখানে শুয়ে পড়ো। অধ্যাপক, দেখো-না কোথায় চোট লেগেছে।

অধ্যাপক। বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না।

পালোয়ান। দয়াময় ভগবান, জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও।

অধ্যাপক। কেন হে।

পালোয়ান। কেবল ওই সর্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক। সর্দার তোমার কী করেছে।

পালোয়ান। সমস্তই সেই তো ঘটিয়েছে। আমি তো লড়তে চাই নি। আজ বলে বেড়াচ্ছে, আমারি দোষ।

অধ্যাপক। কেন। ওর কী স্বার্থ।

পালোয়ান। সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখদুটো উপড়ে ফেলতে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।

নন্দিনী। তোমার কি-রকম বোধ হচ্ছে, পালোয়ান।

পালোয়ান। বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে, শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়।— যদি কোনো উপায়ে একবার— হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার— তোমার দয়া হলে কী না হতে পারে। সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি।

নন্দিনী। অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দুজনে মিলে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক। সাহস করি নে, নন্দিনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী। মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না?

অধ্যাপক। যে-অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা পাপ হতে পারে কিন্তু অপরাধ নয়। নন্দিনী, এ-সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এসো। শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নিচে হরণশোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি।— ওই-যে সর্দার। আমি তবে সরি। তোমার সঙ্গে কথা কই এ ও সইতে পারে না।

নন্দিনী। আমার উপরে কেন এত রাগ।

অধ্যাপক। আন্দাজে বলতে পারি। তুমি ভিতরে-ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ; যতই সুর মিলছে না, বেসুর ততই কড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে।

[প্রস্থান

সর্দারের প্রবেশ

নন্দিনী। সর্দার!

সর্দার। নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোঁসাইজির দুই চক্ষু— এই-যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম! প্রভু, সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল!

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। আহা, শুভ্র প্রাণের দান, ভগবানের শুভ্র কুন্দফুল। বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শুভ্রতা ম্লান হল না। এতেই তো পুণ্যের শক্তি আর পাপীর ত্রাণের আশা দেখতে পাই।

নন্দিনী। গোঁসাইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি।

গোঁসাই। সবদিক ভেবে যে-পরিমাণ বাঁচা দরকার, আমাদের সর্দার নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু বৎসে, এ-সব আলোচনা তোমাদের মুখে শ্রুতিকটু লাগে, আমরা পছন্দ করি নে।

নন্দিনী। এ-রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি পরিমাণবিচার আছে?

গোঁসাই। আছে বই-কি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে তার ভাগবাঁটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের 'পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা

বেশী পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া।

নন্দিনী। গোঁসাইজি, ভগবান তোমার উপরে এদের কোন্ উপকারের বিষম ভার চাপিয়েছেন।

গোঁসাই। যে-প্রাণ সীমাবদ্ধ নয়, তার অংশভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়ার দরকারই হয় না, আমরা গোঁসাইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তবেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী। তবে কি এ-লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এই-রকম আধমরা হয়েই পড়ে থাকবে।

গোঁসাই। পড়েই বা থাকবে কেন। কী বল সর্দার।

সর্দার। সে তো ঠিক। পড়ে থাকতে দেব কেন। এখন থেকে নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব। ওরে গজ্জু।

পালোয়ান। কী প্রভু।

গোঁসাই। হরি হরি, এরি মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে, আমাদের নামকীর্তনের দলে টেনে নিতে পারব।

সর্দার। হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েছে, চলে যা সেখানে।

নন্দিনী। ওকি কথা। চলতে পারবে কেন।

সর্দার। দেখো নন্দিনী, মানুষ-চালানোই আমাদের ব্যবসা। আমরা জানি, মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু।

পালোয়ান। যে আদেশ।

নন্দিনী। পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের ঘরে। সেখানে তো তোমাকে দেখবার কেউ নেই।

পালোয়ান। না না, থাক্, সর্দার রাগ করবে।

নন্দিনী। আমি সর্দারের রাগকে ভয় করি নে।

পালোয়ান। আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না।

[প্রস্থান

নন্দিনী। সর্দার, যেয়ো না, বলে যাও আমার বিশুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেছ।

সর্দার। আমি নিয়ে যাবার কে। বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে কর, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।

নন্দিনী। এ কোন্ সর্বনেশে দেশ গো। তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া, তারা মেঘ? গোঁসাই, তুমি নিশ্চয় জান, কোথায় আমার বিশুপাগল আছে।

গোঁসাই। আমি নিশ্চয় জানি, সে যেখানে থাক্ সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী। কার ভালোর জন্যে।

গোঁসাই। সে তুমি বুঝবে না— আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা। ওই গেল ছিঁড়ে। ওহে সর্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দার। কে জানে ও কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

গোঁসাই। ওহে, এইবার আমার নামাবলিটা-সুদ্ধ ছিঁড়বে। বিপদ করলে। আমি চললুম। [প্রস্থান

নন্দিনী। সর্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গিয়েছ বিশুপাগলকে।

সর্দার। তাকে বিচারশালায় ডেকেছে— এর বেশি বলবার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী। আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।

সর্দার। তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশুর বিপদ ঘটিয়েছ তুমিই।

নন্দিনী। আমি!

সর্দার। হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নিচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টানবে, তারপরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে-আমাতে। বেশি দেরি নেই।

নন্দিনী। তাই হ'ক, কিন্তু একটা কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে কি।

সর্দার। কিছুতে না।

নন্দিনী। কিছুতেই না! দেখব তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই, হবেই, আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম। [সর্দারের প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) শোনো শোনো, রাজা। কোথায় তোমার বিচার-শালা। তোমার জালের এই আড়াল ভাঙব আমি। ও কে ও! কিশোর যে! বল্ তো আমায়, জানিস্ কি কোথায় আমাদের বিশু।

কিশোরের প্রবেশ

কিশোর। হাঁ নন্দিনী, এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে রাখো। জানি নে, প্রহরীদের কর্তা আমার মুখ দেখে কেন দয়া করলে। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশুকে নিয়ে যেতে রাজী হল।

নন্দিনী। প্রহরীদের কর্তা? তবে কি—

কিশোর। হাঁ, ওই-যে আসছে।

নন্দিনী। ওকি! তোমার হাতে হাতকড়ি! পাগলভাই, তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেছে।

বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ

বিশু। ভয় নেই, কিছু ভয় করিস নে। পাগলী, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

নন্দিনী। কী বলছ বুঝতে পারছি নে।

বিশু। যখন ভয়ে-ভয়ে পদে-পদে বিপদ সামলে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী। কি দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু। এতদিন পরে আজ সত্যকথা বলেছিলুম।

নন্দিনী। তাতে দোষ কী হয়েছে।

বিশু। কিচ্ছু না।

নন্দিনী। তবে এমন করে বাঁধলে কেন।

বিশু। এতেই বা ক্ষতি কী হল। সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি— এ-বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

নন্দিনী। ওরা তোমাকে পশুর মতো রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে, ওদের নিজেরি লজ্জা করছে না? ছি ছি, ওরাও তো মানুষ।

বিশু। ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েছে-যে— মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।

নন্দিনী। আহা পাগলভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে। এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে।

বিশু। চাবুক মেরেছে, যে-চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে-রশিতে এই

চাবুক তৈরী সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরী। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে-কথা ওরা ভুলে যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।

নন্দিনী। আমাকেও এমনি করে তোমার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাক, ভাই আমার। তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই তবে আজ থেকে মুখে অন্ন রুচবে না।

কিশোর। বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। সেই অনুমতি করো তুমি।

বিশু। এ-যে তোর পাগলের মতো কথা।

কিশোর। শাস্তিতে তো আমাকে বাজবে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুশী হয়ে সইতে পারব।

নন্দিনী। আহা, না কিশোর, ও-কথা বলিস নে।

কিশোর। নন্দিনী, আমি আজ কামাই করেছি, ওরা তা টের পেয়েছে। আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েছে। তারা যে অপমান করবে, এই শাস্তি তার থেকে আমাকে বাঁচাবে।

বিশু। না কিশোর, এখনো ধরা পড়লে চলবে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।

কিশোর। নন্দিনী, তা-হলে বিদায় নিলুম। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তোমার কোন্ কথা তাকে জানাব।

নন্দিনী। কিছু না। তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে। [কিশোরের প্রস্থান

বিশু। এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হ'ক।

নন্দিনী। মিলনে আমার আর সুখ হবে না। এ-কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে, তোমাকে শূন্যহাতে বিদায় দিয়েছি। আর ওই-যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কী বা পেলে।

বিশু। মনে যে-আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কী চাই। মনে আছে, সেই নীলকণ্ঠের পালক রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দিতে হবে?

নন্দিনী। এই-যে রয়েছে আমার বুকের আঁচলে।

বিশু। পাগলী, শুনতে পাচ্ছিস ওই ফসলকাটার গান ?

নন্দিনী। শুনতে পাচ্ছি, প্রাণ কেঁদে উঠছে।

বিশু। মাঠের লীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল। চলো প্রহরী, আর দেরি নয়—

গান

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধো আঁটি,
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হ'ক তা মাটি।

[সকলের প্রস্থান

চিকিৎসক ও সর্দারের প্রবেশ

চিকিৎসক। দেখলুম। রাজা নিজের 'পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ-রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দার। এর প্রতিকার কী।

চিকিৎসক। বড়ো-রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।

সর্দার। অর্থাৎ আর-কারো ক্ষতি করতে না দিলে, উনি নিজের ক্ষতি করবেন।

চিকিৎসক। ওরা বড়োলোক, বড়ো-শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়, তখন আরেকটা খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে। কিন্তু প্রস্তুত থাকো সর্দার, আর বড়ো দেরি নেই।

সর্দার। লক্ষণ দেখে আমি আগেই সব প্রস্তুত রেখেছি। কিন্তু হায় হায়, কী দুঃখ। আমাদের স্বর্ণপুরী যে-রকম ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছিল, এমন কোনোদিন হয় নি, ঠিক এই সময়টাতেই— আচ্ছা যাও, ভেবে দেখছি। [চিকিৎসকের প্রস্থান

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। সর্দারমহারাজ, ডেকেছেন ? আমি এ পাড়ার মোড়ল।

সর্দার। তুমিই তো তিনশো একুশ ?

মোড়ল। প্রভুর কী স্মরণশক্তি। আমার মতো অভাজনকেও ভোলেন না।

সর্দার। দেশ থেকে আমার স্ত্রী আসছে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

মোড়ল। পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টানবার মতো বলদের অভাব। তা হ'ক, খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

সর্দার। কোথায় যেতে হবে জান তো? বাগানবাড়িতে, যেখানে সর্দারদের ভোজ।

মোড়ল। যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে দিয়ে যাই। একটু কান দেবেন। ওই-যে ৬৯ ঙ, লোকে যাকে বিশুপাগল বলে, ওর পাগলামিটাকে শোধন করবার সময় এসেছে।

সর্দার। কেন। তোমাদের 'পরে উৎপাত করে নাকি।

মোড়ল। মুখের কথায় নয়, ভাবে-ভঙ্গীতে।

সর্দার। আর ভাবনা নেই। বুঝেছ?

মোড়ল। তাই নাকি। তা-হলে ভালো। আরেকটা কথা, ওই-যে ৪৭ ফ, ৬৯ ঙর সঙ্গে ওর কিছু বেশী মেশামেশি।

সর্দার। সেটা লক্ষ্য করেছি।

মোড়ল। প্রভুর লক্ষ্য ঠিকই আছে। তবু নানান দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় নাকি— দুই-একটা ফসকিয়ে যেতেও পারে। এই দেখুন-না, আমাদের ৯৫— গ্রামসম্পর্কে আমার পিসশ্বশুর— পাঁজরের হাড়ক'খানা দিয়ে সর্দারমহারাজের ঝাড়ুবর্দারের খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত, প্রভুভক্তি দেখে স্বয়ং তার সহধর্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজ পর্যন্ত—

সর্দার। তার নাম বড়ো-খাতায় উঠেছে।

মোড়ল। যাক, সার্থক হল এতকালের সেবা। খবরটা তাকে সাবধানে শোনাতে হবে, তার আবার মৃগীরোগ আছে, কী জানি হঠাৎ –

সর্দার। আচ্ছা, সে হবে, তুমি যাও শিগ্‌গির।

মোড়ল। আর একজন মানুষের কথা বলবার আছে— সে যদিচ আমার আপন শালা, তার মা মরে গেলে আমার স্ত্রী তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছে, তবুও যখন মনিবের নিমক—

সর্দার। তার কথা কাল হবে, তুমি দৌড়ে চলে যাও।

মোড়ল। মেজো সর্দারবাহাদুর ওই আসছেন। ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বলবেন। আমার উপর ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস প্রভুদের মহলে ৬৯ ঙর যখন যাওয়া-আসা ছিল, তখনি সে আমার নামে—

সর্দার। না না, কোনোদিন তোমার নাম করতেও তাকে শুনি নি।

মোড়ল। সেই তো ওর চালাকি। যে-মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই তো তাকে মারতে হয়। কৌশলে ইশারায় লাগালাগি করা তো ভালো নয়। ওই রোগটি আছে আমাদের তেত্রিশের। তার তো দেখি আর-কোনো কাজ নেই, যখন-তখন প্রভুদের খাসমহলে যাওয়া-আসা চলছেই। ভয় হয়, কার নামে কী বানিয়ে বসে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দার। আজ আর সময় নেই, শিগ্‌গির যাও।

মোড়ল। তবে প্রণাম হই। (ফিরে এসে) একটি কথা, ওপাড়ার অষ্ট-আশি সেদিন মাত্র তিরিশ তনখায় কাজে ঢুকল, দুটো বছর না যেতেই উপরিপাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজার-দেড়হাজার তো হবেই। প্রভুদের সাদা মন, দেবতার মতো ফাঁকা স্তবেই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা দেখেই—

সর্দার। আচ্ছা আচ্ছা, সে-কথা কাল হবে।

মোড়ল। আমার তো দয়াধর্ম আছে, আমি তার রুটি মারার কথা বলি নে; কিন্তু তাকে খাতাঞ্চিখানায় রাখাটা ভালো হচ্ছে কিনা ভেবে দেখবেন। আমাদের বিষ্ণুদত্ত তার নাড়ীনক্ষত্র জানে। তাকে ডাকিয়ে নিয়ে—

সর্দার। আজই ডাকাব, তুমি যাও।

মোড়ল। প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেছে। প্রণাম করতে এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে। বড়োই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধূমাতা নিজের হাতে তৈরী ছাঁচিকুমড়োর—

সর্দার। আচ্ছা, পরশু আসতে বোলো, দেখা মিলবে। [মোড়লের প্রস্থান

মেজো সর্দারের প্রবেশ

মেজো সর্দার। নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।

সর্দার। আর, রঞ্জনের সেটা কত দূর—

মেজো সর্দার। এ-সব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোটো সর্দার নিজে পছন্দ করে ভার নিয়েছে। এতক্ষণে তার—

সর্দার। রাজা কি—

মেজো সর্দার। রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। দশজনের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে —কিন্তু রাজাকে এরকম ঠকানো আমি তো কর্তব্য মনে করি নে।

সর্দার। রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ওই মেয়েটাকে অবিলম্বে—

মেজো সর্দার। না না, এ-সব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে-মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনোরকম নোংরামিকেই ভয় করে না।

সর্দার। কেনারাম গোঁসাই কি জানে রঞ্জনের কথা।

মেজো সর্দার। আন্দাজে সবই জানে, পস্ট জানতে চায় না।

সর্দার। কেন।

মেজো সর্দার। পাছে 'জানি নে' এই কথা বলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সর্দার। হলই বা।

মেজো সর্দার। বুঝছ না? আমাদের তো শুধু একটা চেহারা, সর্দারের চেহারা। কিন্তু ওর-যে এক পিঠে গোঁসাই, আরেক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। তাই সর্দারিধর্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয়, তা-হলে নামজপের বেলায় খুব বেশী বাধে না।

সর্দার। নামজপটা না-হয় ছেড়েই দিত।

মেজো সর্দার। কিন্তু এদিকে যে ওর মনটা ধর্মভীরু, রক্তটা যাই হ'ক। তাই স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দারি করতে পারলে ও সুস্থ থাকে। ও আছে বলেই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা পড়েছে, নইলে চেহারাটা ভালো দেখাত না।

সর্দার। মেজো সর্দার, তোমারো দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দারির রক্তের মিল হয় নি।

মেজো সর্দার। রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না, এখনো সে-আশা আছে। কিন্তু আজো তোমার ওই তিনশো-একুশকে সইতে পারি নে। যাকে দূর থেকে চিমটে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে, তাকে যখন সভার মাঝখানে সুহৃদ ব'লে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, তখন কোনো তীর্থজলে স্নান করে নিজেকে শুচি বোধ হয় না।— ওই-যে নন্দিনী আসছে।

সর্দার। চলে এসো, মেজো সর্দার।

মেজো সর্দার। কেন। ভয় কিসের।

সর্দার। তোমাকে বিশ্বাস করি নে; আমি জানি, তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।

মেজো সর্দার। কিন্তু তুমি জানো না যে, তোমার চোখেও কর্তব্যের রঙের

সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু যেন মিশেছে, তাতেই রক্তিমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।

সর্দার। তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। [উভয়ের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী। দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ওই-কি আমাদের মিলনের রঙ। আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে। (জানলায় ঘা দিয়ে) শোনো, শোনো, শোনো। দিনরাত এখানে পড়ে থাকব, যতক্ষণ না শোনো।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। ঠেলছ কাকে।

নন্দিনী। তোমাদের যে-অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোঁসাই। হরি হরি, ভগবান যখন ছোটোকে মারেন তখন তার ছোটোমুখে বড়োকথা দিয়েই মারেন। দেখো নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী। তাতে আমার মঙ্গল হবে না।

গোঁসাই। এসো আমার ঠাকুরঘরে, তোমাকে নাম শোনাইগে।

নন্দিনী। শুধু নাম নিয়ে করব কী।

গোঁসাই। মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী। শান্তি যদি পাই তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে। আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাকব।

গোঁসাই। দেবতার চেয়ে মানুষের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশী ?

নন্দিনী। তোমাদের ওই ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনো দিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে। যাও যাও, যাও। মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার।

[গোঁসাইয়ের প্রস্থান

ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল। বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায়। সত্য করে বলো।

নন্দিনী। তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

চন্দ্রা। রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস। তুই ওদের চর।

নন্দিনী। কোন্ মুখে এমন কথা বলতে পারলে।

চন্দ্রা। নইলে এখানে তোর কী কাজ। কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস।

ফাগুলাল। এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস করে এসেছি। মনে-মনে তোমাকে— সে-কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমনতরো ঠেকছে যে।

নন্দিনী। হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েছে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাকত, সে-কথা নিজেই বললে।

চন্দ্রা। তবে কেন আনলি ওকে ভুলিয়ে! সর্বনাশী!

নন্দিনী। ও-যে বললে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা। ভালো মুক্তি দিয়েছিস ওকে।

নন্দিনী। আমি তো ওর সব কথা বুঝতে পারি নে, চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বললে, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি। ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে-মানুষ, আমি তাকে বাঁচাব কী করে।

চন্দ্রা। ও-সব কথা বুঝি নে। ওকে ফিরিয়ে যদি না আনতে পারিস মরবি, মরবি। তোর ওই সুন্দরপানা মুখখানা দেখে আমি ভুলি নে।

ফাগুলাল। চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কী হবে। কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনি। বন্দীশালা চুরমার করে ভাঙব।

নন্দিনী। আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

ফাগুলাল। কী করতে যাবে।

নন্দিনী। ভাঙতে যাব।

চন্দ্রা। ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছ মায়াবিনী! আর কাজ নেই।

গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। সবার আগে ওই ডাইনীকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

চন্দ্রা। মারবে? তাতে ওর শাস্তি হবে না। যে-রূপ নিয়ে ও সর্বনাশ করে, সেই রূপটা দাও ঘুচিয়ে। খুরপো দিয়ে যেমন করে ঘাস নিড়োয়, তেমনি করে ওর রূপ দাও নিড়িয়ে।

গোকুল। তা পারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

ফাগুলাল। খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি তা-হলে—

নন্দিনী। ফাগুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে তাই আমাকে মারতে চায়। আমি ওর মারকে ভয় করিনে। কী করতে পারে করুক কাপুরুষ।

গোকুল। ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয় নি! সর্দারকেই তুমি শত্রু বলে জান! তা হ'ক যে-শত্রু সহজ শত্রু তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমাদের ওই মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী। সর্দারকে তোমার শ্রদ্ধা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ধা যে-রকম। যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে?

ফাগুলাল। গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চলো আমার সঙ্গে।

[ফাগুলাল চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান

একদল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা।

প্রথম। ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।

নন্দিনী। রঞ্জনকে দেখেছ?

দ্বিতীয়। তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখি নি। ওই ওদের জিজ্ঞাসা করো, হয়তো বলতে পারবে।

নন্দিনী। ওরা কারা।

তৃতীয়। ওরা সর্দারের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্ছে। [এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো লালটুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছ?

প্রথম। সেদিন রাতে শম্ভুমোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

নন্দিনী। এখন কোথায় আছে সে?

দ্বিতীয়। ওই-যে সর্দারনীদের ভোজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শুনতে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

[এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জান।

প্রথম। চুপ চুপ।

নন্দিনী। তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বলতেই হবে।

দ্বিতীয়। আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিঁকে আছি। ওই-যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আসছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো।

[এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, একটু থামো, বলে যাও রঞ্জন কোথায়।

প্রথম। শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেছে। ধ্বজাপুজায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমরা শুরুটা জানি, শেষটা জানি নে। [প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে। আবার এসেছ অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি।

নন্দিনী। অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুনতেই হবে আমার কথা!

নেপথ্যে। কী বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী। বাইরে থেকে কথার স্বর তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে। আজ ধ্বজাপুজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পুজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও! এখনি যাও।

নন্দিনী। আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনি তাকে এনে দেবে। পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। দেবতার সময়ের অভাব নেই, পুজোর জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।

নেপথ্যে। আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপুজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী। বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যে। নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী। আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে। ঘৃণা কর? স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী। পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। (দ্বার উদ্ঘাটন) ওকি! ওই কে প'ড়ে। রঞ্জনের মতো দেখছি যেন!

রাজা। কী বললে। রঞ্জন? কখনোই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী। হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন।

রাজা। ও কেন বললে না ওর নাম। কেন এমন স্পর্ধা করে এল।

নন্দিনী। জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন।

রাজা। ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

নন্দিনী। রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জান, ওকে জাগিয়ে দাও।

রাজা। আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী। তবে আমাকে ওই ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছি নে। কেন এমন সর্বনাশ করলে।

রাজা। আমি যৌবনকে মেরেছি— এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

নন্দিনী। ও কি আমার নাম বলে নি।

রাজা। এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারি নি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

নন্দিনী। (রঞ্জনের প্রতি) বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।— আহা, এই-যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরি। তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিল। সে কোথায় গেল। রাজা, কোথায় সেই বালক।

রাজা। কোন্ বালক।

নন্দিনী। যে-বালক এই ফুলের মঞ্জরি রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।

রাজা। সে-যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নন্দিনী। তার পরে? কী হল তার। বলো কী হল। বলতেই হবে, চুপ করে থেকো না।

রাজা। বুদ্‌বুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

নন্দিনী। রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা। কিসের সময়।

নন্দিনী। আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে-যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী। তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা। তা-হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নন্দিন।

নন্দিনী। কোথায় যাব?

রাজা। আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারি হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক তাতেই আমার মুক্তি।

দলের লোক। মহারাজ, এ কী কাণ্ড। এ কী উন্মত্ততা। ধ্বজা ভাঙলেন! আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের এক দিক পৃথিবীকে অন্য দিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে, সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড! পূজার দিনে কী মহাপাতক। চল্‌, সর্দারদের খবর দিইগে। [প্রস্থান

রাজা। এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী। যাব আমি।

ফাগুলালের প্রবেশ

ফাগুলাল। বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে। এই বুঝি রাজা? ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চলছে! বিশ্বাসঘাতিনী!

রাজা। কী হয়েছে তোমাদের। কী করতে বেরিয়েছ।

ফাগুলাল। বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা। ফিরবে কেন। ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ওই তার প্রথম চিহ্ন। আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

ফাগুলাল। নন্দিন, ভালো বুঝতে পারছি নে। আমরা সরল মানুষ, দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি-যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী। ফাগুভাই, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠকবার তো কিছুই বাকি রাখলে না।

ফাগুলাল। নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো।

নন্দিনী। আমি তো সেইজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ওই দেখো, এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে।

ফাগুলাল। সর্বনাশ! ওই কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে!

নন্দিনী। নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি-যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে— ও কখনো মরতে পারে না।

ফাগুলাল। হায় রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে।

নন্দিনী। ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে।— চন্দ্রা কোথায়, ফাগুলাল।

ফাগুলাল। সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দারের 'পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস।— কিন্তু মহারাজ, ভুল বোঝ নি তো? আমরা তোমারি বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা। হাঁ, আমারি বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল। সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা। তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল। সৈন্যেরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা। একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল। জিততে পারবে?

রাজা। মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি— বেঁচেছি।

ফাগুলাল। রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জন?

রাজা। ওই-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শিগ্‌গির কী করে সম্ভব হল। আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারি নি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারি শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।

ফাগুলাল। আমার দলবল তো এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা। সর্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী। মনে ছিল, বিশুপাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না।

রাজা। উপায় নেই। পথঘাট আটক করতে সর্দারের মতো কাউকে দেখি নি।

ফাগুলাল। তা হলে চলো নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে। সর্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না।

নন্দিনী। একা আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে ? ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে। সর্দার, সর্দার !— দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে। ওই মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।— সর্দার ! আমাকে দেখতে পেয়েছে। জয় রঞ্জনের জয়। [দ্রুত প্রস্থান

রাজা। নন্দিনী। [প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

ফাগুলাল। কোথায় ছুটেছ, অধ্যাপক।

অধ্যাপক। কে-যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে— পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।

ফাগুলাল। রাজা তো ওই গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।

অধ্যাপক। তার জাল ছিঁড়েছে। নন্দিনী কোথায়।

ফাগুলাল। সে গেছে সবার আগে। তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক। এইবারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব। [প্রস্থান

বিশুর প্রবেশ

বিশু। ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায়।

ফাগুলাল। তুমি কী করে এলে।

বিশু। আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ওই চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়।

ফাগুলাল। সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু। কোথায়।

ফাগুলাল। শেষ মুক্তিতে।—বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে ?

বিশু। ও-যে রঞ্জন !

ফাগুলাল। ধুলায় দেখছ ওই রক্তের রেখা ?

বিশু। বুঝেছি, ওই তাদের পরমমিলনের রক্তরাখি। এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার। হয়তো গান শুনতে চাইবে। আমার পাগলী ! আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্।

ফাগুলাল। নন্দিনীর জয়।

বিশু। নন্দিনীর জয়।

ফাগুলাল। আর, ওই দেখো, ধুলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডানহাত থেকে কখন্ খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু। তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল, তার শেষ দান।

[প্রস্থান

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

দেনাপাওনা

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপমায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ-গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুরদেবতার নামই প্রচলিত ছিল— গণেশ, কার্তিক, পার্বতী, তাহার উদাহরণ।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের-মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদি ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন ; এমন পাত্র কোনো-মতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এদিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়-বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করিয়া দিব।" রায়বাহাদুর বলিলেন, "টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।"

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল

কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।"

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, "দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার।" দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, "শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।"

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, "তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা।" রামসুন্দর বলিলেন, "কেন আসতে দেবে না, মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।"

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন-বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া অপমান তো সহা যায় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে-ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে, তাহারি ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে; এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এদিকে শ্বশুরবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁচা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশুড়ীর আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, "আহা, কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।" শাশুড়ী ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, "শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।"

এমন কি, বউয়ের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ী বলে, "ওই ঢের হয়েছে।" অর্থাৎ বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয় কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে-কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ-কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়িবিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানাস্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ককেশে শুষ্কমুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাতলাভ করিতেন, তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে, তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, "বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।" রামসুন্দর বলিলেন, "আচ্ছা।"

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই— নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন কি কন্যার দর্শন, সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে-সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত

হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে-ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোটক'খানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন। নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন; শহরে একটা নূতন ব্যামো আসিয়াছে, সে-সম্বন্ধে অনেক আজগুবি আলোচনা করিলেন; অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, বেহাই সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি।" এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "থাক্ বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।" একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারো মুখে আসে না— কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, 'সে-সকল কুটুম্বিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।' মর্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, "সে এখন হচ্ছে না।" এই বলিয়া কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল— তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পুজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি'— খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর

যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, "দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস ?" বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন, এবং সে-সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ-কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই ; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে ; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তারপরে রামসুন্দর কহিলেন, "এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি, মা। আর কোনো গোল নাই।"

এমন সময়ে রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তার দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে ?"

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, "তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে ?" রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন ; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায়, তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না ?"

নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া বলিল, "পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে ?"

নিরুপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, "বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা-হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।"

রামসুন্দর বলিলেন, "ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ-টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি, তা-হলে তোর বাপের অপমান। আর তোরো অপমান।"

নিরু কহিল, "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ-টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ-টাকা চান না।"

রামসুন্দর কহিলেন, "তা-হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।"

নিরুপমা কহিল, "না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।"

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই-যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে-কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়ীকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এদিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে ; এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয়, এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়ীকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক-মাসের হিমের সময় সমস্তরাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে-মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত, তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে-যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ীর সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন,

তবে শাশুড়ী বলিতেন, "নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।" কখনো-বা বলিতেন, "দেখো-না, একবার ছিরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।"

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ী বলিলেন, "ওঁর সমস্ত ন্যাকামি।" অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়ীকে বলিল, "বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।" শাশুড়ী বলিলেন, "কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।"

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না— যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল, সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়োবউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা-বিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরিদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রহিয়া গেল— এমন চন্দনকাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনো দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব এবং শুনা যায়, ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময় তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এদিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, "আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।" রায়বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, "বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।"

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

১২৯৮ ?

পোস্টমাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে-

রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস ; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্তদিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়— কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকে ঘরে আসিত না— বলিত, "কী গা বাবু, কেন ডাকছ।"

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে— হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন— একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর

মাকে মনে পড়ে ?" সে অনেক কথা ; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশী ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারি মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্ট-মাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটো-ভাই ছিল— বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল— অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশী উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশী রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত— তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল ; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি

স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ওইরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, 'রতন'। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?" পোস্টমাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ— নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন— বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমচ্ছিলে?" পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন— মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে-মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে ?"

পোস্টমাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"

রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর-কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে ; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে-মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে ?"

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্তরাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন্ তিনি যাত্রা করিবেন সে-কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে-লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।"

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"— বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর

উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন— একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'— কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে— এবং নদী-প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

১২৯৮ ?

গিন্নি

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণী নিচে আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাঁহার গোঁফদাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হ্রস্ব। তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই। আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের দুই একত্রে ছিল। এদিকে কিল চড় চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলাবৃষ্টির মতো অজস্র বর্ষিত হইত, ওদিকে তীব্র বাক্যজ্বালায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, পুরাকালের মতো গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই;

ছাত্রেরা গুরুকে আর দেবতার মতো ভক্তি করে না ; এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন ; এবং মাঝে-মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের রূপান্তর বলিয়া কাহারো ভ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষুদ্র বাঙালীমূর্তি কি ধরা পড়ে না।

যাহা হউক, আমাদের স্কুলের এই তৃতীয়শ্রেণী দ্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্তিক বলিয়া কাহারো ভ্রম হইত না ; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁহার নাম যম ; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই, আমরা মনে মনে কামনা করিতাম, উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ বুঝা গিয়াছিল, নরদেবতার মতো বালাই আর নাই। সুরলোক-বাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফুল পাড়িয়া দিলে খুশী হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চান অনেক বেশী, এবং আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে চক্ষুদুটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছুতেই দেবতার মতো দেখিতে হয় না।

বালকদের পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথপণ্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল, সেটি শুনিতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ। তিনি ছেলেদের নূতন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ বই আর কিছুই নয় কিন্তু সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশী ভালোবাসে ; নিজের নাম রাষ্ট্র করিবার জন্য লোকে কী কষ্টই না স্বীকার করে, এমন কি, নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর স্থানে আঘাত করা হয়। এমন কি, যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে তাহার অসহ্য বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওয়া যায়, মানুষ বস্তুর চেয়ে অবস্তুকে বেশী মূল্যবান জ্ঞান করে, সোনার চেয়ে বানি, প্রাণের চেয়ে মান এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে।

মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তর্নিহিত নিগূঢ় নিয়মবশত পণ্ডিতমহাশয় যখন শশীশেখরকে ভেটকি নাম দিলেন তখন সে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষত উক্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হইতেছে জানিয়া তাহার

মর্মযন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

আশুর নাম ছিল গিন্নি, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত আছে।

আশু ক্লাসের মধ্যে নিতান্ত বেচারা ভালোমানুষ ছিল। কাহাকেও কিছু বলিত না, বড়ো লাজুক ; বোধহয় বয়সে সকলের চেয়ে ছোটো, সকল কথাতেই কেবল মৃদু মৃদু হাসিত ; বেশ পড়া করিত ; স্কুলের অনেক ছেলেই তাহার সঙ্গে ভাব করিবার জন্য উন্মুখ ছিল কিন্তু সে কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, এবং ছুটি হইবামাত্রই মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত।

পত্রপুটে গুটিকতক মিষ্টান্ন এবং ছোটো কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া একটার সময় বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশু সেজন্য বড়ো অপ্রতিভ ; দাসীটা কোনোমতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচে। সে-যে স্কুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর-কিছু, এটা সে স্কুলের ছেলেদের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড়ো অনিচ্ছুক। সে-যে বাড়ির কেহ, সে-যে বাপমায়ের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারি একটা গোপন কথা, এটা সঙ্গীদের কাছে কোনোমতে প্রকাশ না হয়, এই তাহার একান্ত চেষ্টা।

পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহার আর-কোনো ত্রুটি ছিল না, কেবল এক-একদিন ক্লাসে আসিতে বিলম্ব হইত এবং শিবনাথপণ্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারিত না। সেজন্য মাঝে-মাঝে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। পণ্ডিত তাহাকে হাঁটুর উপর হাত দিয়া পিঠ নীচু করিয়া দালানের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন ; চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লজ্জাকাতর হতভাগ্য বালককে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহণের ছুটি ছিল। তাহার পরদিন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পণ্ডিতমহাশয় দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি শ্লেট ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থলির মধ্যে পড়িবার বইগুলি জড়াইয়া লইয়া অন্যদিনের চেয়ে সংকুচিতভাবে আশু ক্লাসে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথপণ্ডিত শুষ্কহাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই-যে গিন্নি আসছে।"

তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছুটির পূর্বে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোন্ তোরা সব শোন্।"

পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণশক্তি সবলে বালককে নিচের দিকে টানিতে লাগিল ; কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেঞ্চির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা ঝুলাইয়া ক্লাসের সকল বালকের লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া রহিল। এতদিনে আশুর অনেক বয়স

হইয়া থাকিবে এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখদুঃখলজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালকহৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথায় শেষ হইয়া যায়।

আশুর একটি ছোটো বোন আছে; তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনী কিংবা ভগিনী আর-কেহ নাই, সুতরাং আশুর সঙ্গেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশুদের বাড়ির গাড়িবারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল। জুতা হাতে করিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া যে দুইচারিজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল, তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে, সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে, সেই সমস্তদিন ছুটিতে, গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া আশু তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পুতুলের বিয়ে। তাহারি আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ব্যস্ত হইয়া আশু তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তর্ক উঠিল, কাহাকে পুরোহিত করা যায়। বালিকা চট করিয়া ছুটিয়া একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি আমাদের পুরুতঠাকুর হবে?"

আশু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথপণ্ডিত ভিজা ছাতা মুড়িয়া অর্ধসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন; পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাঁহাকে পুতুলের পৌরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পণ্ডিতমশায়কে দেখিয়াই আশু তাহার খেলা এবং ভগিনী সমস্ত ফেলিয়া এক-দৌড়ে গৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার ছুটির দিন সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গেল।

পরদিন শিবনাথপণ্ডিত যখন শুষ্ক উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকাস্বরূপে উল্লেখ করিয়া সাধারণসমক্ষে আশুর 'গিন্নি' নামকরণ করিলেন, তখন প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদুভাবে হাসিয়া থাকে তেমন করিয়া হাসিয়া চারিদিকের কৌতুকহাস্যে ঈষৎ যোগ দিতে চেষ্টা করিল; এমনসময় একটা ঘণ্টা বাজিল, অন্য-সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল, এবং শালপাতায় দুটি মিষ্টান্ন ও ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

তখন হাসিতে হাসিতে তাহার মুখকান টকটকে লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল আর কিছুতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথপণ্ডিত বিশ্রামগৃহে জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতে লাগিলেন

—ছেলেরা পরমাহ্লাদে আশুকে ঘিরিয়া 'গিন্নি গিন্নি' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ছুটির দিনের ছোটোবোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর লোক কোনোকালেও যে সেদিনের কথা ভুলিয়া যাইবে এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

১২৯৮ ?

রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা

যাহারা বলে গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়িমাছের ঝালচচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল, তখন স্তূপাকৃতি চর্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীর-মুখে কহিলেন, "দুটো পান্তাভাত-যে মুখে দেব, তারো সময় পাওয়া যায় না।"

এদিকে ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজকলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন— কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই— এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জীব হস্তে যাহা সই করিলেন, তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পান্তাভাত খাইয়া যখন স্ত্রী আসিলেন তখন গুরুচরণের বাক্‌রোধ হইয়াছে দেখিয়া

স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা বলিল 'মায়াকান্না'। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল— বলিল, "মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে—"

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন— এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে— কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন। দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, তোমার যা-কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমতো আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, "দেখিব মুখাগ্নি কে করে— এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।" গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্রিশ্চান বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত, "রাম, আমি যদি ক্রিশ্চান হই তো গোমাংস খাই।" জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমতো ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিরোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকে সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।"

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুইচারিজন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে-মধ্যে দুইচারিটা নূতন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখণ্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও পূর্বাপর যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-মতো অসংলগ্ন আকার ধারণ করিল।—

"ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো,

লেখাটা কার। তোমার বুঝি? ওগো, তেমন যত্ন ক'রে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো।— তোরা একটুকু থাম্, মেলা চেঁচাস নে, কথাটা শুনতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেলুম না গো— আমি কেন বেঁচে রইলুম।" রামকানাই মনে-মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে আমাদের কপালের দোষ।"

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন,— অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।"

নবদ্বীপের মা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, তুমি বড়ো ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না; দাদা বললেন 'লেখো', ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সময়কালে ওই কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন্ পোড়ারমুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে— আর আমার সোনার-চাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে। কিন্তু সেজন্যে ভেবো না, আমি শিগগির মরছি নে।"

এইরূপে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচারের আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরোত্তর অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন, যদি এই-সকল উৎকট কাল্পনিক আশঙ্কা নিবারণ-উদ্দেশে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন, তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন তিনি সোনার নবদ্বীপকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভাবী দ্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কোনো ভাবনা নাই। এ-বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।" নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিসুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না; সুতরাং কথাটা তাঁরো যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইলজালের

অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে-উইলখানি বাহির করিয়াছে, তাহার নামসহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল, সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষ্য জুটাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল, তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন কি, কিঞ্চিৎ রসালাপ করিবারও চেষ্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, "গোলাম হাজির, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।"

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নেও নেও, আর রঙ্গ করতে হবে না। এতদিন ছুতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন, একদিনের তরে তো মনে পড়ে নি। ইত্যাদি।

এইরূপে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন,— অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল— নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন। নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, 'রমণীর মুখে মধু, হৃদয়ে ক্ষুর',— যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক হইয়া যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন, তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল-যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।"

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষু-স্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোরা একি সর্বনাশ করিয়াছিস।" গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"

কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া

আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে। যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে-ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়।

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনো-বা তর্জনগর্জন কখনো-বা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন— আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপে দুই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্য-মঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন,— বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে-উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে-উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, "বাই জোভ। লোক-টাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।"

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল, "বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল,— আমার সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন, "বটে? লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভালো বলে জানতুম।"

কারাবরুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার-জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল; আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, "আর কিছুদিন পূর্বে গেলেই ভালো হইত"— কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

১২৯৮ ?

ব্যবধান

সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশুমালী উভয়ে মামাতো পিস-তুতো ভাই; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে মেলে। কিন্তু ইহাদের দুই পরিবার বহুকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এইজন্য ইহাদের সম্পর্ক নিতান্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বনমালী হিমাংশুর চেয়ে অনেক বড়ো। হিমাংশুর যখন দন্ত এবং বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই, তখন বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কান্না থামাইয়াছে, ঘুম পাড়াইয়াছে এবং শিশুর মনো-রঞ্জন করিবার জন্য পরিণতবুদ্ধি বয়স্ক লোকদিগকে সবেগে শিরশ্চালন, তারস্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে-সকল বয়সানুচিত চাপল্য এবং উৎকট উদ্যম প্রকাশ করিতে হয়, বনমালী তাহাও করিতে ত্রুটি করে নাই।

বনমালী লেখাপড়া বড়ো-একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের শখ ছিল এবং এই দূরসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল। ইহাকে খুব একটি দুর্লভ দুর্মূল্য লতার মতো বনমালী হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসিঞ্চন করিয়া পালন করিতেছিল এবং সে যখন তাহার সমস্ত অন্তরবাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া লতাইয়া উঠিতে লাগিল, তখন বনমালী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

এমন সচরাচর দেখা যায় না কিন্তু এক-একটি স্বভাব আছে যে, একটি ছোটো খেয়াল কিংবা একটি ছোটো শিশু কিংবা একটি অকৃতজ্ঞ বন্ধুর নিকটে অতি সহজে আপনাকে

সম্পূর্ণ বিসর্জন করে; এই বিপুল পৃথিবীতে একটিমাত্র ছোটো স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তারপরে হয়তো সামান্য উপস্বত্বে পরম সন্তোষে জীবন কাটাইয়া দেয় কিংবা সহসা একদিন প্রভাতে সমস্ত ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া কাঙাল হইয়া পথে গিয়া দাঁড়ায়।

হিমাংশুর বয়স যখন আর-একটু বাড়িল, তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিস্তর তারতম্য-সত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন ছোটোবড়ো কিছু ছিল না।

এইরূপ হইবার একটু কারণও ছিল। হিমাংশু লেখাপড়া করিত এবং স্বভাবতই তাহার জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বই পাইলেই পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক বাজে বই পড়া হইয়াছিল বটে কিন্তু যেমন করিয়াই হউক চারিদিকেই তাহার মনের একটি পরিণতিসাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ একটু শ্রদ্ধার সহিত তাহার কথা শুনিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোটোবড়ো সকল কথার আলোচনা করিত, কোনো বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না। হৃদয়ের সর্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মানুষ করা গিয়াছে, বয়সকালে যদি সে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য শ্রদ্ধার অধিকারী হয়, তবে তাহার মতো এমন পরমপ্রিয়বস্তু পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের শখও হিমাংশুর ছিল। কিন্তু এ-বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রভেদ ছিল। বনমালীর ছিল হৃদয়ের শখ, হিমাংশুর ছিল বুদ্ধির শখ। পৃথিবীর এই কোমল গাছপালাগুলি, এই অচেতন জীবনরাশি, যাহারা যত্নের কোনো লালসা রাখে না অথচ যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগুলির মতো বাড়িয়া ওঠে, যাহারা মানুষের শিশুর চেয়েও শিশু, তাহাদিগকে সযত্নে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বনমালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশুর গাছপালার প্রতি একটি কৌতূহলদৃষ্টি ছিল। অঙ্কুর গজাইয়া উঠে, কিশলয় দেখা দেয়, কুঁড়ি ধরে, ফুল ফুটিয়া উঠে, ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজবপন, কলম করা, সার দেওয়া, চানকা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যানখণ্ডটুকু লইয়া আকৃতি প্রকৃতির যত প্রকার সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব, তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

দ্বারের সম্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাঁধানো বেদির মতো ছিল। চারটে বাজিলেই একটি পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া,

গুড়গুড়ি লইয়া, বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বসিত। কোনো বন্ধুবান্ধব নাই, হাতে একখানি বই কিংবা খবরের কাগজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখনো-বা দক্ষিণে কখনো বামে দৃষ্টিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গুড়গুড়ির বাষ্পকুণ্ডলীর মতো ধীরে ধীরে অত্যন্ত লঘুভাবে উড়িয়া যাইত, ভাঙিয়া যাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোনো চিহ্ন রাখিত না।

অবশেষে যখন হিমাংশু স্কুল হইতে ফিরিয়া, জল খাইয়া হাতমুখ ধুইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনি তাহার আগ্রহ দেখিয়া বুঝা যাইত, এতক্ষণ ধৈর্যসহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দুইজনে বেঞ্চের উপর বসিত,— দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত ; কোনোদিন-বা বাতাস বহিত না, গাছপালাগুলি ছবির মতো স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগুলি জ্বলিতে থাকিত।

হিমাংশু কথা কহিত, বনমালী চুপ করিয়া শুনিত। যাহা বুঝিত না, তাহাও তাহার ভালো লাগিত ; যে-সকল কথা আর-কাহারো নিকট হইতে অত্যন্ত বিরক্তি-জনক লাগিতে পারিত, সেই কথাই হিমাংশুর মুখে বড়ো কৌতুকের মনে হইত। এমন শ্রদ্ধাবান বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি স্মৃতিশক্তি কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত। সে কতক-বা পড়িয়া বলিত, কতক-বা ভাবিয়া বলিত, কতক-বা উপস্থিতমতো তাহার মাথায় জোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহায়তায় জ্ঞানের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত, অনেক বেঠিক কথাও বলিত, কিন্তু বনমালী গম্ভীরভাবে শুনিত, মাঝে-মাঝে দুটো-একটা কথা বলিত, হিমাংশু তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বুঝাইত তাহাই বুঝিত, এবং তাহার পরদিন ছায়ায় বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেই-সকল কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝখানে জল যাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিলেবুর গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেষ্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে এবং উভয় পক্ষে যে-গালাগালি বর্ষিত হয়, তাহাতে যদি কিছুমাত্র বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে

তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকিল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল, সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল, ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের জিত হইল; প্রমাণ হইয়া গেল, নালা তাহারি এবং পাতিনেবুতে আর-কাহারো কোনো অধিকার নাই। আপিল হইল কিন্তু নালা এবং পাতিনেবু হরচন্দ্রেরই রহিল।

যতদিন মকদ্দমা চলিতেছিল, দুই ভাইয়ের বন্ধুত্বে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমন কি, পাছে বিবাদের ছায়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় কাতর হইয়া বনমালী দ্বিগুণ ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশুকে হৃদয়ের কাছে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, এবং হিমাংশুও লেশমাত্র বিমুখভাব প্রকাশ করিত না।

যেদিন আদালতে হরচন্দ্রের জিত হইল, সেদিন বাড়িতে বিশেষত অন্তঃপুরে পরম উল্লাস পড়িয়া গেল, কেবল বনমালীর চক্ষে ঘুম রহিল না। তাহার পরদিন অপরাহ্ণে সে এমন ম্লানমুখে সেই বাগানের বেদিতে গিয়া বসিল, যেন পৃথিবীতে আর-কাহারো কিছু হয় নাই, কেবল তাহারি একটা মস্ত হার হইয়া গেছে।

সেদিন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু হিমাংশু আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশুদের বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, আলনার উপরে হিমাংশুর স্কুলের ছাড়া-কাপড় ঝুলিতেছে; অনেকগুলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল— হিমাংশু বাড়িতে আছে। গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া দিয়া বিষণ্ণমুখে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশু বাগানে আসিল না।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে বনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশুর বাড়িতে গেল।

গোকুলচন্দ্র দ্বারের কাছে বসিয়া তপ্ত দেহে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কে ও।"

বনমালী চমকিয়া উঠিল। যেন সে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মামা, আমি।"

মামা বলিলেন, "কাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছ। বাড়িতে কেহ নাই।"

বনমালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল, দেখিল হিমাংশুদের বাড়ির জানলাগুলি একে একে বন্ধ

হইয়া গেল ; দরজার ফাঁক দিয়া যে-দীপালোকরেখা দেখা যাইতেছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে বনমালীর মনে হইল, হিমাংশুদের বাড়ির সমুদয় দ্বার তাহারি নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবার তাহার পরদিন বাগানে আসিয়া বসিল, মনে করিল, আজ হয়তো আসিতেও পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত, সে-যে একদিনও আসিবে না, এ-কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখনো মনে করে নাই, এ বন্ধন কিছুতেই ছিঁড়িবে ; এমন নিশ্চিন্তমনে থাকিত যে, জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ কখন্ সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। আজ সহসা জানিল সেই বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, কিন্তু একমুহূর্তে-যে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত, যদি দৈবক্রমে আসে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, যাহা নিয়মক্রমে প্রত্যহ ঘটিত, তাহা দৈবক্রমেও একদিন ঘটিল না।

রবিবারদিনে ভাবিল, পূর্বনিয়মমতো আজো হিমাংশু সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবে। ঠিক-যে বিশ্বাস করিল তাহা নয় কিন্তু তবু আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল, সে আসিল না।

তখন বনমালী বলিল, 'তবে আহার করিয়া আসিবে।' আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল, 'আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙিলেই আসিবে।' ঘুম কখন্ ভাঙিল জানি না, কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, হিমাংশুদের দ্বার একে একে রুদ্ধ হইল, আলোগুলি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহের সাতটা দিনই যখন দুরদৃষ্ট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আশাকে আশ্রয় দিবার জন্য যখন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশুদের রুদ্ধদ্বার অট্টালিকার দিকে তাহার অশ্রুপূর্ণ দুটি কাতর চক্ষু বড়ো-একটা মর্মভেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আর্তস্বরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল, 'দয়াময় !'

১২৯৮ ?

তারাপ্রসন্নের কীর্তি

লেখকজাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসন্ন কিছু লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, পিঠ একটু কুঁজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না, এইজন্য গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।

লোকেও তাঁহাকে একটা উজবুক রকমের মনে করিত এবং লোকেরো দোষ দেওয়া যায় না। মনে করো, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারাপ্রসন্নকে বলিলেন, "মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে যে কী পর্যন্ত আনন্দ লাভ করা গেল, তা একমুখে বলতে পারি নে"— তারাপ্রসন্ন নিরুত্তর হইয়া নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সে নীরবতার অর্থ এইরূপ মনে হয়, 'তা, তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খুব সম্ভব বটে, কিন্তু আমার-যে আনন্দ হয়েছে, এমন মিথ্যা কথাটা কী করে মুখে উচ্চারণ করব তাই ভাবছি।'

মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্বামী যখন সায়াহ্নের প্রাক্কালে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন এবং মধ্যে-মধ্যে বিনীত কাকুতিসহকারে ভোজ্যসামগ্রীর অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে তারাপ্রসন্নকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে থাকেন, "এ কিছুই না। অতি যৎসামান্য। দরিদ্রের খুদকুঁড়া, বিদুরের আয়োজন। মহাশয়কে কেবলি কষ্ট দেওয়া"— তারাপ্রসন্ন চুপ করিয়া থাকেন, যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে-মধ্যে এমনো হয়, কোনো সুশীল ব্যক্তি যখন তারাপ্রসন্নকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার মতো অগাধ পাণ্ডিত্য বর্তমানকালে দুর্লভ এবং সরস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগপূর্বক তারাপ্রসন্নের কণ্ঠাগ্রে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তারাপ্রসন্ন তাহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন না, যেন সত্য-সত্যই সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়া অছেন। তারাপ্রসন্নের এইটে জানা উচিত যে, মুখের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আত্মনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসংকোচে অত্যুক্তি করিয়া থাকে— অপর পক্ষ আগাগোড়া সমস্ত কথাটা যদি অম্লানবদনে গ্রহণ করে, তবে বক্তা আপনাকে প্রতারিত জ্ঞান করিয়া বিষম ক্ষুব্ধ হয়। এইরূপ স্থলে লোকে নিজের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে দুঃখিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসন্নের ভাব অন্যরূপ ; এমন কি, তাঁহার নিজের স্ত্রী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। গৃহিণী কথায় কথায় বলেন, "নেও নেও, আমি হার মানলুম। আমার এখন অন্য কাজ আছে।" বাগ্‌যুদ্ধে স্ত্রীকে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে, এমন ক্ষমতা এবং এমন সৌভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে।

তারাপ্রসন্নের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দাক্ষায়ণীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাবুদ্ধি-ক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমতুল্য কেহ নাই এবং সে-কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না ; শুনিয়া তারাপ্রসন্ন বলিতেন, "তোমার একটি বই স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবে।" শুনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না,— স্বামীর সে-সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তারাপ্রসন্ন যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে-মাঝে স্বামীর লেখা শুনিতেন, যতই না বুঝিতেন ততই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শুনিয়াছেন। সে-সমস্তই জলের মতো বুঝা যায়, নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মতো এমন সম্পূর্ণ দুর্বোধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নাই।

তিনি মনে-মনে কল্পনা করিতেন, এই বই যখন ছাপানো হইবে এবং কেহ এক অক্ষর বুঝিতে পারিবে না, তখন দেশসুদ্ধ লোক বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়া যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বলিতেন, "এ-সব লেখা ছাপাও।"

স্বামী বলিতেন, "বই ছাপানো সম্বন্ধে ভগবান মনু স্বয়ং বলে গেছেন, প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

তারাপ্রসন্নের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এইজন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য স্ত্রী মনে করিতেন। যে-স্বামী কথায় কথায় এমন-সকল দুরূহ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা বই আর সন্তান হয় না, স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কী দিব।

প্রথম কন্যাটি যখন পিতার বক্ষের কাছ পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন তারাপ্রসন্নের নিশ্চিন্তভাব ঘুচিয়া গেল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল, একে একে চারিটি কন্যারই

বিবাহ দিতে হইবে, এবং সেজন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গৃহিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত-মুখে বলিলেন, "তুমি যদি একবার একটুখানি মন দাও, তাহা হইলে ভাবনা কিছুই নাই।"

তারাপ্রসন্ন কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সত্য নাকি। আচ্ছা, বলো দেখি কী করিতে হইবে।"

দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "কলিকাতায় চলো, তোমার বইগুলা ছাপাও, পাঁচজন লোকে তোমাকে জানুক,— তার পরে দেখো দেখি, টাকা আপনি আসে কিনা।"

স্ত্রীর আশ্বাসে তারাপ্রসন্নও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন এবং মনে প্রত্যয় হইল, তিনি ইস্তক-নাগাদ বসিয়া বসিয়া যত লিখিয়াছেন তাহাতে পাড়াসুদ্ধ লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নিরুপায় নিঃসহায় সযত্নপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসারের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অনভিজ্ঞ স্বামীও অপরিচিত বিদেশে স্ত্রীকন্যা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত ভীত ও অসম্মত। অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য-অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাদুলিতাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তারাপ্রসন্ন তাঁহার চতুর সঙ্গীর সাহায্যে 'বেদান্তপ্রভাকর' প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যে-টাকা ক'টি পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্রয়ের জন্য বহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোটো বড়ো সমস্ত সম্পাদকের নিকট 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন। ডাকযোগে গৃহিণীকেও একখানা বই রেজেস্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশঙ্কা ছিল, পাছে ডাকওয়ালারা পথের মধ্য হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যেদিন ছাপার বইয়ের উপরের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন, সেদিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বসিবার কথা, সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বসিলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওমা, বইটা ওখানে কে ফেলে রেখেছে। অন্নদা, বইটা দাও-না ভাই, তুলে রাখি।" উহাদের মধ্যে অন্নদা পড়িতে জানে। বইটা কুলঙ্গির উপর তুলিয়া রাখিলেন।

মুহূর্তপরে একটা জিনিস পাড়িতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন,— তারপরে নিজের বড়োমেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শশী, বাবার বই পড়তে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি? তা নে-না মা, পড়্-না। তাতে লজ্জা কী।" বাবার বহির প্রতি শশীর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "ছি মা, বাবার বই অমন করে নষ্ট করতে নেই, তোমার কমলাদিদির হাতে দাও, উনি ওই আলমারির মাথায় তুলে রাখবেন।"

বহির যদি কিছুমাত্র চেতনা থাকিত, তাহা হইলে সেই একদিনের উৎপীড়নে বেদান্তের প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগজে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিণী যাহা ঠাহরাইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর বুঝিতে না পারিয়া দেশশুদ্ধ সমালোচক একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে কহিল, "এমন সারবান গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।"

যে-সকল সমালোচক রেনল্ড্‌সের লণ্ডনরহস্যের বাংলা অনুবাদ ছাড়া আর-কোনো বই স্পর্শ করিতে পারে না, তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লিখিল, "দেশের ঝুড়ি ঝুড়ি নাটকনবেলের পরিবর্তে যদি এমন দুই-একখানি গ্রন্থ মধ্যে-মধ্যে বাহির হয়, তবে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবিকই পাঠ্য হয়।"

যে-ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে বেদান্তের নাম কখনো শুনে নাই সেই কেবল লিখিল, "তারাপ্রসন্নবাবুর সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই,— স্থানাভাববশত এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়।" কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইব্রেরি ছিল এবং ছিল না, তাহার সম্পাদকগণ মুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রাঙ্কিত পত্রে তারাপ্রসন্নের গ্রন্থ ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল, 'আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে।' চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে, তারাপ্রসন্ন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু পুলকিতচিত্তে ঘর হইতে মাস্থল দিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরিতে 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপ অজস্র স্তুতিবাক্যে তারাপ্রসন্ন যখন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন দাক্ষায়ণীর পঞ্চম সন্তানসম্ভাবনা অতি নিকটবর্তী হইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সঙ্গে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দোকানদার একবাক্যে বলিল, একখানি বইও বিক্রয় হয় নাই। কেবল এক জায়গায় শুনিলেন, মফঃস্বর হইতে কে-একজন তাঁহার এক বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং তাহাকে ভ্যালুপেবেলে পাঠানোও হইয়াছিল, কিন্তু বই ফেরত আসিয়াছে, কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাস্থল দণ্ড দিতে হইয়াছে, সেইজন্য সে বিষম আক্রোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বহি তখনি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশীল গ্রন্থ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিলেন, ততই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে-কয়েকটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তারাপ্রসন্ন গৃহিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শুভ সংবাদের জন্য সহাস্যমুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখানি 'গৌড়বার্তাবহ'আনিয়া গৃহিণীর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে-মনে সম্পাদকের অক্ষয় ধনপুত্র কামনা করিলেন ; এবং তাঁহার লেখনীর মুখে মানসিক পুষ্পচন্দন-অর্ঘ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তখন 'নবপ্রভাত' আনিয়া খুলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্বলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখণ্ড 'যুগান্তর' বাহির করিলেন। তাহার পর ? তাহার পর 'ভারতভাগ্যচক্র'। তাহার পর ? তাহার পর 'শুভজাগরণ' তাহার পর 'অরুণালোক', তাহার পর 'সংবাদতরঙ্গভঙ্গ'। তাহার পর— আশা, আগমনী, উচ্ছ্বাস, পুষ্পমঞ্জরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, অহল্যালাইব্রেরি-প্রকাশিকা, ললিত সমাচার, কোটাল, বিশ্ববিচারক, লাবণ্যলতিকা। হাসিতে হাসিতে গৃহিণীর আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া আর-একবার স্বামীর কীর্তিরশ্মিসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেন,—

স্বামী বলিলেন, "এখনো অনেক কাগজ বাকি আছে।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কী বলো।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "এবার কলিকাতায় গিয়া শুনিয়া আসিলাম, লাটসাহেবের মেম একখানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেদান্তপ্রভাকরের কোনো উল্লেখ করে নাই।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "আহা, ও-সব কথা নয়— আর কী আনলে বলো-না।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "কতকগুলো চিঠি আছে।"

তখন দাক্ষায়ণী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "টাকা কত আনলে।" তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "বিধুভূষণের কাছে পাঁচ টাকা হাওলাত করে এনেছি।"

অবশেষে দাক্ষায়ণী যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন পৃথিবীর সাধুতা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্যস্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় দোকানদারেরা তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত ক্রেতা ষড়যন্ত্র করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।

অবশেষে সহসা মনে হইল, যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া স্বামীর সহিত পাঠাইয়াছিলেন সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে— এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, ওপাড়ার বিশ্বম্ভর চাটুজ্যে তাঁহার স্বামীর পরম শত্রু, নিশ্চয়ই এ-সমস্ত তাঁহারি চক্রান্তে ঘটিয়াছে। তাই বটে, যেদিন তাঁহার স্বামী কলিকাতায় যাত্রা করেন, তাহার দুই দিন পরেই বিশ্বম্ভরকে বটতলায় দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল— কিন্তু বিশ্বম্ভর মাঝে-মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবার্তা কয় না কি, এইজন্য তখন কিছু মনে হয় নাই, এখন সমস্ত জলের মতো বুঝা যাইতেছে।

এদিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থসংগ্রহের এই একমাত্র সহজ উপায় নিষ্ফল হইল, তখন আপনার কন্যাপ্রসবের অপরাধ তাঁহাকে চতুর্গুণ দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর, বিধুভূষণ অথবা বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না— সমস্তই একলা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল, কেবল যে-মেয়েরা জন্মিয়াছে এবং জন্মিবে তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিলেন। অহোরাত্র মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে আর শান্তি রহিল না।

আসন্নপ্রসবকালে দাক্ষায়ণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল যে, সকলের বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় তারাপ্রসন্ন পাগলের মতো হইয়া বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া বলিল, "দাদা, আমার এই খানপঞ্চাশেক বই বাঁধা রাখিয়া যদি কিছু টাকা দাও তো আমি শহর হইতে ভালো দাই আনাই।"

বিশ্বম্ভর বলিল, "ভাই, সেজন্য ভাবনা নাই, টাকা যাহা লাগে আমি দিব,

তুমি বই লইয়া যাও।” এই বলিয়া কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধুভূষণ স্বয়ং গিয়া নিজে হইতে পাথেয় দিয়া কলিকাতা হইতে ধাত্রী আনিল।

দাক্ষায়ণী কী মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, “যখনি তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে, স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিয়ো না। আর, সেই সন্ন্যাসীর মাতুলিটা কখনোই খুলিয়া রাখিয়ো না।” আর এমন ছোটোখাটো সহস্র বিষয়ে স্বামীর দুটি হাতে ধরিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। আর বলিলেন, বিধুভূষণের উপর কিছুই বিশ্বাস নাই, সেই তাঁহার স্বামীর সর্বনাশ করিয়াছে। নতুবা ঔষধ মাতুলি এবং মাথার-দিব্য সমেত তাঁহার সমস্ত স্বামীটিকে তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তারপরে মহাদেবের মতো তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে পৃথিবীর নির্মম কুটিলবুদ্ধি চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বারবার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষে চুপি-চুপি বলিলেন, “দেখো, আমার যে-মেয়েটি হইবে, সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিয়ো ‘বেদান্তপ্রভা’, তারপরে তাহাকে শুধু প্রভা বলিয়া ডাকিলেই চলিবে।”

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন। মনে-মনে কহিলেন, ‘কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবার বোধ হয় সে আপদ ঘুচিল।’

ধাত্রী যখন বলিল, “মা, একবার দেখো, মেয়েটি কী সুন্দর হয়েছে”— মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন ‘বেদান্তপ্রভা’। তারপরে ইহসংসারে আর-একটি কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না।

১২৯৮ ?

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

১১

রসের ধর্ম

আমাদের ধর্মসাধনার দুটো দিক আছে, একটা শক্তির দিক, একটা রসের দিক। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত, এও ঠিক তেমনি।

শক্তির দিক হচ্ছে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন, এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলি নে। আমি যার কথা বলছি, এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে— আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিসটি পৃথিবীর মতো দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে, সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায়, তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে— কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্যে যে-সব জিনিস সংসারের জোয়ারে ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায়, তাদেরি তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা-কিছু হারায়, যা-কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায়, তার ক্ষতিকে এমনি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে, কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলি তার মনে হয়, সর্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলি তার মনে নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই-সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্তি দেখতে পায় না। যে-লোক ডুবজলে সাঁতার দেয় যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি কলসি কলার ভেলা তার পরমধন— তার ভয় ভাবনা উদ্বেগের সীমা নেই। আর, যে-ব্যক্তির পায়ের নিচে সুদৃঢ় মাটি আছে, তারো হাঁড়িকলসির প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়িকলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়— এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তা-হলে তার যতই অভাব অসুবিধা হ'ক না, সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই। সে মনের মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে, তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখতে পেলেও সে মনে-মনে জানে, ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি— বিরুদ্ধ ফল পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড়ো জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য ব'লে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্ছে সেই বিশ্বাস যে-মাটির উপরে আমাদের ধর্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি শুনতে সহজ, এবং শোনাবামাত্রই অনেকে হয়তো বলে উঠবেন যে, ঈশ্বর সত্য, এ কথা তো আমরা অস্বীকার করি নে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন, এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য, এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারি নে। আমাদের মন সেই পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক না কেন, যিনি চরমসত্য পরমসত্য তিনি আছেন এবং তাঁর মধ্যেই আমি আছি, এই ভরসাটুকু সকল অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে, সে ব্যক্তি যেমনভাবে জীবনের কাজ করে, আমরা কি তেমনভাবে করে থাকি।— আছেন, আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন— সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারি আছেন— জীবনে যত উলটপালটই হ'ক, এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না, এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্ছে বিশ্বাসী ; তিনি আছেন, এই সত্যের উপরে সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন, এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর-যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন, এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে— এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত, তা-হলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ংকর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে— সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থকরূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ— তার চলাফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিসটি সচল ;— সে কঠিন নয় ব'লে, নম্র ব'লে, সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে ; এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলছে— এইজন্যেই কেবলই সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এইজন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে-আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেকসময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে— তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে ; সে অন্যকে আঘাত করে ; তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই, এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে ; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না ব'লে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্য দিকে আছে, তারা কিছুই দেখছে না এবং সমস্তই ভুল দেখছে ব'লে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না ; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারিভিতের মধ্যে জোর ক'রে টেনে আনতে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্যকে দুর্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল ব'লে অবজ্ঞা করে এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন ব'লে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়— সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে-যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে-যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে-যে আপনার মর্মস্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্ছে তার অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময় প্রাণময় ভাবময় গতিভঙ্গীময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্যকে।

ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা! শুষ্কতায় অনম্রতায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিসটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে খরধার নমনীয়তা দেওয়া যায়, এ সে জিনিস নয়। সরস সজীব তরুশাখার যে-নম্রতা— যে-নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সংগীতে মুখরিত হয় এবং সূর্যের কিরণ ঝংকৃত সেতারের সুরগুলির মতো উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে; চারিদিকের বিশ্বের নানা ছন্দ যে-নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে; যে-নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সংগীতে পরিণত করে, এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বলতে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা— শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্যের দ্বারাই নত; প্রেমে ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে, রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে— আনন্দের ধর্মই হচ্ছে সে আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাকলে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না— অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়— এমন কি, যে-রাজা যথার্থ রাজা, প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে। রসের ঐশ্বর্যে যে-লোক ধনী, নম্রতাই তার প্রাচুর্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত। যেখানে তিনি সুন্দর; যেখানে রসোবৈ সঃ; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না; সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়; সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত বেদনা, কত কোমলতা! স্নেহের আনন্দভারে দুর্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড়ো কথা;—

তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, এ-সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোটো ; তিনি নত হয়ে সুন্দর হয়ে ভাবে ভঙ্গীতে হাসিতে গানে রসে গন্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন, এইটেই হচ্ছে আমাদের পক্ষে চরম কথা— তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্ছে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই-যে দুইটি পরিচয়— একটি অটল নিয়মে, আর একটি সুনম্র সৌন্দর্যে, এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্যটি আছে তাঁকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে, সে-যে আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেকদিন লেগেছিল কিন্তু সৌন্দর্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য মিলবে ব'লেই, ধরা দেবে ব'লেই সুন্দর। এই সৌন্দর্যের মধ্যেই, রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।

ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্যে কৃচ্ছ্রসাধনকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচারবিচারকেই মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে ; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ক'রে আবদ্ধ ক'রে রাখে ; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে— এইজন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহংকার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই-সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম ব'লে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় ব'লেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

য়িহুদি এইজন্যে আপনার ধর্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদমস্তক বন্দী করে রেখেছে ; ধর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্তমান হিন্দুসমাজও ধর্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই পৃথক করে রেখেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারত-বর্ষীয়কে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল, বর্তমান হিন্দুধর্মের সমস্ত নিয়মসংযম প্রধানত তারি প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলি দূর করছে, কেবলি ভাগ করছে, নিজেকে কেবলি সংকীর্ণ বদ্ধ ক'রে আড়াল করে রাখবার উদ্যোগ করছে। হিন্দুর ধর্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে

সমস্ত জানলাদরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলি বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বলতে পারি নে। কারণ, স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলে না। কিন্তু অন্যত্র এই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অর্থাৎ এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার উপরের জিনিস। ক্রীতদাস রাজাকে খুন ক'রে সিংহাসনে চড়ে বসলে যেমন হয়, স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা তেমনি মিলনধর্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল ক'রে বসে, তা হলে সেইরকমের অন্যায় ঘটে। এইজন্যেই পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে টেনে থাকলেও, ধর্মবুদ্ধি তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে— বিশ্বমানবের দিকে নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে সেইখানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্রপথেই এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে-ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়, সেই ধর্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক করেছি। আমরা বলেছি মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে একাসনে আহারে, তার আহরিত অন্নজল গ্রহণে, মানুষ ধর্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ, তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি— তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে।

আশ্চর্য ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা তারি হাতে দিতে চেষ্টা করছি, যে-জিনিসটা ধর্মের চেয়ে নিচেকার। আমরা স্বাজাত্যবুদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারতবর্ষের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার জন্যে। আমরা বলছি, তা না-হলে আমরা বড়ো হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্মকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছি যে, আমাদের জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি প্রয়োজনবুদ্ধিও তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। এমন দশা হয়েছে যে, ধর্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাত্যের দ্বারা আমাদের উদ্ধার পেতে হবে! এমন হয়েছে যে, ধর্ম আমাদের পৃথক থাকতে বলছে, স্বাজাত্য আমাদের এক হবার জন্যে তাড়না করছে!

কিন্তু ধর্মবুদ্ধি যে-মিলনের ঘটক নয়, সে-মিলনের উপর আমি ভরসা রাখতে পারি নে। ধর্মমূলক মিলনতত্ত্বটিকে আমাদের দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই স্বভাবতই আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলি গণ্ডি আঁকবার এবং বেড়া তোলবার প্রবৃত্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। ধর্মের সিংহদ্বার খোলা থাকলে তবেই ছোটো বড়ো সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব;— নতুবা কেবলমাত্র

প্রয়োজনের বা স্বাজাত্য-অভিমানের খিড়কির দরজাটুকু যদি খুলে রাখি, তবে ধর্মনিয়মের বাধা অতিক্রম করে সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এত প্রভেদপার্থক্য, এত বিরোধবিচ্ছেদ গলতে পারবে না— মিলতে পারবে না।

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনি সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খ্রীষ্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন, তা য়িহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভি-মানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করে নি; তার মৈত্রী তার করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল, সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

তাই বলছিলুম, ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় ক'রে কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল, তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনি সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো-একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলে নি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলে নি, আচারের শুষ্ক শাসনে মেলে নি।

ধর্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন, তখন সাধককে এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পুজার্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাকলে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর-কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে-দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেননা দুঃখের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়— সেবার মধ্যে, কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্থার মধ্যে দিয়ে যে-প্রেমের পরিপাক হয়েছে, সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই দুঃখস্বীকারই প্রেমের মাথার মুকুট; এই তার গৌরব। ত্যাগের দ্বারাই সে আপনাকে লাভ করে; বেদনার দ্বারাই তার রসের মন্থন হয়; সাধ্বী সতীকে যেমন সংসারের কর্ম মলিন করে না, তাকে আরো দীপ্তিমতী করে তোলে, সংসারে মঙ্গলকর্ম যেমন তার সতীপ্রেমকে সার্থক করতে থাকে, তেমনি যে-সাধকের চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে, কর্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃঙ্খল নয়— সে তাঁর অলংকার; দুঃখে তাঁর জীবন নত হয় না, দুঃখেই তাঁর ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এইজন্যে মানবসমাজে কর্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, তখন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্মমাত্রেরই মূল উৎপাটন এবং দুঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন, তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না— তাঁরা অনায়াসেই কর্মকে শিরোধার্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে-যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে-যে ভক্তিকে অপমান করা হয়; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়— দুঃখে নম্রতা ও কর্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্যের পরিচয়। কর্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন কর্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসন্তের উত্তাপে পর্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয়, তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন; তখন অক্লান্ত আনন্দে দেশদেশান্তরকে উর্বর ক'রে সে চলতে থাকে; তখন নুড়িপাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত হয় ততই তার সংগীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরনার মধ্যে তফাত কোন্‌খানে। না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এইজন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে— এইজন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরনার যে-গতি সে তার নিজেরি গতি,— সেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে-কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনি তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনি মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখনি তার ওঠাবসা খাওয়াপরা সকল দিকেই বাঁধাবাঁধি। তখনি সে সেই-সকল নিরর্থক কর্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলি একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়; তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে, সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।

বস্তুত মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে।

তার সমস্যা হচ্ছে এই যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পর যাঁরা দেখাতে চান, তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান, তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন। অর্থাৎ গাড়ি থেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার সুকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সারথিকে স্থাপন করাই হচ্ছে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গম্যস্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এইজন্যে মানুষের ধর্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনি সংসারে যেখানে যা-কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়— তখন কর্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

গুহাহিত

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন— গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং— অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা-কিছু প্রকাশিত, তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে— তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা যদি না থাকত তা হলে সেদিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না ; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে ব'লেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ ক'রে কেবল বাইরের জিনিসে সন্তুষ্ট থাকে নি। তাই সে চারিদিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে থামতে দিচ্ছে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে-বের-করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল ? যা-কিছু পাচ্ছি, তার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্ছি নে— যা পাচ্ছি নে, তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে, এই একটি সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মাল ?

পশুদের মনে তো এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারি মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্ছে— মুহূর্তকালের জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজতে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে, তাকে অতিক্রম করতে পারছে না ব'লে তাদের মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার, মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না— এমন কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে, 'দেখতে পাচ্ছি নে কিন্তু আরো আছে, শোনা যাচ্ছে না কিন্তু আরো আছে।'

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেললেই তা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে, এ কিন্তু সে-রকম নয়— এ আচ্ছন্ন ব'লে গুপ্ত নয়, এ গভীর ব'লেই গুপ্ত, সুতরাং একে যখন আমরা জানতে পারি তখনো এ গভীর থাকে।

গোরু উপরের থেকে ঘাস ছিঁড়ে খায়, শূকর দাঁত দিয়ে মাটি চিরে সেই ঘাসের মুথা উপড়ে খেয়ে থাকে, কিন্তু এখানে উপরের ঘাসের সঙ্গে নিচেকার মুথার প্রকৃতিগত

কোনো প্রভেদ নেই, দুটিই স্পর্শগম্য এবং দুটিতেই সমান-রকমেই পেট ভরে। কিন্তু মানুষ গোপনের মধ্যে যা খুঁজে বের করে, প্রকাশ্যের সঙ্গে তার যোগ আছে— সাদৃশ্য নেই। তা খনির ভিতরকার খনিজের মতো তুলে এনে ভাণ্ডার বোঝাই করবার জিনিস নয়। অথচ মানুষ তাকে রত্নের চয়ে বেশি মূল্যবান রত্ন বলেই জানে।

তার মানে আর-কিছুই নয়, মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে— তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এইজন্যই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্য মানুষ, আকাশে তারা আছে, কেবল এইটুকুমাত্র দেখেই মাটির দিকে চোখ ফেরায় নি— এইজন্যে কোন্ সুদূর অতীতকালে ক্যাল্‌ডিয়ার মরু-প্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে নিশীথরাত্রের আকাশপৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্করহস্য পাঠ করে নেবার জন্যে রাত্রের পরে রাত্রে অনিমেষ-নিদ্রাহীন-নেত্রে যাপন করেছে ;— তাদের যে-মেষরা চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারও সেদিকে তাকাবার প্রয়োজনমাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু মানুষ যা দেখে তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায়, নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না।

এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ করতে করতে মানুষ-যে কেবল সত্যকেই উদ্ঘাটন করেছে, তা বলতে পারি নে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে প্রতিদিন এককে আর ব'লে দেখে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠতে হয় তার সীমা নেই, কিন্তু তাই ব'লে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে তো একেবারে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই, সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে-যে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূতপ্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু তাই নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে। গভীর জলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগলি ওঠে, তার থেকেই জালফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেলছে, তার থেকে এ পর্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে— কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা, এইটেই একটি আশ্চর্য ব্যাপার ;— আফ্রিকার বন্যবর্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয়

পাই, তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য— এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে, একে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মানতে চায় না। এখানে সমুদ্রপর্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না বারংবার নিষ্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না ;— এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে।

মানুষ-যে দ্বিজ ; তার জন্মক্ষেত্র দুই জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর-এক জায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করছে, সেজন্যে তাকে চতুর্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম করতে হয় তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই ক'রে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি— এমন কি, তাকেই বেশি আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড়ো করে তোলে তখন সব দিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে, গোপনের দিকে, গভীরতার দিকে, মানুষের চেষ্টাকে যখন টানে তখনি মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে,— ভূমার দিকে অগ্রসর হয়,— তখনি মানুষের চিত্ত সর্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা সুগম, যা প্রত্যক্ষ, তাতে মানুষের সমস্ত চেতনাকে উদ্যম দিতে পারে না, এইজন্য কেবলমাত্র সেই দিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত ; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে— সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক ; সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহালোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা-কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না— তাকে মাপ ক'রে ওজন ক'রে দেখবার কোনো উপায়ই নেই— তাকে যদি কোনো স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি অস্বীকার করে বসে, যদি বলে, 'কী তুমি পেলে একবার দেখি'— তা হলে বিষম সংকটে পড়তে হয়। এমন কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই

যার প্রতিষ্ঠা তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূল আবদার চলে না। আমরা দেখাতে পারি, ভারি জিনিস হাত থেকে পড়ে যায় কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারি নে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে, 'আমি সমুদ্র দেখব, আমি হিমালয় পর্বত দেখব', তবে তাকে এ-কথা বলতে হয় না যে, 'আগে তোমার চোখদুটোকে মস্ত-বড়ো করে তোলো তবে তোমাকে পর্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব'— কিন্তু সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বলতেই হয়, 'একটু রোসো ; গোড়া থেকে শুরু করতে হবে ; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত করো তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ চোখ মেললেই চলবে না, কান খুললেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।' মূঢ় যদি বলে, 'না, আমি সাধনা করতে রাজী নই, আমাকে তুমি এ-সমস্তই চোখে-দেখা কানে-শোনার মতো সহজ করে দাও', তবে তাকে হয় মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয় তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে গণ্য করতে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখাশোনার সামগ্রী করে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। এই আবদার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেক-সময় খুঁজে থাকি, কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, 'আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজে করে দিচ্ছি'— ব'লে সেই যিনি নিহিতং গুহায়াং তাঁকে আমাদের চোখের সমুখে যেমন-খুশি একরকম করে দাঁড় করিয়ে দেন, তা হলে বলতেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন। এ-রকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বলবার কথা যে, মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর ব'লেই তাঁকে চায়— সেই গভীর আনন্দ আর-কিছুতে মেটাতে পারে না ব'লেই তাঁকে চায়— চোখে-দেখা কানে-শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে, তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটা তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে সমস্ত-কিছু চায় না ব'লেই একাগ্রমনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর সাধনা করো— এবং যখন তাঁকে পাবে, তোমার 'গুহাশয়' রূপেই তাঁকে পাবে ; অন্য রূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না ; সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা নাম দিয়ে চাচ্ছে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্ছে, তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না— তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্ছে। যিনি ভূমা, সর্বত্রই তিনি গুহাহিতং, কি সাহিত্যে কি ইতিহাসে, কি শিল্পে কি ধর্মে কি কর্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়ো, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার

মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য— ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, এই কথাটি-যে মানুষ বলতে পেরেছে, এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এইজন্যেই সে গভীরকে চায়— তবু যদি তুমি বল, 'আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও', তবে তুমি আর-কিছুকে চাচ্ছ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনছি, অনায়াসে বুঝছি, তার মতো কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতিপ্রত্যক্ষ-গোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজদেখাশোনার আবরণ ভেদ করেই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা-কিছু পাওয়ার মতো পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ ক'রে তবে কর্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধাতৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মতো সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি; এইজন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে—বারংবার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে পারছে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে; ভালোবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই অকৃতকার্য হ'ক, একে সে কোনোমতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না; তাকে বলতেই হবে, 'যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য, তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্যসাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন— কেননা, তার পক্ষে নাল্পে সুখমস্তি।'

জ্ঞানে ভাবে কর্মে মানুষের পক্ষে সর্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে সর্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম ক'রে গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে থাকে, তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা ক'রে আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে এ-কথা বলে না, 'টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে।'— টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয়; টাকা ঢেলার মতো সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উলটা কথা বলতে যাব। কেন বলব, 'তাঁকে

আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই।' কেন বলব, 'আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ ক'রে তাঁকে হাতে হাতে চোখে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব।'

না, কখনো তা আমরা চাই নে। তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই, জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পেয়েছি, এমনি করে সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠছে। হে গূঢ়, তুমি গূঢ়তম বলেই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্মকে গভীর হতে গভীরতরে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্ছে, তার বন্ধন আলগা করে দিচ্ছে, তার জীবনমরণের তুচ্ছতা দূর করছে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাঁশির মধুরতম গভীরতম স্বর আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্ত তোমার ওই অনির্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের সুধায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। মানবচিত্তের এই আকাঙ্ক্ষার আবেগ, এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমনি করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে চলেছ। হে গুহাহিত, তোমার গোপনতার শেষ নেই বলেই জগতের যত প্রেমিক যত সাধক যত মহাপুরুষ তোমার গভীর আহ্বানে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন; এমন মধুর করে তাঁরা দুঃখকে অলংকার করে পরেছেন, মৃত্যুকে মাথায় করে বরণ করেছেন। তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেছে, তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটচ্ছে— তারা বল তেজ সম্পদ সমস্ত হারিয়েছে— তাদের চেষ্টা ও চিন্তা কেবলি ছোটো ও জগতে তাদের সমস্ত অধিকার কেবলি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্বল কল্পনা করে তোমাকে যারা সুলভ করতে চেয়েছে, তারা মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ গৌরবকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে।

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারি চিরন্তন বন্ধু; প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ— সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি। তোমাদের ওই পরম

সত্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই তার কাব্য সংগীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চলব,— আমার সমস্ত যাত্রাসংগীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে,— পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে, কোনো ছোটোকে, কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে,— আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সংকল্প ত্যাগ ক'রে যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে না দেয়।

২৩ চৈত্র ১৩১৬

দুর্লভ

ঈশ্বরের মধ্যে মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এই কথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

'পারি নে' যখন বলি তার অর্থ এই, সহজে পারি নে; যেমন করে নিশ্বাস গ্রহণ করছি, কোনো সাধনার প্রয়োজন হচ্ছে না, ঈশ্বরকে তেমন করে আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণ করতে পারি নে।

কিন্তু গোড়া থেকেই মানুষের পক্ষে কিছুই সহজ নয়; ইন্দ্রিয়বোধ থেকে আরম্ভ করে ধর্মবুদ্ধি পর্যন্ত সমস্তই মানুষকে এত সুদূর টেনে নিয়ে যেতে হয় যে মানুষ হয়ে ওঠা সকল দিকেই তার পক্ষে কঠিন সাধনার বিষয়। যেখানে সে বলবে 'আমি পারি নে' সেইখানেই তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি ক্ষয় হয়ে যাবে, তার দুর্গতি আরম্ভ হবে; সমস্তই তাকে পারতেই হবে।

পশুশাবককে দাঁড়াতে এবং চলতে শিখতে হয় নি। মানুষকে অনেকদিন ধরে বারবার উঠে পড়ে তবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে; 'আমি পারি নে' বলে সে নিষ্কৃতি পায় নি। মাঝে-মাঝে এমন ঘটনা শোনা গেছে, পশুমাতা মানবশিশুকে হরণ করে বনে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। সেই-সব মানুষ জন্তুদের মতো হাতে পায়ে হাঁটে। বস্তুত তেমন করে হাঁটা সহজ। সেইজন্য শিশুদের পক্ষে হামাগুড়ি দেওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষকে উপরের দিকে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই খাড়া

হয়ে দাঁড়ানো থেকেই মানুষের উন্নতির আরম্ভ। এই উপায়ে যখনি সে আপনার দুই হাতকে মুক্তিদান করতে পেরেছে তখনি পৃথিবীর উপরে সে কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু শরীরটাকে সরল রেখায় খাড়া রেখে দুই পায়ের উপর চলা সহজ নয়। তবু জীবনযাত্রার আরম্ভেই এই কঠিন কাজকেই তার সহজ করে নিতে হয়েছে; যে মাধ্যাকর্ষণ তার সমস্ত শরীরের ভারকে নীচের দিকে টানছে, তার কাছে পরাভব স্বীকার না করবার শিক্ষাই তার প্রথম কঠিন শিক্ষা।

বহু চেষ্টায় এই সোজা হয়ে চলা যখন তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়াল, যখন সে আকাশের আলোকের মধ্যে অনায়াসে মাথা তুলতে পারল, তখন জ্যোতিষ্কবিরাজিত বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে সে আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আনন্দ ও গৌরব লাভ করলে।

এই যেমন জগতের মধ্যে চলা মানুষকে কষ্ট করে শিখতে হয়েছে, সমাজের মধ্যে চলাও তাকে বহু কষ্টে শিখতে হয়েছে। খাওয়া পরা, শোওয়া বসা, চলা বলা, এমন কিছুই নেই যা তাকে বিশেষ যত্নে অভ্যাস না করতে হয়েছে। কত রীতিনীতি নিয়ম-সংযম মানলে তবে চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান, তার প্রয়োজন ও আনন্দের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ও সহজ হতে পারে। যতদিন তা না হয় ততদিন তাকে পদে পদে দুঃখ ও অপমান স্বীকার করতে হয়— ততদিন তার যা দেবার ও তার যা নেবার উভয়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

জ্ঞানরাজ্যে অধিকারলাভের চেষ্টাতেও মানুষকে অল্প ক্লেশ পেতে হয় না। যা চোখে দেখছি, কানে শুনছি, তাকেই আরামে স্বীকার করে গেলেই মানুষের চলে না। এইজন্যেই বিদ্যালয় বলে কত বড়ো একটা প্রকাণ্ড বোঝা মানুষের সমাজকে বহন করে বেড়াতে হয়— তার কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা! জীবনের প্রথম কুঁড়িপঁচিশ বছর মানুষকে কেবল শিক্ষা সমাধা করতেই কাটিয়ে দিতে হয় এবং যাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, সমস্ত জীবনেও তাদের শিক্ষা শেষ হয় না।

এমনি সকল দিকেই দেখতে পাই, মানুষ মনুষ্যত্বলাভের সাধনায় তপস্যা করছে। আহারের জন্যে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে চাষ করাও তার তপস্যা, আর নক্ষত্রলোকের রহস্য ভেদ করবার জন্যে আকাশে দূরবীন তুলে জেগে থাকাও তার তপস্যা।

এমনি প্রাণের রাজ্যেই বল, জ্ঞানের রাজ্যেই বল, সামাজিকতার রাজ্যেই বল, সর্বত্রই আপনার পূর্ণ অধিকার লাভ করবার জন্যে মানুষকে প্রাণপণ করতে হয়েছে। যারা বলেছে 'পারি নে', তারাই নেবে গিয়েছে। যা সহজ না, তারি মধ্যে মানুষকে সহজ হতে হবে— সহজের প্রকাণ্ড মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে তাকে সর্বত্রই উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম থেকেই সহজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, অনাবশ্যক দুঃসাধ্যসাধনও তাকে আনন্দ দেয়। আর-কোনো প্রাণীর মধ্যেই এই অদ্ভুত জিনিসটা নেই। যেটা সহজ, যেটা আরামের, তার ব্যতিক্রম দেখলে অন্য কোনো প্রাণী সুখ বোধ করতে পারে না। অন্য প্রাণীরা যে লড়াই করে, সে কেবল প্রয়োজনসাধনের জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে, অর্থাৎ দায়ে পড়ে; সে লড়াই গায়ে পড়ে দুঃসাধ্যসাধনের জন্যে নয়। কিন্তু মানুষই কেবলমাত্র কঠিন কাজকে সম্পন্ন করাতেই বিশেষ আনন্দ পায়।

এইজন্যেই যে-ব্যায়ামকৌশলে কোনো প্রয়োজনই নেই, সেটা দেখা মানুষের একটা আমোদের অঙ্গ। যখন শুনতে পাই বারংবার পরাস্ত হয়েও মানুষ উত্তরমেরুর তুষার মরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে আপনার জয়পতাকা পুঁতে এসেছে, তখন এই কার্যের লাভ সম্বন্ধে কোনো হিসাব না করেও আমাদের ভিতরকার তপস্বী মনুষ্যত্ব পুলক অনুভব করে। মানুষের প্রায় প্রত্যেক খেলার মধ্যেই শরীর বা মনের একটা-কিছু কষ্টের হেতু আছে— এমন একটা কিছু আছে যা সহজ নয় বলেই মানুষের পক্ষে সুখকর।

যখন কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে 'পারি নে' এ-কথাটা বলতে দেওয়া হয় নি, তখন ব্রহ্মের মধ্যে মানুষ সহজ হবে, সত্য হবে, এ সম্বন্ধেও 'পারি নে' বলা তার চলবে না। সকল শ্রেষ্ঠতাতেই চেষ্টা করে তাকে সফল হতে হয়েছে, আর যেটা সকলের চেয়ে পরম শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই সে নিতান্ত সামান্য চেষ্টা করেই যদি ফল না পায়, তবেই এ-কথা বলা তার সাজবে না যে, 'আমার দ্বারা একেবারে সাধ্য নয়'।

যতই সহজ ও যতই আরামের হ'ক, তবু আমরা কেবল মাটির দিকেই মাথা করে পশুর মতো চলে বেড়াব না, মানুষের ভিতর এই একটি তাগিদ ছিল বলেই মানুষ যেমন বহু চেষ্টায় আকাশে মাথা তুলেছে— এবং সেই আকাশে মাথা তুলেছে ব'লে পৃথিবীর অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয় নি, বরঞ্চ পশুর থেকে তার অধিকার অনেক বৃহৎভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনই আমাদের মনের অন্তরতম দেশে আর-একটি গভীরতম উত্তেজনা আছে, আমরা কেবলই সংসারের দিকে মাথা রেখে সমস্ত জীবন ঘোর বিষয়ীর মতো ধুলা ঘ্রাণ করে করেই বেড়াতে পারব না— অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব। যদি তাই করি, তবে সংসার থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব না বরঞ্চ সংসারে আমাদের অধিকার বৃহৎ হবে, সত্য হবে, সার্থক হবে। তখন মুক্তভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করতে পারব বলেই সংসারে আমাদের যথার্থ কর্তৃত্ব প্রশস্ত হবে।

জন্তু যেমন চার পায়ে চলে ব'লে হাতের ব্যবহার পায় না, তেমনি বিষয়ীলোক সংসারে চার পায়ে চলে ব'লে কেবল চলে মাত্র, সে ভালো করে কিছুই দিতে পারে না এবং নিতে পারে না। কিন্তু যাঁরা সাধনার জোরে ব্রহ্মের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখেছেন, তাঁদের হাত পা উভয়ই মাটিতে বদ্ধ নয়— তাঁদের দুই হাত মুক্ত হয়েছে— তাঁদের নেবার শক্তি এবং দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে— তাঁরা কেবলমাত্র চলেন তা নয়, তাঁরা কর্তা, তাঁরা সৃষ্টিকর্তা।

যে সৃষ্টিকর্তা সে আপনাকে সর্জন করে ; আপনাকে ত্যাগ করেই সে সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে। যে-পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টিশক্তি। এই সৃষ্টিশক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। তিনি বন্ধনহীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি। আমাদের চিত্ত যে-পরিমাণে স্বার্থবর্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, সেই পরিমাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিন্তা, তার কর্ম সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

যাঁরা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রহ্মের মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিখেছেন, তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে। এই আসক্তিবন্ধনহীন আত্মত্যাগের অব্যাহত শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিকলোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের জোরে সর্বত্রই তাঁরা রাজা। এই অধিকারই মানুষের পরম অধিকার। এই অধিকারের মধ্যেই মানুষের চরম স্থিতি। এইখানে মানুষকে 'পারি নে' বললে চলবে না ;— চিরজীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হয় তবু তার মহতী বিনষ্টিঃ।

যে-ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই নিজেকে উৎসর্জন করছে, যিনি 'আত্মদা', আমি জলে-স্থলে-আকাশে সুখে-দুঃখে সর্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি, এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুলতে হবে। এই সাধনার ধ্যানই হচ্ছে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্ছে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চলতে শেখা। অনেকবার টলতে হবে, বারবার পড়তে হবে, কিন্তু তাই বলে ভয় করলে হবে না 'তবে বুঝি পারব না'। পারবই, নিশ্চয়ই পারব। কেননা অন্তরের মধ্যে এই দিকেই মানুষের একটা প্রেরণা আছে,— এইজন্যে মানুষ দুঃসাধ্যতাকে ভয় করে না, তাকে বরণ করে নেয়,— এইজন্যেই মানুষ এতবড়ো একটা আশ্চর্য কথা ব'লে জগতের অন্য-সকল প্রাণীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।

জন্মোৎসব

বক্তার জন্মদিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎসব করে আমাকে আহ্বান করেছ,— এতে আমার অনেকদিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেকদিন আমার মনে জাগে নি। কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড়ো করে আমার কাছে প্রকাশ করে নি।

বস্তুত, নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড়ো নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

যেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, সেদিন নূতন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল, সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্য থেকে আমাদের সদ্য আবির্ভাবকে যাঁরা একটি পরমলাভ বলে মনে করেছিলেন, উৎসব তাঁদেরি। আনন্দলোক থেকে একটি আনন্দ-উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে বড়ো করে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁদের উৎসব।

এই উপলব্ধি চিরকাল সকলের কাছে সমান নবীন থাকে না। অতিথি ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে,— সংসারে তার আবির্ভাব-যে পরমরহস্যময় এবং সে-যে চিরদিন এখানে থাকবে না, সে-কথা ভুলে যেতে হয়। বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই প্রায় চলে যেতে থাকে— মনে হয়, তার ক্ষতিও নেই বৃদ্ধিও নেই, সে আছে তো আছেই— তার মধ্যে অন্তরের প্রকাশ আর আমরা দেখতে পাই নে। তখন যদি আমরা উৎসব করি, সে বাঁধা প্রথার উৎসব— সে এক-রকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে, ততক্ষণ তাকে আমরা নূতন করেই দেখি; তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়।

জীবনে একটা বয়স আসে যখন মানুষের সম্বন্ধে আর নূতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না; তখন সে যেন আমাদের কাছে এক-রকম ফুরিয়ে আসে। সে-রকম অবস্থায় তাকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চলতে পারে কিন্তু উৎসব চলতে পারে না; কারণ, উৎসব জিনিসটাই হচ্ছে নবীনতার উপলব্ধি— তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচ্ছে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেইখানেই তার প্রকাশ।

আজ আমি উনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ছে যখন আমার জন্মদিন নবীনতার উজ্জ্বলতায় উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে 'আজ তোমার জন্মদিন'। আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ, সেই-রকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য সেদিন অনুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজনমাত্র, সেদিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত— নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেহদৃষ্টির পথ বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম, তখন আমার জীবনের দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তার অনাবিষ্কৃত রহস্যলোক থেকে এমন একটি বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত দুলে উঠত। বস্তুত, জীবন তখন আমার সামনেই— পিছনে তার অতি অল্পই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল, তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়সের অল্প কয়েকটি অতীত বৎসরকে গানের ধুয়াটির মতো অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যৎ তার উপরে অনির্বচনীয়ের তান লাগাতে থাকত।

পথ তখন নির্দিষ্ট হয় নি। নানা দিকে তার শাখাপ্রশাখা। কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গেলে কী পাব, তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্য অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষ-ভাবে জাগ্রত হয়ে উঠত।

ঝরনা যখন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে, তখন নিজের সুবিধার পথ বের করতে তাকে নানা দিকে নানা গতিপরিবর্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যখন তার পথ সুনির্দিষ্ট হয়, তখন নূতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমারো জীবনের ধারা যখন ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি তৈরি করে নিলে, তখন বর্ষার বন্যার বেগও সেই পথেই স্ফীত হয়ে বইতে লাগল এবং গ্রীষ্মের রিক্ততাও সেই পথেই সংকুচিত হয়ে চলতে থাকল। তখন নিজের জীবনকে

বারম্বার আর নূতন করে আলোচনা করবার দরকার রইল না। এইজন্যে তখন থেকে জন্মদিন আর-কোনো নূতন আশার সুরে বাজতে থাকল না। সেইজন্যে জন্মদিনের সংগীতটি যখন নিজের ও অন্যের কাছে বন্ধ হয়ে এল, তখন আস্তে আস্তে উৎসবের প্রদীপটিও নিবে এল। আমার বা আর-কারো কাছে এর আর-কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

এমনসময় আজ তোমরা যখন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে, তখন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সংকোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম তো আমার অর্ধ শতাব্দীর প্রান্তে কোথায় পড়ে রয়েছে, সে-যে কবেকার পুরানো কথা তার আর ঠিক নেই— মৃত্যুদিনের মূর্তি তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে এসেছে— এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়স কি আমার।

এমনসময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল, এবং সেই কথাটাই তোমাদের সামনে আমি বলতে ইচ্ছা করি।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে। জগতে আমরা অনেক জিনিসকে চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই ; কিন্তু অতি অল্প জিনিসকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ— তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক ; তারা আমাদের চারিদিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাই নি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বলছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্ছে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত-কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্তেই আপনার লোককে পায়,— পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই সে যেন চিরন্তন। অল্পকাল পূর্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না— না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে ; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার, কোনো দেখাসাক্ষাৎ আনাগোনার কোনো প্রয়োজন হয় নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মতো আপন করে পাওয়া যায়, তখনো এই সাজসজ্জা, এই গীতবাদ্য। 'তুমি আমার আপন' এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলতে পারে না— এতে সৌন্দর্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল 'তোমাকে আমরা পেয়েছি'— সেইদিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ওই একই কথা আওড়াতে চায় যে, 'তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি-যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।'

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে-উৎসব করছ, তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা হলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয়, তা বলতে পারি নে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়— তেমনি মানুষকে বারবার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম— কোন্ রহস্যধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম, কে জানে। কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপমায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মতো আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর-একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে। সেইজন্যেই আজকের এই আনন্দ।

আমার প্রথম বয়সে, সেই পূর্বজীবনের মধ্যে আজকের এই নবজন্মের সম্ভাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে, তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাতলোক ছিল।

সেইজন্যে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকালে তোমাদের আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করছি।

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি, এ আমার

সংসারলোক নয়, এ মঙ্গললোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর-একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর-এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্ছে কেন্দ্রবর্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্রত্ব ঘুচে যায়— এখানে সে অনেকের অন্তর্বর্তী। স্বার্থলোকেও আমিই হচ্ছি কেন্দ্র, অন্য-সমস্ত তার পরিধি,— মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র নই, আমি সমগ্রের অন্তর্বর্তী; সুতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালোমন্দেই তার ভালোমন্দ।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একেবারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে, তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারি নে; মায়ের কোলেই, ঘরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

বাইরের দিক থেকে এ যেমন, অন্তরের দিক থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেই-রকমের একটি ক্রমবিকাশ আছে। ঈশ্বর যখন স্বার্থের জীবন থেকে আমাদের মঙ্গলের জীবনে এনে উপস্থিত করেন, তখন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারি নে। ভ্রূণত্বের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠি নে। তখন আমরা চলতে চাই, কারণ চারিদিকে চলার ক্ষেত্র অবাধ-বিস্তৃত— কিন্তু চলতে পারি নে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্ছে দ্বন্দ্বের অবস্থা। শিশুর মতো চলতে গিয়ে বারবার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয়; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার এই সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঙ্গললোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু শিশু যখন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুয়ে-ঘুমিয়েই কাটাচ্ছে তখনো যেমন জানা যায়, সে এই চলা-ফেরা-জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে বয়স্কদের সাংসারিক সম্বন্ধ অনুভব করতে কোনো সংশয়মাত্র থাকে না, তেমনি যখন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তখন পদে পদে আমাদের

জড়ত্ব ও অকৃতার্থতা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের ক্ষেত্রপরিবর্তন হয়েছে, সে কথা এক-রকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন কি, জড়তার সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার বহুতরো বিরোধের দ্বারাই সেই খবরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত, স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যখন শয়ান থাকে, তখন সে দ্বিধাহীন আরামের মধ্যেই কালযাপন করে। এর থেকে যখন প্রথম মুক্তিলাভ করে, তখন অনেক দুঃখ-স্বীকার করতে হয়, তখন নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়।

তখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয়, কারণ এ লোকের জীবনই হচ্ছে ত্যাগ। তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকে না, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তখন তার মন যা বলে, তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে; তার অন্তরাত্মা যে-ডালকে আশ্রয় করে, তার ইন্দ্রিয় তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে; যে-শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রে সে অহংকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, অহংকার গোপনে সেই শ্রেয়কেই আশ্রয় ক'রে গভীরতররূপে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি ক'রে প্রথম অবস্থায় বিরোধ-অসামঞ্জস্যের বিষম ধন্দের মধ্যে পড়ে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না।

আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি, এখানে আমার পূর্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এই-জন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঠির মুখে যে-আলো একটুখানি দেখা দিয়েছিল, সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু এ-কথা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহই অগোচর নেই যে, এই নূতন জীবনকে আমি শিশুর মতো আশ্রয় করেছি মাত্র, বয়স্কের মতো একে আমি অধিকার করতে পারি নি। তবু আমার সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসংগতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এসেছি, সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ— একটি মঙ্গললোকের সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি, সেইটে তোমরা হৃদয়ে জেনেছ— এবং সেইজন্যেই আজ তোমরা আমাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছ, এ-কথা যদি সত্য হয়, তবেই আমি আপনাকে ধন্য বলে মনে করব; তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নূতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এইসঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে করতে হবে, যে-লোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ, এ লোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জানতে পারতে

না। এই আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজত্বের জন্মস্থান। ঝরনাগুলি যেমন পরস্পরের অপরিচিত নানা সুদূর শিখর থেকে নিঃসৃত হয়ে, একটি বৃহৎ ধারায় সম্মিলিত হয়ে নদী-জন্ম লাভ করে— তোমাদের ছোটো ছোটো জীবনের ধারাগুলি তেমনি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে— তারা এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার ক'রে একটি সম্মিলিত প্রশস্ত মঙ্গলের গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জানতে— সেই জানার সংকীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছ— এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ, এই হচ্ছে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশগৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্তসম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোনো সংকীর্ণ ব্যবধান নেই ; এখানে তিনিই পিতা হয়ে, প্রভু হয়ে আছেন— য একঃ, যিনি এক,— অবর্ণঃ, যাঁর জাতি নেই,— বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজনসকল বিধান করছেন,— বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি,— স দেবঃ, সেই দেবতা। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয়বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে-যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

২৫ বৈশাখ ১৩১৭

শ্রাবণসন্ধ্যা

আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর-যত-কিছু কথা আছে, সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়— এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না, সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিকমতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে, তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্‌ ঝর্‌ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে

পেয়েছে। বারবার তাকে ধ্বনিত করে তুলছে— শিশু তার নূতনশেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে সেই-রকম— তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই-যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে— সেও কিছু-একটা বলতে চাচ্ছে।— ওই-রকম খুব বড়ো করেই বলতে চায়, ওই-রকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়,— কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা-কিছু কথা সে তো স্পষ্ট কথায় নয়— সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এইজন্যে প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে, তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয়, তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়— সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাতসন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে। প্রকৃতি হতে রঙ এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুলছে, প্রকৃতি হতে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুলছে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মানুষের মনের জিনিসগুলি বিশেষ প্রয়োজনের সংকোচ এবং নিত্যব্যবহারের মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন সরস নবীন এবং মহৎ মূর্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে

আঘাত করছে। আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

তাই আমি বলছি, আমার কথা আজ থাক্। সংসারের কাজকর্মের সীমাকে, মনুষ্যলোকালয়ের বেড়াকে একটুখানি সরিয়ে দাও, আজ এই আকাশভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে নেও।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাহিরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক-রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর-এক মূর্তি।

একটা দৃষ্টান্ত দেখো— গাছের ফুল। তাকে দেখতে যতই শৌখিন হ'ক, সে নিতান্তই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজসজ্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হ'ক, তাকে ফল ফলাতেই হবে, নইলে তরুবংশ পৃথিবীতে টিঁকবে না, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যাবে। এইজন্যেই তার রঙ, এইজন্যেই তার গন্ধ। মৌমাছির পদরেণুপাতে যেমনি তার পুষ্পজন্ম সফলতালাভের উপক্রম করে, অমনি সে আপনার রঙিন পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধুগন্ধ নির্মমভাবে বিসর্জন দেয়; তার শৌখিনতার সময়মাত্র নেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রকৃতির বাহিরবাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে হন্‌হন্ করে ছুটে চলেছে,— যেখানে একটু বাধা পায় সেখানে আর মাপ নেই, সেখানে কোনো কৈফিয়ৎ কেউ গ্রাহ্য করে না, সেখানেই তার কপালে ছাপ পড়ে যায় 'নামঞ্জুর', তখনি বিনা বিলম্বে খসে ঝরে শুকিয়ে সরে পড়তে হয়। প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার ওই ফুলটিকে যে দেখছ, অত্যন্ত বাবুর মতো গায়ে গন্ধ মেখে রঙিন পোশাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্যে এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়, বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে, তখন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মূর্তিমান। এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, 'তুমি ভুল বুঝছ— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য কাজ করা; তার সঙ্গে সৌন্দর্যমাধুর্যের যে-অহেতুক সম্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ, সে তোমার নিজের পাতানো।'

আমাদের হৃদয় উত্তর করে, 'কিছুমাত্র ভুল বুঝি নি। ওই ফুলটি কাজের পরিচয়পত্র নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্যের পরিচয়পত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে

আঘাত করে— একদিকে আসে বন্দীর মতো, আর-একদিকে আসে মুক্তস্বরূপে— এর একটা পরিচয়ই যে সত্য আর অন্যটা সত্য নয়, এ-কথা কেমন করে মানব। ওই ফুলটি গাছপালার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কার্যকারণসূত্রে ফুটে উঠেছে, এ-কথাটাও সত্য কিন্তু সে তো বাহিরের সত্য,— আর অন্তরের সত্য হচ্ছে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।'

ফুল মধুকরকে বলে, 'তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আম তোমার জন্যেই সেজেছি'— আবার মানুষের মনকে বলে, 'আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি।' মধুকর ফুলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে কিছুমাত্র ঠকে নি, আর মানুষের মনও যখন বিশ্বাস ক'রে তাকে ধরা দেয় তখন দেখতে পায় ফুল তাকে মিথ্যা বলে নি।

ফুল-যে কেবল বনের মধ্যেই কাজ করছে তা নয়— মানুষের মনের মধ্যেও তার যেটুকু কাজ, তা সে বরাবর করে আসছে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কী। প্রকৃতির দরজায় যে-ফুলকে যথাঋতুতে যথা-সময়ে মজুরের মতো হাজরি দিতে হয়, আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজদূতের মতো উপস্থিত হয়ে থাকে।

সীতা যখন রাবণের ঘরে একা বসে কাঁদছিলেন তখন একদিন যে-দূত তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সে রামচন্দ্রের আংটি সঙ্গে করে এনেছিল; এই আংটি দেখেই সীতা তখনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই দূতই তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে,— তখনি তিনি বুঝলেন, রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উদ্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি, রাক্ষস আমাদের কেবলি বলছে, 'আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।'

কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ওই ফুল। সে চুপিচুপি আমাদের কানে কানে এসে বলে, 'আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, তিনি তোমাকে একমুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারবে না।'

যদি তখন আমরা জেগে থাকি তো তাকে বলি, 'তুমি যে তাঁর দূত তা আমরা

জানব কী করে।' সে বলে, 'এই দেখো আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রঙ, এর কেমন শোভা।'

তাই তো বটে। এ-যে তাঁরি আংটি, মিলনের আংটি। আর-সমস্ত ভুলিয়ে তখনি সেই আনন্দময়ের আনন্দস্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তখনি আমরা বুঝিতে পারি, এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয়— এর বাইরে আমার মুক্তি আছে— সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবলমাত্র রঙ, কেবলমাত্র গন্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির পথ চেনবার উপায়চিহ্ন, মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য, তাই বিনা-প্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙিন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বলছিলুম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হ'ক-না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানা-ঘরের কলশব্দ সংগীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্যকারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্ ঝম্ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে— একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির— একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের— বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি— একই সময়ে একদিকে তার কর্ম, আর-একদিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই-যে এই মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে, এই অন্ধকারসভায় আমাদের কাছে এ-কথাটির কোনো আভাসমাত্র সে দিচ্ছে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলি করুণ গান জেগে উঠছে—

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, 'ওরে, তুই-যে বিরহিণী— তুই বেঁচে আছিস কী করে, তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে।'

সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।

আমরা যে তাঁরি বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি, এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেননা বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া যেমন আগুন জ্বলার আরম্ভ, বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।

খবর আমাদের দেয় কে। ওই-যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করছে, তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, তারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর-একজন বাঁধা থেকে দিনরাত্রি কেবল বোবার মতো কাজ করে যাচ্ছে— তারাই। যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অমনি দেখতে পাই, এ-যে বিরহের বেদনাগান, এ-যে মিলনের আহ্বানসংগীত। যে-সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না, সে-সব খবরকে এরাই তো চুপি চুপি বলে যায়— এবং মানুষ কবি সেই-সব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায়, কতকটা সুরে, বেঁধে গাইতে থাকে :

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আজ কেবলি মনে হচ্ছে এই-যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার— তারি দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।' কিন্তু তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়;— এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য— যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে, তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।

বিরহসন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে, 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে', তা হলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না ;— কিন্তু শুধু কেমন করে কাটবে নয় তো, কেমন করে কাটবে **হরি বিনে** দিনরাতিয়া— সেইজন্যে ঐ 'হরি বিনে' কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে —তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে— বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে— সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। এই জীবন-ব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারি মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।

দ্বিধা

দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর-একদিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তারি সামঞ্জস্যসংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যত-কিছু অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান শিক্ষা-দীক্ষা সাহিত্যশিল্প সমস্তই হচ্ছে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয়চেষ্টার বিচিত্র ফল।

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই হচ্ছে উন্নতির মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাক-স্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিসের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই দুটোকে এক করবার জন্যে বহু দুঃখে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্বদাই জাগিয়ে রেখেছে ; গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে— ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্যসাধনের জন্যে তাকে নিরন্তর দুঃখ পেতে হয় না। জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্যসাধনের দুঃখ থেকে কত বীরত্ব ও কত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার আর সীমা নেই ; উদ্ভিদরাজ্যে যেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নেই অথবা যেখানে তার মিলন-সাধনের জন্যে বাইরের উপায় কাজ করে, সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সমস্ত সহজ।

মনুষ্যত্বের মূলে আর-একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে ; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি

এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক— এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।

যতদিন ভালো করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থান-পতনের দুঃখ, সে বড়ো বিষম দুঃখ। যে-ধর্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে, সেই ধর্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা ;— এ-কথা তার বলবার জো নেই যে, 'এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চলব।' এই দুঃখকে যে স্বীকার না করে তাকে দুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয় ;— সেই দুর্গতি যে কী নিদারুণ, পশুরা তা কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই— তারা কেবলমাত্র পশু। তারা কেবলমাত্র শরীর-ধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চলবে, এতে তাদের কোনো ধিক্কার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃসংকোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সংকোচ। শিশুকাল থেকেই মানুষকে কত লজ্জা, কত পরিতাপ, কত আবরণ-আড়ালের মধ্যে দিয়েই চলতে হয়— তার আহার বিহার তার নিজের মধ্যেই কত বাধাগ্রস্ত— নিতান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার পক্ষে কত কঠিন, এমন কি, নিজের নিত্যসহচর শরীরকেও মানুষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কারণ, মানুষ-যে পশু এবং মানুষ দুইই। একদিকে সে আপনার, আর-একদিকে সে বিশ্বের। একদিকে তার সুখ, আর-একদিকে তার মঙ্গল। সুখভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না কিন্তু সেখানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায় না। সেখানে তার হাত পা চোখ কান মুখ সমস্তই নিরর্থক। যদি জানতে পারি যে এই ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে, তা হলেই বুঝতে পারি, এ-সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কেন আছে। এই-সকল আপাত-অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকারবাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমাপ্তি,— বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কেবলমাত্র স্বার্থের মধ্যে, সুখভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না— উন্মুক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম না হয়, তবে সেই সমস্ত স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে-সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে দুর্নিবারবেগে অন্যের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, এমন-কি, জীবনে আসক্তির দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়— যা মানুষকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর

জ্ঞান ও মহত্ত্বর চেষ্টার দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে আকর্ষণ করে, যা মানুষকে বিনা কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃখকে স্বীকার করতে, সুখকে বিসর্জন করতে প্রবৃত্ত করে —তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, সুখে স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই— তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে— মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মানুষকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই স্বার্থের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই হচ্ছে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্যসাধন। কারণ, স্বার্থের মধ্যে আবৃত থাকলেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই, তখনি আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তখনি আমরা আপনাকে পাই বলেই অন্য-সমস্তকেই পাই। গর্ভের শিশু নিজেকে জানে না বলেই তার মাকে জানে না— যখনি মাতার মধ্য হতে মুক্ত হয়ে সে নিজেকে জানে, তখনি সে মাকে জানে।

সেইজন্যে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে, ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলি টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে সে যা গড়ে তুলবে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেলবে।

তখন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত। তখন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই— মা মা হিংসীঃ— আমাকে আঘাত কোরো না, আমাকে আর আঘাত কোরো না। আমি এমন করে কেবলি দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচি নে।

কিন্তু এ পিতারই হাতের আঘাত— এ মঙ্গললোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে পাপে দুঃখ থাকত না— পাপ বলেই কোনো পদার্থ থাকত না, মানুষ পশুদের মতো অপাপ হয়ে থাকত। কিন্তু, মানুষকে মানুষ হতে হবে বলেই এই দ্বন্দ্ব, এই বিদ্রোহ, বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

তাই-জন্যে মানুষ ছাড়া এ প্রার্থনা কেউ কোনোদিন করতে পারে না— বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব— হে দেব, হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও। এ ক্ষুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজনসাধনের প্রার্থনা নয়— মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে, 'আমাকে পাপ হতে মুক্ত করো। তা না করলে আমার দ্বিধা ঘুচবে না— পূর্ণতার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারছি নে— হে অপাপবিদ্ধ নির্মল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা, এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারছে না— তোমাকে সত্যভাবে নমস্কার করতে পারছি নে।'

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব— যা ভালো তাই আমাদের দাও। মানুষের পক্ষে এ প্রার্থনা অত্যন্ত কঠিন প্রার্থনা। কেননা মানুষ যে দ্বন্দ্বের জীব— ভালো যে মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব, এ আমাদের ত্যাগের প্রার্থনা, দুঃখের প্রার্থনা— নাড়ীছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর প্রার্থনা মানুষ ছাড়া আর-কেউ করতে পারে না।

পিতানোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু— যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা। তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা ব'লে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।

অর্থাৎ আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তা হলেই যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়— আমার যেখানে সার্থকতা সেইখানেই পৌঁছতে পারি। সেখানে যে পৌঁচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দ্বারাই চেনা যায় ;— সেখানে কোনো অহংকার টিঁকতেই পারে না— ধনী সেখানে দরিদ্রের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে মূঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয় ;— মানুষের দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান সেখানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহংকারের একান্ত বিসর্জন।

এই নমস্কারটি কেমন নমস্কার ?—

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

যিনি সুখকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার ; যিনি সুখের আকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার ; যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার, যিনি চরমমঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা ব'লে নমস্কার করছে, তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে। সংস্কৃতসাহিত্যে দেখা গেছে, পিতরৌ বলতে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একান্ত করে দেখেন— তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর-সমস্তকে অতিক্রম করে থাকে। এইজন্যে তাকে দেখাশোনা, তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো, তাকে সুখী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন

তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, বাইরেও তিনি যেন তার জন্যে একটি বৃহত্তর গর্ভবাস তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্যে সর্বপ্রকার আয়োজন করে থাকেন। মাতার এই একান্ত স্নেহে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশেষ মূল্য যেন অনুভব করে।

কিন্তু পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সংকীর্ণ পরিধির কেন্দ্রস্থলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মানুষ করে তোলবার জন্যেই চেষ্টা করেন। এইজন্যে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে দুঃখ দিতে হয়। সে যদি একমাত্র হত, নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত, তা হলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না; কিন্তু তাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়— তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোটো হয়ে না থেকে বড়ো হয়ে ওঠবার যে-দুঃখ তা তাকে না দিলে চলে না। বড়ো হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে-যে সত্য হবে— তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান, ভাব ও শক্তি সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকতাতেই সে যথার্থ মুক্তিলাভ করবে— এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মানুষ করে তোলাই পিতার কর্তব্য হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের মধ্যে এই মাতা পিতা এক হয়ে আছে। তাই দেখতে পাই, আমি সুখী হব বলে জগতে আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশের নীলিমা এবং পৃথিবীর শ্যামলতায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়— যদি নাও যেত তবু এই জগতে আমাদের বাস অসম্ভব হত না। ফলে শস্যে আমাদের রসনার তৃপ্তি হয়— যদি নাও হত তবু প্রাণের দায়ে আমাদের পেট ভরাতেই হত। জীবনধারণে কেবল-যে আমাদের বা প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, তাতে আমাদের আনন্দ; শরীরচালনা করতে আমাদের আনন্দ, চিন্তা করতে আমাদের আনন্দ, কাজ করতে আমাদের আনন্দ, প্রকাশ করতে আমাদের আনন্দ। আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য এবং রসের যোগ আছে।

তাই দেখতে পাই, বিশ্বচেষ্টার বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে এ চেষ্টাও নিয়ত রয়েছে যে, জগৎ চলবে, জীবন চলবে এবং সেইসঙ্গে আমি পদে পদে খুশী হতে থাকব। নক্ষত্রলোকের যে-সমস্ত প্রয়োজন তা যতই প্রকাণ্ড প্রভূত ও আমার জীবনের পক্ষে যতই সুদূরবর্তী হ'ক-না কেন, তবুও নিশীথের আকাশে আমার কাছে মনোহর হয়ে ওঠাও তার একটা কাজ। সেইজন্য অতবড়ো অচিন্তনীয় বিরাট কাণ্ডও প্রয়োজন-বিহীন গৃহসজ্জার মতো হয়ে উঠে আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আকাশমণ্ডপটিকে চুমকির কাজে খচিত করে তুলেছে।

এমনি পদে পদে দেখতে পাচ্ছি, জগতের রাজা আমাকে খুশী করবার জন্য তাঁর বহুলক্ষ যোজনান্তরেরও অনুচরপরিচরদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন ; তাদের সকল কাজের মধ্যে এটাও তারা ভুলতে পারে না। এ জগতে আমার মূল্য সামান্য নয়।

কিন্তু সুখের আয়োজনের মধ্যেই যখন নিঃশেষে প্রবেশ করতে চাই, তখন আবার কে আমাদের হাত চেপে ধরে, বলে যে, 'তোমাকে বদ্ধ হতে দেব না। এই-সমস্ত সুখের সামগ্রীর মধ্যে ত্যাগী হয়ে, মুক্ত হয়ে তোমাকে থাকতে হবে, তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই যথার্থভাবে সম্পূর্ণভাবে সচেতনভাবে তার মাকে পায়, তেমনি এই-সমস্ত সুখের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন মঙ্গললোকে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হবে, তখনি সমস্তকে পরিপূর্ণরূপে পাবে। যখনি আসক্তির পথে যাবে তখনি সমগ্রকে হারাবার পথেই যাবে— বস্তুকে যখনি চোখের উপরে টেনে আনবে, তখনি তাকে আর দেখতে পাবে না, তখনি চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের পিতা সুখের মধ্যে আমাদের বদ্ধ হতে দেন না, কেননা সমগ্রের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে— এবং সেই যোগের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার সত্য যোগ।

এই সমগ্রের সঙ্গে যাতে আমাদের যোগসাধন করে তাকেই বলে মঙ্গল। এই মঙ্গলবোধই মানুষকে কিছুতেই সুখের মধ্যে স্থির থাকতে দিচ্ছে না— এই মঙ্গলবোধই পাপের বেদনায় মানুষকে এই কান্না কাঁদাচ্ছে— মা মা হিংসীঃ, বিশ্বানি দেব সবিতর্-দুরিতানি পরাসুব, যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। সমস্ত খাওয়াপরার কান্না ছাড়িয়ে এই কান্না উঠেছে, 'আমাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে আর আঘাত কোরো না, আমাকে পাপ থেকে মুক্ত করো ; আমাকে সম্পূর্ণ তোমার মধ্যে আনন্দে নত করে দাও।'

তাই মানুষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করছে, নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ— সেই সুখকর যে তাঁকেও নমস্কার, আর সেই কল্যাণকর যে তাঁকেও নমস্কার— একবার মাতারূপে তাঁকে নমস্কার, একবার পিতারূপে তাঁকে নমস্কার। মানবজীবনের দ্বন্দ্বের দোলার মধ্যে চড়ে যেদিকেই হেলি সেইদিকে তাঁকেই নমস্কার করতে শিখতে হবে। তাই বলি, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ— সুখের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার— মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করছেন, পালন করছেন, তাঁকেও নমস্কার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অসীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করছেন, তাঁকেও নমস্কার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে— তখন নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ— তখন সুখে মঙ্গলে আর ভেদ

নেই, বিরোধ নেই— তখন শিব, শিব, শিব, তখন শিব এবং শিবতর— তখন পিতা এবং মাতা একই— তখন একমাত্র পিতা ;—এবং দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ঊর্ধ্বগামী একাগ্র এই নমস্কার, অস্তুত্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মতো দশদিগন্তব্যাপী বিপুল এই নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

১২

পূর্ণ

আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন ; আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।'

তাঁর সেই যৌবনকালের আরম্ভ, আর আমার এই প্রৌঢ়বয়সের প্রান্ত— এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই উনিশ বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে। তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা নেই।

যে-ছাত্র তার কলেজ-শিক্ষার প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌচেছে, সে যখন শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাত হাতে কোনো ছেলেকে পাঠশালায় যেতে দেখে, তখন তাকে মনে-মনে কৃপাপাত্রই বলে জ্ঞান করে। কেননা কলেজের ছাত্র এ-কথা নিশ্চয় জানে যে, ওই ছেলে শিক্ষার যে আরম্ভভাগে আছে সেখানে পূর্ণতার এতই অভাব যে, সেই শিশুশিক্ষা-ধারাপাতের মধ্যে সে রসের লেশমাত্র পায় না— অনেক দুঃখ ক্লেশ তাড়নার কাঁটাপথ ভেঙে তবে সে এমন জায়গায় এসে পৌছবে যেখানে তার জ্ঞান নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করতে করতে আনন্দিত হতে থাকবে।

কিন্তু মানুষের জীবন ব'লে যে-শিক্ষালয়টি আছে তার আশ্চর্য রহস্য এই যে, এখানকার পাঠশালার ছোটো ছেলেকেও এখানকার এম. এ. ক্লাসের প্রবীণ ছাত্র কৃপাপাত্র বলে মনে করতে পারে না।

তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারি নে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সব চেয়ে বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়ছে না ; এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে, সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।

মানুষের কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের কাজের এইখানে একটি প্রভেদ আছে। মানুষের ভারাবাঁধা অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের চারাগাছটি প্রবীণ বনস্পতির কাছেও দৈন্য প্রকাশ করে না। সেও সম্পূর্ণ,

সেও সুন্দর। সে যদি চারা অবস্থাতেই মারা যায়, তবু তার কোথাও অসমাপ্তি ধরা পড়ে না। ঈশ্বরের কাজে কেবল যে অন্তেই সম্পূর্ণতা তা নয়, তার সোপানে সোপানেই সম্পূর্ণতা।

একদিন তো শিশু ছিলুম, সেদিনের কথা তো ভুলি নি। তখন জীবনের আয়োজন অতি যৎসামান্য ছিল। তখন শরীরের শক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনা যেমন অল্প ছিল, তেমনি জীবনের ক্ষেত্র এবং উপকরণও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। ঘরের মধ্যে যে-অংশ অধিকার করেছিলুম তা ব্যাপক নয়, এবং ধুলার ঘর আর মাটির পুতুলই দিন কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

অথচ আমার সেই বাল্যের জীবন আমার সেই বালক আমির কাছে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। সে-যে কোনো অংশেই অসমাপ্ত, তা আমার মনেই হতে পারত না। তার আশাভরসা হাসিকান্না লাভক্ষতি নিজের বাল্যগণ্ডির মধ্যেই পর্যাপ্ত হয়ে ছিল।

তখন যদি বড়োবয়সের কথা কল্পনা করতে যেতুম, তবে তাকে বৃহত্তর বাল্যজীবন বলেই মনে হত— অর্থাৎ রূপকথা খেলনা এবং লজঞ্জুসের পরিমাণকে বড়ো করে তোলা ছাড়া আর-কোনো বড়োকে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করতুম না।

এ যেন ছবির তাসে ক খ শেখার মতো। কয়ে কাক, খয়ে খঞ্জন, গয়ে গাধা, ঘয়ে ঘোড়া। শুদ্ধমাত্র ক খ শেখার মতো অসম্পূর্ণ শেখা আর-কিছু হতেই পারে না। অক্ষরগুলোকে যোজনা করে যখন শব্দকে ও বাক্যকে পাওয়া যাবে, তখনি ক খ শেখার সার্থকতা হবে ; কিন্তু ইতিমধ্যে ক খ অক্ষর সেই কাকের ও খঞ্জনের ছবির মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ ক'রে শিশুর পক্ষে আনন্দকর হয়ে উঠে— সে ক খ অক্ষরের দৈন্য অনুভব করতেই পারে না।

তেমনি শিশুর জীবনে ঈশ্বর তাঁর জগতের পুঁথিতে যে-সমস্ত রঙচঙ-করা কখয়ের ছবির পাতা খুলে রাখেন, তাই বারবার উলটে-পালটে তার আর দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না। কোনো অর্থ, কোনো ব্যাখ্যা, কোনো বিজ্ঞান, কোনো তত্ত্বজ্ঞান তার দরকারই হয় না— সে ছবি দেখেই খুশী হয়ে থাকে ; মনে করে, এই ছবি দেখাই জীবনের চরম সার্থকতা।

তার পরে আঠারো বৎসর পেরিয়ে যেদিন উনিশে পা দিলুম, সেদিন খেলনা লজঞ্জুস ও রূপকথা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেদিন যে-ভাবরাজ্যের সিংহদ্বারের সমুখে এসে দাঁড়ালুম, সে একেবারে সোনার আভায় ঝল্‌মল্‌ করছে এবং ভিতর থেকে যে-একটি নহবতের আওয়াজ আসছে, তাতে প্রাণ উদাস করে দিচ্ছে। এতদিন ছিলুম বাইরে,

কিন্তু সাহিত্যের নিমন্ত্রণচিঠি পেয়ে মানুষের মানসলোকের রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা গেল। মনে হল, এই যথেষ্ট, আর-কিছুরই প্রয়োজন নেই।

এমনি করে মধ্যযৌবনে যখন পৌঁছনো গেল তখন বাইরের দিকে আর-একটা দরজা খুলে গেল। তখন এই মানসলোকের বাহিরবাড়িতে ডাক পড়ল। মানুষ যেখানে বসে ভেবেছে, আলাপ করেছে, গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে সেখানে নয়— ভাব যেখানে কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেই মস্ত খোলা জায়গায়। মানুষ যেখানে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, যেখানে অসাধ্যসাধনের জয়পতাকা হাতে অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে নদী পর্বত সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চলেছে সেইখানে। সেখানে সমাজ আহ্বান করছে, সেখানে দেশ হাত বাড়িয়ে আছে,— সেখানে উন্নতিতীর্থের দুর্গম শিখর মেঘের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে সুমহৎ ভবিষ্যতের দিকে তর্জনী তুলে রয়েছে। এই-বা কী বিরাট ক্ষেত্র! এই যেখানে যুগে যুগে সমস্ত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে এসেছেন, এখানে প্রাণ আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারলেই নিজেকে সার্থক বলে মনে করে।

কিন্তু এইখানে এসেই যে সমস্ত ফুরোয়, তা নয়। এর থেকেও বেরোবার দরজা আছে। সেই দরজা যখন খুলে যায় তখন দেখি আরো আছে, এবং তার মধ্যে শৈশব যৌবন বার্ধক্য সমস্তই অপূর্বভাবে সম্মিলিত। জীবন যখন ঝরনার মতো ঝরছিল তখন সে ঝরনারূপেই সুন্দর, যখন নদী হয়ে বেরোল তখন সে নদীরূপেই সার্থক, যখন তার সঙ্গে চারদিক থেকে নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত করে দিলে তখন মহানদরূপেই তার মহত্ত্ব— তার পরে সমুদ্রে এসে যখন সে সংগত হল তখন সেই সাগরসংগমেও তার মহিমা।

বাল্যজীবন যখন ইন্দ্রিয়বোধের বাইরের ক্ষেত্র ছিল তখনো সে সুন্দর, যৌবন যখন ভাববোধের মানসক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর, প্রৌঢ় যখন বাহির ও অন্তরের সম্মিলনক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর এবং বৃদ্ধ যখন বাহির ও অন্তরের অতীত ক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর।

আমার তরুণ বন্ধুর জন্মদিনে এই কথাই আমি চিন্তা করছি। আমি দেখছি, তিনি একটি বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছেন— তাঁর সামনে একটি অভাবনীয় তাঁকে নব নব প্রত্যাশার পথে আহ্বান করছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পঞ্চাশে পদার্পণ করে আমার সামনেও সেই অভাবনীয়কেই দেখছি। নূতন আর কিছুই নেই, শক্তির পাথেয় শেষ হয়ে গেছে, পথের সীমায় এসে ঠেকেছি, এ-কথা কোনোমতেই বলতে পারছি নে। আমি তো দেখছি, আমিও একটি বিপুল বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছি। বাল্যের জগৎ, যৌবনের জগৎ,

যা পার হয়ে এসেছি বলে মনে করেছিলুম, এখন দেখছি, তার শেষ হয় নি— তাকেই আবার আর-এক আলোকে আর-এক অর্থে আর-এক সুরে লাভ করতে হবে, মনের মধ্যে সেই একটি সংবাদ এসেছে।

এর মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যেখানে ছিলুম সেইখানেই আছি অথচ চলেওছি। শিশুকালের যে-পৃথিবী, যে-চন্দ্রসূর্যতারা, এখনো তাই— স্থানপরিবর্তন করতে হয় নি, অথচ সমস্তই বেড়ে উঠেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি যে পড়বে তাকে যদি কোনোদিন কালিদাসের কাব্য পড়তে হয়, তবে তাকে স্বতন্ত্র পুঁথি খুলতে হয়। কিন্তু এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে— সেই পুঁথিকে শিশু পড়ছে ছড়ার মতো, যুবা পড়ছে কাব্যের মতো এবং বৃদ্ধ তাতেই পড়ছে ভাগবত। কাউকে আর নড়ে বসতে হয় নি— কাউকে এমন কথা বলতে হয় নি যে, 'এ জগতে আমার চলবে না, আমি একে ছাড়িয়ে গেছি— আমার জন্যে নূতন জগতের দরকার।'

কিছুই দরকার হয় না এইজন্যে যে, যিনি এ পুঁথি পড়াচ্ছেন তিনি অনন্ত নূতন— তিনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত পাঠকে নূতন করে নিয়ে চলেছেন— মনে হচ্ছে না যে, কোনো পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

এইজন্যেই পড়ার প্রত্যেক অংশেই আমরা সম্পূর্ণতাকে দেখতে পাচ্ছি— মনে হচ্ছে, এই যথেষ্ট,— মনে হচ্ছে, আর দরকার নেই। ফুল যখন ফুটছে তখন সে এমনি করে ফুটছে যেন সেই চরম ; তার মধ্যে ফলের আকাঙ্ক্ষা দৈন্যরূপে যেন নেই। তার কারণ হচ্ছে, পরিণত ফলের মধ্যে যাঁর আনন্দ, অপরিণত ফুলের মধ্যেও তাঁর আনন্দের অভাব নেই।

শৈশবে যখন ধুলোবালি নিয়ে, যখন নুড়ি শামুক ঝিনুক ঢেলা নিয়ে খেলা করেছি, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদিকালের ভগবান শিশুভগবান হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করেছেন। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে শিশু না হতেন এবং তাঁর সমস্ত জগৎকে শিশুর খেলাঘর করে না তুলতেন, তা হলে তুচ্ছ ধুলোমাটি আমাদের কাছে এমন আনন্দময় হয়ে উঠত না। তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের মতো হয়ে আমাদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন, এইজন্যে শিশুর জীবনে সেই পরিপূর্ণস্বরূপের লীলাই এমন সুন্দর হয়ে দেখা দেয় ; কেউ তাকে ছোটো ব'লে, মূঢ় ব'লে, অক্ষম ব'লে অবজ্ঞা করতে পারে না— অনন্ত শিশু তার সখা হয়ে তাকে এমনি গৌরবান্বিত করে তুলেছেন যে, জগতের আদরের সিংহাসন সে অতি অনায়াসেই অধিকার করে বসেছে, কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

আবার সেইজন্যেই আমার উনিশ বৎসরের যুবাবন্ধুর তারুণ্যকে আমি অবজ্ঞা

করতে পারি নে। যিনি চিরযুবা তিনি তাকে যৌবনে মণ্ডিত জগতের মাঝখানে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। চিরকাল ধরে কত যুবাকেই যে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে এসেছেন, তার আর সীমা নেই। তাই যৌবনের মধ্যে চরমের আস্বাদ পেয়ে চিরদিন যুবারা যৌবনকে চরমরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছে।

প্রবীণরা তাই দেখে হেসেছে। মনে করেছে যুবারা এই-সমস্ত নিয়ে ভুলে আছে কেমন করে। ত্যাগের মধ্যে রিক্ততার মধ্যে যে বাধাহীন পরিপূর্ণতা, সেই অমৃতের স্বাদ এরা পায় নি। তিনি চিরপুরাতন যিনি পরমানন্দে আপনাকে নিয়তই ত্যাগ করছেন, যিনি কিছুই চান না; তিনিই বৃদ্ধের বন্ধু হয়ে পূর্ণতার দ্বারস্বরূপ যে-ত্যাগ, অমৃতের দ্বারস্বরূপ যে-মৃত্যু, তারি অভিমুখে আপনি হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন।

এমনি করে অনন্ত যদি পদে পদেই আমাদের কাছে না ধরা দিতেন, তবে অনন্তকে আমরা কোনো কালেই ধরতে পারতুম না। তবে তিনি আমাদের কাছে 'না' হয়েই থাকতেন। কিন্তু পদে পদে তিনিই আমাদের 'হাঁ'। বাল্যের মধ্যে যে হাঁ সে তিনিই, সেইখানেই বাল্যের সৌন্দর্য; যৌবনের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই যৌবনের শক্তি সামর্থ্য; বার্ধক্যের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই বার্ধক্যের চরিতার্থতা। খেলার মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, সংগ্রহের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি এবং ত্যাগের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি।

এইজন্যেই পথও আমাদের কাছে এমন রমণীয়, এইজন্যে সংসারকে আমরা ত্যাগ করতে চাই নে। তিনি-যে পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। পথের উপর আমাদের এই-যে ভালোবাসা, এ তাঁরি উপর ভালোবাসা। মরতে আমরা যে এত অনিচ্ছা করি, এর মধ্যে আমাদের মনের এই কথাটি আছে যে, 'হে প্রিয়, জীবনকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় করে রেখেছ।'— ভুলে যাই, যিনি প্রিয় করেছেন, মরণেও তিনিই আমাদের সঙ্গে চলেছেন।

আমাদের বলবার কথা এ নয় যে, এটা অপূর্ণ ওটা অপূর্ণ, অতএব এ সমস্তকে আমরা পরিত্যাগ করব। আমাদের বলবার কথা হচ্ছে এই যে, এরি মধ্যে যিনি পূর্ণ তাঁকে আমরা দেখব। ক্ষেত্রকে বড়ো করেই যে আমরা পূর্ণকে দেখি তা নয়, পূর্ণকে দেখলেই আমাদের ক্ষেত্র বড়ো হয়ে যায়। আমরা যেখানেই আছি, যে-অবস্থায় আছি, সকলের মধ্যেই যদি তাঁকে দেখবার অবকাশ না থাকত, তা হলে কেউ কোনো কালেই তাঁকে দেখবার আশা করতে পারতুম না। কারণ, আমরা যে যতদূরই অগ্রসর হই-না, অনন্ত যদি ধরা না দেন তবে কোনো কৌশলে কারো তাঁকে নাগাল পাবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না।

কিন্তু তিনি অনন্ত বলেই সর্বত্রই ধরা দিয়েই আছেন— এইজন্যে তাঁর আনন্দরূপের অমৃতরূপের প্রকাশ সকল দেশে, সকল কালে। তাঁর সেই প্রকাশ যদি আমাদের মানবজীবনের মধ্যে দেখে থাকি তবে মৃত্যুর পরেও তাঁকে নূতন করে দেখতে পাব, এই আশা আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানবজীবনে সে সুযোগ যদি না ঘটে থাকে, অর্থাৎ যদি না জেনে থাকি যে, যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সে তাঁরি আনন্দ, তবে মৃত্যুর পরে যে আরো-কিছু বিশেষ সুযোগ আছে, এ-কথা কল্পনা করবার কোনো হেতু দেখি নে।

অনন্ত চিরদিনই সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন, এই তাঁর আনন্দের লীলা। কিন্তু তাঁর যে অন্ত নেই, এ-কথা তিনি আমাদের কেমন করে জানান? নেতি নেতি করে জানান না, ইতি ইতি করেই জানান। অন্তহীন ইতি। সেই ইতিকে কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেই এ কথা জানতে পারি, সর্বত্রই ইতি— সর্বত্রই সেই এষঃ। জীবনেও সেই এষঃ, জীবনের পরেও সেই এষঃ।— কিন্তু তিনি নাকি অন্তহীন, সেইজন্যে তিনি কোথাও কোনোদিন পুরাতন নন,— চিরদিনই তাঁকে নূতন করেই জানব, নূতন করেই পাব, তাঁতে নূতন করেই আনন্দলাভ করতে থাকব। একেবারেই সমস্ত পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে চিরকালের মতো একভাবেই যদি তাঁকে পেতুম, তা হলে অনন্তকে পাওয়া হত না। অন্য সমস্ত পাওয়াকে শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে পাব, এ কখনো হতেই পারে না। কিন্তু সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতর রূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন এককে অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে চিরকাল ভোগ করে চলব, এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোনো অর্থই নেই,— তবে বিশ্বরচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ মায়ামরীচিকামাত্র।

মাতৃশ্রাদ্ধ

আমি কোনো ইংরেজী বইয়ে পড়েছি যে, ঈশ্বরকে যে পিতা বলা হয়ে থাকে, সে একটা রূপকমাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে পিতার সঙ্গে সন্তানের যে রক্ষণপালনের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সেই সম্বন্ধ আছে বলেই এই সাদৃশ্য অবলম্বনে তাঁকে পিতা বলা হয়।

কিন্তু এ-কথা আমরা মানি নে। আমরা তাঁকে রূপকের ভাষায় পিতা বলি নে। আমরা বলি, পিতামাতার মধ্যে তিনিই সত্য পিতা মাতা। তিনিই আমাদের অনন্ত

পিতামাতা, সেইজন্যেই মানুষ তার পৃথিবীর পিতামাতাকে চিরকাল পেয়ে আসছে। মানুষ যে পিতৃহীন হয়ে মাতৃহীন হয়ে পৃথিবীতে আসে না তার একমাত্র কারণ, বিশ্বের অনন্ত পিতামাতা চিরদিন মানুষের পিতামাতার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে আসছেন। পিতার মধ্যে পিতারূপে যে-সত্য সে তিনি, মাতার মধ্যে মাতারূপে যে-সত্য সে তিনি।

পিতামাতাকে যদি প্রাকৃতিক দিক থেকে দেখাই সত্য দেখা হত, অর্থাৎ আমাদের মর্ত্যজীবনের প্রাকৃতিক কারণমাত্র যদি তাঁরা হতেন, তা হলে এই পিতামাতা সম্ভাষণকে আমরা ভুলেও অনন্তের সঙ্গে জড়িত করতুম না। কিন্তু মানুষ পিতামাতার মধ্যে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ঢের বড়ো জিনিসকে অনুভব করেছে— পিতামাতার মধ্যে এমন একটি পদার্থের পরিচয় পেয়েছে যা অন্তহীন, যা চিরন্তন, যা বিশেষ পিতামাতার সমস্ত ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে; পিতামাতার মধ্যে এমন একটা-কিছু পেয়েছে যাতে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রসূর্যগ্রহতারাকে যিনি অনাদি-অনন্তকাল নিয়মিত করছেন, সেই পরম শক্তিকে সম্বোধন করে বলে উঠেছে, 'পিতা নোঽসি— তুমি আমাদের পিতা।' এ-কথা যে নিতান্তই হাস্যকর প্রলাপবাক্য এবং স্পর্ধার কথা হত যদি এ কেবলমাত্রই রূপক হত। কিন্তু মানুষ এক জায়গায় পিতামাতাকে বিশেষভাবে অনন্তের মধ্যে দেখেছে এবং অনন্তকে বিশেষভাবে পিতামাতার মধ্যে দেখেছে, সেইজন্যেই এমন দৃঢ়কণ্ঠে এতবড়ো অভিমানের সঙ্গে বলতে পেরেছে 'পিতা নোঽসি'।

মানুষ পিতামাতার মধ্য থেকে যে-অমৃতের ধারা লাভ করেছে সেইটেকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখেছে কোথাও তার সীমা নেই, দেখেছে যেখান থেকে সূর্যনক্ষত্র তাদের নিঃশেষহীন আলোক পাচ্ছে, জীবজন্তু যেখান থেকে অবসানহীন প্রাণের স্রোতে ভেসে চ'লে আজ পর্যন্ত কোনো শেষে গিয়ে পৌঁছল না, সেই জগতের অনাদি আদিপ্রস্রবণ হতেই ওই অমৃতধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে; অনন্ত ওইখানে আমাদের কাছে যেমনি ধরা পড়ে গেছেন, অমনি আমরা সেই দিকেই মুখ তুলে বলে উঠেছি 'পিতা নোঽসি'— বলেছি, 'যাকেই পিতা বলে ডাকি-না কেন, তুমিই আমাদের পিতা।'

'তুমি যে আমাদেরি' অনন্তকে এমন কথা বলতে শিখলুম এইখান থেকেই। 'তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য কারবার নিয়ে তুমি আছ, সে কথা ভাবতে গেলেও ভয়ে মরি— কিন্তু ধরা পড়ে গেছ এইখানেই— দেখেছি তোমাকে পিতার মধ্যে, দেখেছি তোমাকে মাতার মধ্যে— তাই তুমি যত বড়োই হও-না কেন, পৃথিবীর এই এক কোণে দাঁড়িয়ে বলেছি, তুমি আমাদের পিতা— পিতা নোঽসি। আমাদের তুমি আমাদের, আমার তুমি আমার।'

এমন করে যদি তাঁকে না পেতুম তবে তাঁকে খুঁজতে যেতুম কোন্ রাস্তায়? সে রাস্তার অন্ত পেতুম কবে এবং কোন্‌খানে? যত দূরেই যেতুম তিনি দূরেই থেকে যেতেন। কেবল তাঁকে অনির্বচনীয় বলতুম, অগম্য অপার বলতুম।

কিন্তু সেই অনির্বচনীয় অগম্য অপার তিনিই আমার পিতা, আমার মাতা, তিনিই আমার— মানুষকে এই একটি অদ্ভুত কথা তিনি বলিয়েছেন। অনধিগম্য, এক মুহূর্তে এত আশ্চর্য সহজ হয়েছেন।

একেবারে আমাদের মানবজন্মের প্রথম মুহূর্তেই। মার কোলে মানুষের জন্ম, এইটেই মানুষের মস্ত কথা এবং প্রথম কথা। জীবনের প্রথম মুহূর্তেই তার অধিকারের আর অন্ত নেই; তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এতবড়ো স্নেহ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, জগতে এত তার মূল্য। এ মূল্য তাকে উপার্জন করতে হয় নি, এ মূল্য সে একেবারেই পেয়েছে।

মাতাই শিশুকে জানিয়ে দিলে, বিশাল বিশ্বজগৎ তার আত্মীয়, নইলে মাতা তার আপন হত না। মাতাই তাকে জানিয়ে দিলে, নিখিলের ভিতর দিয়ে যে যোগের সূত্র তাকে বেঁধেছে, সেটি কেবল প্রাকৃতিক কার্যকারণের সূত্র নয়, সে একটি আত্মীয়তার সূত্র। সেই চিরন্তন আত্মীয়তা পিতামাতার মধ্যে রূপগ্রহণ ক'রে জীবনের আরম্ভেই শিশুকে এই জগতে প্রথম অভ্যর্থনা করে নিলে। একেবারেই যে অপরিচিত, এক নিমেষেই তাকে সুপরিচিত বলে গ্রহণ করলে— সে কে। এমনটা পারে কে। এ শক্তি আছে কার। সেই অনন্ত প্রেম, যিনি সকলকেই চেনেন, এবং সকলকেই চিনিয়ে দেন।

এইজন্যে প্রেম যখন চিনিয়ে দেন, তখন জানাশুনা চেনাপরিচয়ের দীর্ঘ ভূমিকার কোনো দরকার হয় না, তখন রূপগুণ শক্তিসামর্থ্যের আসবাব-আয়োজনও বাহুল্য হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞানের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওজন করে হিসেব করে চিনতে হয় না। চিরকাল তাঁর যে চেনাই রয়েছে সেইজন্যে তাঁর আলো যেখানে পড়ে সেখানে কেউ কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না।

শিশু মা-বাপের কোলেই জগৎকে যখন প্রথম দেখলে, তখন কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে না— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে একটি ধ্বনি এল, 'এসো, এসো।' সেই ধ্বনি মা-বাপের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে এল কিন্তু সে কি মা-বাপেরই কথা। সেটি যাঁর কথা তাঁকেই মানুষ বলেছে 'পিতা নোঽসি'।

শিশু জন্মাল আনন্দের মধ্যে, কেবল কার্যকারণের মধ্যে নয়। তাকে নিয়ে মা-বাপের খুশি, মা-বাপকে নিয়ে তার খুশি। এই আনন্দের ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে

তার সম্বন্ধ আরম্ভ হল। এই-যে আনন্দ, এ আনন্দ ছিল কোথায়, এ আনন্দ আসে কোথা থেকে। যে-পিতামাতার ভিতর দিয়ে শিশু একে পেয়েছে, সেই পিতামাতা একে পাবে কোথায়। এ কি তাদের নিজের সম্পত্তি। এই আনন্দ জীবনের প্রথম মুহূর্তেই যেখান থেকে এসে পৌঁছল, সেইখানে মানুষের চিত্ত গিয়ে যখন উত্তীর্ণ হয় তখনি এতবড়ো কথা সে অতি সহজেই বলে, 'পিতা নোঽসি— তুমিই আমার পিতা, আমার মাতা।'

আমাদের এই মন্দিরের একজন উপাসক আমাকে জানিয়েছেন, আজ তাঁর মাতার শ্রাদ্ধদিন। আমি তাঁকে বলছি, আজ তাঁর মাতাকে খুব বড়ো করে দেখবার দিন, বিশ্বমাতার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখবার দিন।

মা যখন ইন্দ্রিয়বোধের কাছে প্রত্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁকে এতবড়ো করে দেখবার অবকাশ ছিল না। তখন তিনি সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিতেন। আজ তাঁর সমস্ত আবরণ ঘুচে গিয়েছে— যেখানে তিনি পরিপূর্ণ সত্য, সেইখানেই আজ তাঁকে দেখে নিতে হবে। যিনি জন্মদান করে নিজের মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বমাতার পরিচয়সাধন করিয়েছেন, আজ তিনি মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে দিয়ে সংসারের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেই বিশ্বজননীর মধ্যে নিজের মাতৃত্বের চিরন্তন মূর্তিটি সন্তানের চক্ষে প্রকাশ করে দিন।

শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি— শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস।

আমাদের মধ্যে একটি মূঢ়তা আছে; আমরা চোখে-দেখা কানে-শোনাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের আড়ালে পড়ে যায়, মনে করি, সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারি নে।

আমার চোখে-দেখা কানে-শোনা দিয়েই তো আমি জগৎকে সৃষ্টি করি নি যে, আমার দেখাশোনার বাইরে যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাকে চোখে দেখছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি, সে যাঁর মধ্যে আছে, যখন তাকে চোখে দেখি নে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি নে, তখনো তাঁরি মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা তো ঠিক এক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার যেখানে জানার শেষ সেখানে তিনি ফুরিয়ে যান নি। আমি যাকে দেখছি নে, তিনি তাকে দেখছেন— আর তাঁর সেই দেখায় নিমেষ পড়ছে না।

সেই অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের দেখার মধ্যেই আজ মাকে দেখতে হবে। আজ এই শ্রদ্ধাটিকে হৃদয়ে জাগ্রত করে তুলতে হবে যে, মা আছেন, মা সত্যের মধ্যে

আছেন, শোকানলের আলোকেই এই শ্রদ্ধাকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে যে, মা আছেন, তিনি কখনোই হারাতে পারেন না। সত্যের মধ্যে মা চিরকাল ছিলেন বলেই তাঁকে একদিন পেয়েছি— নইলে একদিনো পেতুম না— এবং সত্যের মধ্যেই মা আছেন বলেই আজো তাঁর অবসান নেই।

সত্যের মধ্যেই, অমৃতের মধ্যেই সমস্ত আছে, এ-কথা আমরা পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই যথার্থত উপলব্ধি করি। যাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহপ্রেমের, আমাদের জীবনের গভীর যোগ নেই, তারা আছে কি নেই তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না— সুতরাং মৃত্যুতে তারা আমাদের কাছে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইখানেই মৃত্যুকে আমরা বিনাশ বলেই জানি।

কিন্তু এ মৃত্যুর অর্থ কী ভেবে দেখো। যে-মানুষকে আনন্দের মধ্যে দেখি নি, তাকে অমৃতের মধ্যেই দেখি নি— আমার পক্ষে সে কেবলমাত্র চোখে-দেখা কানে-শোনার অনিত্য লোকেই এতদিন ছিল ;— যেখানে তাকে সত্যরূপে বৃহৎরূপে অমররূপে দেখতে পেতুম, সেখানে সে আমাকে দেখা দেয় নি।

যেখানে আমার প্রেম সেইখানেই আমি নিত্যের স্বাদ পাই, অমৃতের পরিচয় পেয়ে থাকি। সেখানে মানুষের উপর থেকে তুচ্ছতার আবরণ চলে যায়, মানুষের মূল্যের সীমা থাকে না। সেই প্রেমের মধ্যে যে-মানুষকে দেখেছি, তাকেই আমি অমৃতের মধ্যে দেখেছি। সমস্ত সীমাকে অতিক্রম ক'রে তার মধ্যে অসীমকে দেখতে পাই এবং মৃত্যুতেও সে আমার কাছে মরে না।

যাকে আমরা ভালোবাসি মৃত্যুতে সে যে থাকবে না, এই কথাটা আমাদের সমস্ত চিত্ত অস্বীকার করে ;— প্রেম যে তাকে নিত্য বলেই জানে, সুতরাং মৃত্যু যখন তার প্রতিবাদ করে, তখন সেই প্রতিবাদকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে এতই কঠিন হয়ে ওঠে। যে-মানুষকে আমরা অমৃতলোকের মধ্যে দেখেছি, তাকে মৃত্যুর মধ্যে দেখব কেমন করে।

মনের ভিতরে তখন একটি কথা এই ওঠে— প্রেম কি কেবল আমারি। কোনো বিশ্বব্যাপী প্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়। যে-শক্তিকে অবলম্বন করে আমি ভালোবাসছি, আনন্দ পাচ্ছি, সেই শক্তিই কি সমস্ত বিশ্বে সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না। আমার প্রেমের মধ্যে এমন যে একটি অমৃত আছে, যে-অমৃতে আমার প্রেমাস্পদ আমার কাছে এমন চিরন্তন সত্য— সেই অমৃত কি সেই অনন্ত প্রেমের মধ্যে নেই। তাঁর সেই অনন্ত প্রেমের সুধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠি নি। যেখানে তাঁর আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই।

প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে প্রেমের আলোকে আমরা এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই তো আমাদের শ্রদ্ধার দিন— সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি ; আমরা বলি, মাকে দেখছি নে কিন্তু মা আছেন। চোখে দেখে, হাতে ছুঁয়ে যখন বলি 'মা আছেন', তখন সে তো শ্রদ্ধা নয়— আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেখানে শূন্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে সেখানে যখন বলি 'মা আছেন', তখন তাকেই যথার্থ বলে শ্রদ্ধা। নিজে যতক্ষণ পাহারা দিচ্ছি ততক্ষণ যাকে বিশ্বাস করি, তাকে কি শ্রদ্ধা করি। গোচরে এবং অগোচরেও যার উপর আমার বিশ্বাস অটল, তারি উপর আমার শ্রদ্ধা। মৃত্যুর অন্ধকারময় অন্তরালেও যাকে আমার সমস্ত চিত্ত সত্য বলে উপলব্ধি করছে, তাকেই তো যথার্থ আমি সত্য বলে শ্রদ্ধা করি।

সেই শ্রদ্ধাই প্রকাশ করার দিন শ্রাদ্ধের দিন। মাতার জীবিতকালে যখন বলেছি, 'মা তুমি আছ'— তার চেয়ে ঢের পরিপূর্ণ করে বলা, আজকের বলা যে, 'মা তুমি আছ।' তার মধ্যে আর-একটি গভীরতর শ্রদ্ধার কথা আছে— 'পিতা নোঽসি। হে আমার অনন্ত পিতামাতা, তুমি আছ, তাই আমার মাকে কোনো দিন হারাবার জো নেই।'

যেদিন বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠবার দিন, সেই-দিনকারই আনন্দমন্ত্র হচ্ছে—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

এই আনন্দমন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন। সত্যম্— তিনি সত্য, অতএব সমস্ত তাঁর মধ্যে সত্য, এই শ্রদ্ধা যেদিন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, সেই দিনই আমরা বলতে পারি আনন্দম্— তিনি আনন্দ এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ।

শেষ

গানে সম আছে, ছন্দে যতি আছে এবং এই যে লেখা চলছে, এই লেখার অন্য-সকল অংশের চেয়ে দাঁড়ির প্রভুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই দাঁড়িগুলোই লেখার হাল ধরে রয়েছে— একে একটানা নিরুদ্দেশের মধ্যে হু হু করে ভেসে যেতে দিচ্ছে না।

বস্তুত কবিতা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেননা কোনো ভালো কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না— যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে— এই নিঃশব্দে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।

যেখানে কবিতা থেমে গেল সেখানেই যদি তার সমস্ত সুর সমস্ত কথা একেবারেই ফুরিয়ে যায়, তা হলে সে নিজের দীনতার জন্যে লজ্জিত হয়। কোনো-একটা বিশেষ উপলক্ষে প্রাণপণে ধুমধাম করে যে-ব্যক্তি একেবারে দেউলে হয়ে যায়, সেই ধুমধামের দ্বারা তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় না, তার দারিদ্র্যই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে— তাই থেমে তার কোনো ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল এক দিক থেকে থামা, অন্য দিক থেকে থামা নয়।

মানুষের জীবনের মধ্যেও এই-রকম অনেক থামা আছে। কিন্তু প্রায় দেখা যায়, মানুষ থামতে লজ্জা বোধ করে। সেইজন্যেই আমরা ইংরেজের মুখে প্রায় শুনতে পাই যে, জিন্‌লাগাম-পরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ। আমরাও এই কথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি।

কোনো-একটা জায়গায় পূর্ণতা আছে, এ-কথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই মানুষ একমাত্র গৌরবের জিনিস ব'লে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না, সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

কিন্তু ভোগের বা দানের মধ্যে সঞ্চয় যখন আপনাকে ক্ষয় করতে থাকে তখন এক আকারে সঞ্চয়ের অবসান হয় বটে, কিন্তু আর-এক আকারে তারি সার্থকতা হতে থাকে। যেখানে সঞ্চয়ের এই সার্থক অবসান নেই সেখানে লজ্জাজনক কৃপণতা।

জীবনকে যারা এই-রকম কৃপণের মতো দেখে, তারা কোথাও কোনোমতেই থামতে চায় না, তারা কেবলি বলে, 'চলো, চলো, চলো।' থামার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও

গভীর হয়ে ওঠে না; তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না।

তারা যৌবনকে যৌবন পেরিয়েও টানাটানি করে নিয়ে চলে; সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারে কাঠ খড় এবং চেষ্টার আর অবধি থাকে না— তা ছাড়া কত লজ্জা, কত ভাবনা, কত ভয়।

ফল যখন পাকে তখন শাখা ছেড়ে যাওয়াই তার গৌরব। কিন্তু শাখা ত্যাগ করাকে যদি দীনতা ব'লে মনে করে, তবে তার মতো কৃপাপাত্র আর কে আছে।

নিজের স্থানকে অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনের মধ্যে রাখতে হবে যে, এই অধিকারকে সম্পূর্ণ করে তুলে এ'কে ত্যাগ করে যাব; এই অধিকারকে যেমন করে পারি শেষ পর্যন্ত টানাহেঁচড়া করে রক্ষা করতেই হবে— তাতেই আমার সম্মান, আমার কৃতিত্ব, এই শিক্ষাই যারা শিশুকাল থেকে শিখে এসেছে, অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মতো এসে জোর করে টেনে নিয়ে না যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁকড়ে পড়ে থাকে।

আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এইজন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এইজন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়।

কেননা সেই ত্যাগ বলতে তো রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে তো ব্যর্থতা বলতে পারি নে। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র -পরিবর্তন হয়— সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।

আমাদের দেশে বলে, পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ।

কিন্তু সে বন তো আলস্যের বন নয়, সে-যে তপোবন। সেখানে মানুষের এতকালের সঞ্চয়ের চেষ্টা, দানের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়, হওয়ার আদর্শই খুব বড়ো জিনিস। ধানের গাছ যখন রৌদ্রবৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বাড়ছিল সে খুব সুন্দর, কিন্তু ফসল ফ'লে যখন তার মাঠের দিন শেষ হয়ে ঘরের দিন আরম্ভ হয় তখন সেও সুন্দর। সেই ফসলের মধ্যে ধানখেতের সমস্ত রৌদ্রবৃষ্টির ইতিহাস নিবিড়ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে ব'লে কি তার কোনো অগৌরব আছে?

মানুষের জীবনকেও কেবল তার খেতের মধ্যেই দেখব, তার ফসলের মধ্যে দেখব না, এমন পণ করলে সে জীবনকে নষ্টই করা হয়। তাই বলছি, মানুষের জীবনে

এমন একটি সময় আসে যখন তার থামার সময়। মানুষের কাজের সময়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে যে-জিনিসটা আদায় করি, তার থামার সময়েও আমরা যদি সেই জিনিসটাই দাবি করি, তা হলে কেবল যে অন্যায় করা হয় তা নয়, নিজেকে বঞ্চিত করাই হয়।

থামার সময় মানুষের কাছে আমরা যেটা দাবি করতে পারি, সেটা করার আদর্শ নয়— সেটা হওয়ার আদর্শ। যখন সমস্তই কেবল চলছে, কেবলই ভাঙাগড়া এবং ওঠাপড়া, তখন সেই হওয়ার আদর্শটিকে সম্পূর্ণভাবে স্থিরভাবে আমরা দেখতে পাই নে— যখন চলা শেষ হয় তখন হওয়াকে আমরা দেখতে পাই। মানুষের এই সমাপ্ত ভাবটি, এই স্থিররূপটি দেখারও প্রয়োজন আছে। খেতের চারা এবং গোলার ধান আমাদের দুইই চাই।

কেজো লোকেরা কাজকেই একমাত্র লাভ বলে মনে করে— এইজন্য মানুষের কাছ থেকে তার অন্তিমকাল পর্যন্ত কেবল কাজ আদায় করবারই চেষ্টা করে।

যে-সমাজে যে-রকম দাবি সেই দাবি অনুসারেই মানুষের মূল্য। যেখানে সমাজ যুদ্ধ দাবি করে সেখানে যোদ্ধারই মূল্য বেশি, সুতরাং সকলেই আর-সমস্ত চেষ্টাকে সংহরণ ক'রে যোদ্ধা হবার জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করে।

যেখানে কাজের দাবি অতিমাত্র, সেখানে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস। সেখানে মানুষের দাঁড়ি নেই বললেই হয়, সেখানে কেবলই অসমাপিকা ক্রিয়া। সেখানে মানুষ যে-জায়গায় থামে সে-জায়গায় কিছুই পায় না, কেবল লজ্জা পায়; সেখানে কাজ একটা মদের মতো, ফুরোলেই অবসাদ; সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে মানুষের কোনো বৃহৎ ব্যঞ্জনা নেই; সেখানে মৃত্যুর রূপ অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শতসহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

সামঞ্জস্য

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে-লীলা চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হ'ক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হ'ক, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারিদিকেই গতি এবং স্ফূর্তি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে

প্রবলবেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্য প্রতি মুহূর্তে প্রবলবেগে কোনো-এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই— আমরা সকাল-বেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে এ-কথা নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল, সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেমনি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা সর্বত্র সামঞ্জস্য আছে ; এই অতি-প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য তো সহজ সামঞ্জস্য নয়— এ তো মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে-সব শক্তির লীলা, তাদের যেমন প্রচণ্ডতা তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা— কেউ-বা পিছনের দিকে টানে, কেউ-বা সামনের দিকে ঠেলে, কেউ-বা গুটিয়ে আনে কেউ-বা ছড়িয়ে ফেলে, কেউ-বা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্ছে, কেউ-বা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্তে সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই-সমস্ত শক্তি অসংখ্যবেশে এবং অসংখ্যতালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে— তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত ; কিন্তু এই-সমস্ত প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তংশিবমদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে-সত্যসাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে— এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে, কখনোই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনোই প্রমত্ত নন ; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্ছে। এষ সেতুর্বিধরণো লোকানামসম্ভেদায়।

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল, তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করলে। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল, তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই, কিন্তু

দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি, এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনা-ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত ক'রে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো, সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো,— সেইদিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ ক'রে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে, কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এ-রকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনোই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন, তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না— বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত, তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চলছে তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক এই তাঁদের কথা ছিল— কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এমনি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিতে হয়!

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার মধ্যে, এতবড়ো একটা বিচ্ছেদ কখনোই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল, সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না— কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি সমাজতন্ত্রে, কি ধর্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে-হৃদয়পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখতে

দেখতে একেবারে চতুর্দিক প্লাবিত করে দিলে; অনেকদিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠল।

এখন আবার সকলে একেবারে উলটো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে-সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে, সাধনায় সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগল। তাঁর আর-সমস্তকেই খর্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগচাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগল এবং সেই-রকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাব-বিহ্বলতা জন্মায়, সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু ভগবানকে এই-রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীরমনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনোই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখনি মানুষ এমন কথা অনায়াসে বলতে পারে যে, ভক্তিপূর্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক-না কেন, তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ, যেন পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে, তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষটা যাই হ'ক, ভক্তির প্রবলতা দেখলেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়— কারণ, প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এই-রকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি, তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, সেখানে শক্তিপুঞ্জ একদিকে কাত হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে তো একদিক থেকে চুরি করে অন্যদিককে স্ফীত করা। যেদিক থেকে চুরি হয় সেদিক থেকে নালিশ ওঠে; তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চায় মানুষ কখনোই মনুষ্যত্বলাভ করে না এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মতো ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কাকে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার

পুজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচারবিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল ;— জগদ্‌ব্যাপারের সর্বত্রই একটা জ্ঞানের ন্যায়ের নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দিকে ধূলিসাৎ হতে চলল, তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল ; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র প'ড়ে, কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে, এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল ; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই, দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল, তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল— কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না ; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান-নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বললেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল ; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করে নি, তার পরে যখন জ্ঞান বড়ো হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়ে বসল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোটো করে দিলে, এমন-কি, ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশের তৃপ্তি-সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার সর্বাংশের ক্ষুধা একদিন না জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি-যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয় ; ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্‌, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে, এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কি-রকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কি-রকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে-ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে, তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা সহজ, কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে-লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো-একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায়, তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিস জগতে অনেক আছে— কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয়, যে সত্য চায়, সে তো ভুলতে চায় না, সে পেতে চায়। কাজেই, সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরোতেই হবে— তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে— কিন্তু উপায় নেই, তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই-যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসামাত্র নয়, কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়, এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে— তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয়, আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময়ে বলেছিল ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই, কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাঁকে চেয়েছিলেন— এইজন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণবর্জনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত তিনি থামতে পারেন নি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হন নি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেইজন্যেই এ দেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী।

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি এ-কথা বুঝেছেন— ব্রহ্মকে

পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়— শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায়, কেননা সমস্ত রসের সার তিনি— রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন, তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য প্রকাশ করতে চায় তখন বারবার ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা— মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে ; সে গণ্ডির মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে এ-কথা কাউকে বলে না যে 'তুমি দুর্বল, তোমার সাধ্য নেই', কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়— আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত ক'রে এতই নিবিড় ক'রে দেখে যে, সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য ব'লে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না— পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হ'ক-না, এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন, তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন —আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট, তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না-এর দিক থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক থেকে নয়— এইজন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি-যে অনন্ত নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু তিনি-যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনোমতে তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্ছেন তা ভালো করে জানবার পূর্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন— জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এইজন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন— পরিমিত পদার্থের মতো করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মতো যাঁকে না-পাওয়া যায় না— যাঁকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব করতে হয় না, অন্যদিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না— যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দিষ্ট নন— যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানি নে সেও তাঁকে জানে। এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্ছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন, ভগবৎপিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কি-রকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল। অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ, তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্— তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্ছে— সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্‌বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে এই রসের গাম্ভীর্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখেছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুত যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন, তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন, তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কি-রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন, সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেমনি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলই রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে এবং কর্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি, এবং অন্য-সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এই-রকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করে নি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশবাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এইজন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হ'ক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হ'ক, নির্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি। তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়— তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম ; নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা ; অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব-উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি— তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া— দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহমন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা— অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা একেই নির্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব— তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। এ-কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে ইতিপূর্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য-সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত

প্রিয়কার্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ করে এনেছিলুম ; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর, কর্মে যেখানে যথার্থ বীর্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্যাতন স্বীকার ক'রে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ ক'রে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেইদিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করি নি। দুর্বলতাবশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্বলতা এ-পর্যন্ত কেবলই বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্যসাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্বলতা যে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন— তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রবল ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারই মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন— তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতিদুর্গের যে রুদ্ধ দ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে— আপনার ধর্মকে সমাজকে, আপনার আচারব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডির মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে ; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আসতে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, হৃদয়ের সংকোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য ব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্ছে, সেইখানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্ছে,— সেইখানেই অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে এবং সেইখানেই প্রবলবেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছি— এই-রকম সময়েই যে-সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে ক'রে এখানকার

জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে— যে-বিশ্লিষ্টতা এ দেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলছে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদকাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না— ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্মে কি বিষয়কর্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে কি ধর্মানুষ্ঠানে, সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্বাঙ্গীণভাবে সম্পন্ন করতেন— তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্যন্ত যা-কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তার কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার ও সৌন্দর্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে-দৃষ্টি, যে-ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটোবড়ো এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে নিয়মের মধ্যে বেঁধে কাজের মধ্যে সম্পন্ন ক'রে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান-পর্যন্ত দেখা গেছে, তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি— সর্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসি পর্বতে একবার গিয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম একদিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যাত্যাগ করে পার্বত্য গৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বসতেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসংগীত শ্রবণ করতেন— তেমনি আবার জ্ঞান-আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিনখানি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বই, কান্টের দর্শন ও গিবনের 'রোমের ইতিহাস' ছিল— তা ছাড়া এদেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের

যা-কিছু পরিণতি ঘটছে, সমস্তই মনে-মনে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে ;— গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্বদা কি-রকম জাগ্রত ছিল, তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক্ স্ট্রীটে বাস করতেন— একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্ক্ স্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, “দেখো, আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি ; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্ছি, কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে দেবে না।”— আমি বেশ বুঝতে পারলুম, শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে-ধ্যানমূর্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি যে শান্ত শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল— সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণচিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে, সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় ক’রে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত, হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হ’ক। তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্ত কালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়ছে এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করছে। সকল শক্তি সকল কর্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল, বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হ’ক। কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায়— সেইখানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা

ক্রমশই বেড়ে উঠে বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে থাকে ;— আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্মসাধনায় ও কর্মসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে— উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে ; সকল-প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসংগত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলছে ; নিজের দুর্বল বুদ্ধি ও দুর্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল-প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি— অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি— সেইজন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই— তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সংকোচমাত্র বোধ করি নে এবং আমাদের সর্বপ্রকার চিরপ্রচলিত আচারবিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তি-তর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেইজন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সংকুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য-অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলই নিজের অন্ধতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্বেই দুটি-একটি ক'রে ভক্তবিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চমস্বরে আনন্দবার্তা ঘোষণা করছে, আজ আমরা দেশের নব উদ্‌বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ময় কল্যাণসূর্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

সন্ধ্যা। ৭ পৌষ ১৩১৭

জাগরণ

প্রতিদিন আমাদের যে-আশ্রমদেবতা আমাদের নানা কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণ্যদিনের প্রথম ভোরের আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বল বেশ প'রে আমাদের সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন— জাগো, আজ আশ্রমবাসী সকলে জাগো।

যখন আমাদের চোখে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের গানের মিলন ঘটে, যখন আমাদের স্পর্শস্নায়ুর তন্তুতে তন্তুতে

বিশ্বের কত হাজাররকম আঘাতের ঢেউ আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ খেলিয়ে উঠতে থাকে, তখনি আমাদের জাগা— আমাদের শক্তির সঙ্গে যখন বিশ্বের শক্তির যোগ দুই দিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনি জাগা।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে, সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারছে, বলছে 'জাগো'। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আসছে, বলছে 'জাগো'। যেখানে সেই বড়োর আহ্বানে আমাদের ছোটোটি তখনি সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়ছে, প্রত্যেক তারটিকেই বলছে 'জাগো'। যে তারটি জাগছে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সংগীত। যে-তার শিথিল, যে-তার জাগছে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সংগীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হয়।

এই-রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি, তা কি আমরা জানি। প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব আনন্দ উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা কি আমাদের স্মরণ আছে। জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে, তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে— মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে। অনন্তের মধ্যে আমাদের এই-যে জাগরণ, এই-যে নানাদিকের জাগরণ— গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা তো এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন— তিনি তাঁর হাজারমহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন— এই মনুষ্যত্বের মুক্ত দ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে— সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না, ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে-না-যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল, স কৃপণঃ, সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই-যে জাগা, এও কি একটিমাত্র জাগরণ। গোড়াতেই তো আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে— সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা। আমাদের চোখকান আমাদের হাতপা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ ক'রে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের মধ্যে এমন কয়জন আছে? তার পর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে— বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা

আছে— এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে— যেখানে সাড়া দিচ্ছে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্ছে— যেখানে সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্ম-উপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্ছে, সেইখানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দর্য ঐশ্বর্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহা-উদ্‌বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে— বলছে, 'ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড়ো করে জানো।' বলছে, 'নিজের কৃত্রিম আচারের, কাল্পনিক বিশ্বাসের, অন্ধ সংস্কারের তমিস্র-আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না— উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও— আত্মানং বিদ্ধি।'

এই-যে জাগরণ, যে-জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি— যে-জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সংকোচ বিদীর্ণ ক'রে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি, সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরবরাগিণীর প্রভাতী গান ধরেছেন— আজ আমাদের উৎসব সার্থক হ'ক।

আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোটো আর-একদিকে অত্যন্ত বড়ো। যে-দিকটাতে আমি কেবলমাত্রই আমি— সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি— কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা – যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সেদিকটাতে আমি তো একটি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মতো ছোটো আর কে আছে। আর যেদিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যেদিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শতসহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ীর সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে,— আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোকলোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, 'তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর-কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি', সেইখানে আমার চেয়ে বড়ো আর কে আছে। এই বড়োর দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটোর দিকে কখনোই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহংকারের অতীত সেই আমার বড়ো-আমিকে সকলের-চেয়ে-বড়ো-আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্ছে আমাদের বড়ো দিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা আর-কেউ তা নয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে এই-যে আমিত্ব ব'লে একটি জিনিস, এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত-কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু এই-যে ঘর ভাঙাবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার মূলও হচ্ছেন উনি। পৃথক না হলে মিলনও হয় না; তাই দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জগৎ জুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে কেবলই পরস্পর বোঝাপড়া করছে। আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা;— তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেলছে, আর-এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্ছে। এমনি করে আমি এবং আমি-না'র মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ারভাঁটা চলেছে। এমনি করে আমি আমাকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানছি এবং সকলকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানছি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে ব'লে আমি-টুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব। যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ, সেইদিকে তার পাপ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার ত্যাগ, সেদিকে তার পুণ্য; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকেই তার কঠোর অহংকার, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকেই তার সকল মাধুর্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আর-একদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্ছে দ্বন্দ্বসমাধানের প্রার্থনা;— অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সাধক কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন—

জব হম রহল রহা নহিঁ কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ, এই আমি একদিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্যদিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্ছে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেলতে চান না, একে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী ; একে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্ছেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম-আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেইজন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই, আমার মতো তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই ; আমি যদি হারাই তবে লোকলোকান্তরের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেইজন্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমাকে নইলে নয়, সেইজন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপেই আমার ভগবান, সেইজন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোটো হয়ে, সংসারী হয়ে, সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি।

কিন্তু মানুষ আমির এই বড়ো দিকের কথাটি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ভুলে থেকে বাঁচবে কী করে। তাই প্রতিদিনের মধ্যে-মধ্যে এক-একটি বড়োদিনের দরকার হয়। আগাগোড়া সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাঁচে না, তার মাঝে-মাঝে জানলা দরজা বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের ও ঘরকে বাহিরের করে রাখতে চায়। বড়োদিনগুলি হচ্ছে সেই প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড়ো দরজা। আমাদের প্রতিদিনের সূত্রে এই বড়োদিনগুলি সূর্যকান্তমণির মতো গাঁথা হয়ে যাচ্ছে ; জীবনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, যত খাঁটি, যত বড়ো, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে।

তাই বলছিলুম, আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে আশ্রমের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে ; আজ নিখিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে-যোগ, সেই যোগটি ঘোষণা করবার রোশনচৌকি এই প্রান্তরের আকাশ পূর্ণ করে বাজছে, কেবলই বাজছে, ভোর থেকে বাজছে। আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আনন্দক্ষেত্র। কেন। কেননা, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় সমস্ত মানুষের সাধনা চলছে। এখানকার তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে। আশ্রমের

সেই বড়ো কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত সংকল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নেব।

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সংগীতটি আজ কে বাজাবেন। সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাতন্ত্রী যাঁর কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্ছে। তিনিই একের সঙ্গে অন্যের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে তুলছেন; তাঁরই হাতের সেই বিচ্ছেদমিলনের ঝংকারে বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলই উৎসারিত হয়ে আকাশ পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে; একই ধুয়ো থেকে তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং একই ধুয়োতে তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হচ্ছে।

বীণার তারগুলো যখন বাজে না তখন তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না, তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অমনি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে দেয়— তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র তবু এক,— কেউ-বা লোহার কেউ-বা পিতলের, তবু এক,— কেউ-বা সরু সুরের কেউ-বা মোটা সুরের, তবু এক— তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের অন্তরতর মিলটি সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে যায়— দেখা যায় আপনার মধ্যে সুর যতই স্বতন্ত্র হ'ক, গানের মধ্যে তারা এক।

আমাদের জীবনের বীণাতে, সংসারের বীণাতে প্রতিদিন তার বাঁধা চলছে, সুর বাঁধা এগোচ্ছে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেসুর। তখন চেষ্টার মূর্তি, কষ্টের মূর্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেসুরকে সমগ্রের সুরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে, এক-একসময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে।

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয়, তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই— কেবলই বুঝি এই টানাটানি বাঁধাবাঁধি, দিনের পর দিন কেবলই খেটে মরা, কেবলই ওঠা পড়া, কেবলই অহংযন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া —কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিণাম নেই— কেবলই দিনযাপন মাত্র।

কিন্তু যিনি আমাদের বাজিয়ে, তিনি কেবলই কি কঠিন হাতে নিয়মের খোঁটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের সুরই বাঁধছেন। তা তো নয়। সঙ্গে-সঙ্গে মুহূর্তে

মুহূর্তে ঝংকারও দিচ্ছেন। কেবলই নিয়ম? তা তো নয়। তার সঙ্গে-সঙ্গেই আনন্দ। প্রতিদিন খেতে হচ্ছে বটে পেটের দায়ের অত্যন্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গেই মধুর স্বাদটুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠছে। আত্মরক্ষার বিষম চেষ্টায় প্রত্যেক মুহূর্তেই বিশ্বজগতের শতসহস্র নিয়মকে প্রাণপণে মানতে হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই মেনে চলবার চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে উঠছে। দায়ও যেমন কঠোর, খুশিও তেমনি প্রবল।

সেই আমাদের ওস্তাদের হাতে বাজবার সুবিধেই হচ্ছে ওই। তিনি সব সুরের রাগিণীই জানেন। যে-ক'টি তার বাঁধা হচ্ছে, তাতে যে-ক'টি সুর বাজে, কেবলমাত্র সেই ক'টি নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুলতে পারেন। পাপী হ'ক, মূঢ় হ'ক; স্বার্থপর হ'ক, বিষয়ী হ'ক, যে হ'ক-না, বিশ্বের আনন্দের একটা সুরও বাজে না এমন চিত্ত কোথায়। তা হলেই হল; সেই সুযোগটুকু পেলেই তিনি আর ছাড়েন না। আমাদের অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল ঝন্‌ঝনার মাঝখানে হঠাৎ এমন একটা-কিছু সুর বেজে ওঠে যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চারদিককে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা-কোনো সুর, নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে অহংকারের সঙ্গে যার মিল নেই— যার মিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের আলোর সঙ্গে; যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে; সেই সুরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের অতিক্ষুদ্র শিশুটিও আমাদের সকল স্বার্থের উপরে চেপে বসে; সেই সুরেই আমরা ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ দিই; সেই সুরে সত্য আমাদের দুঃসাধ্য সাধনের দুর্গম পথে অনায়াসে আহ্বান করে; সেই সুর যখন বেজে ওঠে তখন আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্তেই ভুলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমরণের অধীন, আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত; সেই সুরের স্পন্দনে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে আপনাকে লুকিয়ে অসীমকেই প্রকাশ করতে থাকে। সে সুর যখন বাজে না তখন আমরা ধূলির ধূলি, আমরা প্রকৃতির অতিভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কার্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তখন বিশ্বজগতের কল্পনাতীত বৃহত্ত্বের কাছে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুণ্ঠিত। তখন আমরা মাথা হেঁট করে দুই হাত জোড় করে অহোরাত্র ভয়ে ভয়ে বাতাসকে আলোকে সূর্যকে চন্দ্রকে পর্বতকে নদীকে নিজের চেয়ে বড়ো ব'লে দেবতা ব'লে যখন-তখন যেখানে-সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই। তখন আমাদের সংকল্প সংকীর্ণ, আমাদের আশা ছোটো,

আকাঙ্ক্ষা ছোটো, বিশ্বাস ছোটো, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোটো। তখন কেবল 'খাও— পরো— সুখে থাকো— হেসে খেলে দিন কাটাও' এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু সেই ভূমার সুর যখনি বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে মন্ত্রিত হয়ে ওঠে, তখনি কার্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকেও আমরা তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়ো; তখন আমরা জগৎসৌন্দর্যের দর্শক, জগৎঐশ্বর্যের অধিকারী, জগৎপতির আনন্দভাণ্ডারের অংশী— তখন আমরা প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী।

আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দর ভীষণ সংগীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃতলোকে জাগ্রত হই। আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে দেখি, মর্তজীবনকে অনন্ত-জীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান করি।

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়— লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে। কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত সুর, কত দেশে, কত কালে —সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখদুঃখের জন্মমৃত্যুর আলোক-অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত-অভিঘাতে, বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। ধন্য আমার প্রাণ যে, সেই অনন্ত আনন্দসংগীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে আছে; এই আমি-টুকুর তান সকল-আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মিড়ের পর মিড় টেনে চলেছে। এই আমিটুকুর তান কত সূর্যের আলোয় বাজছে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্ছে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠছে; সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মতো এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝংকৃত হয়ে উঠছে। কী সুন্দর আমি! কী মহৎ আমি! কী সার্থক আমি!

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ করে তুলে ধ'রে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আশ্রমের প্রতিদিনের সাধনার লক্ষ্যটি এই যে, বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার বাজতে থাকবে অনন্তের আনন্দগানে। সংকোচ নেই; কোথাও সংকোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সংকোচ নেই;— স্বার্থের সংকোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সংকোচ, ঘৃণাবিদ্বেষের সংকোচ— কিছুমাত্র না। সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত খোলা, সমস্তই আলোতে ঝল্‌মল্ করছে— তার উপর বিশ্বপতির

আঙুল যখন যেমনি এসে পড়ছে, অকুণ্ঠিত সুর তৎক্ষণাৎ ঠিকটি বেজে উঠছে। জড় পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গেও তার আনন্দ সাড়া দিচ্ছে, তরুলতার সঙ্গেও তার আনন্দ মর্মরিত হয়ে উঠছে, পশুপক্ষীর সঙ্গেও তার আনন্দের সুর মিলছে, মানুষের মধ্যেও তার আনন্দ কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্ছে না ; সকল জাতির মধ্যে, সকলের সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে, সকল ধর্মে তার উদার আত্মবিস্মৃত আনন্দ সূর্যের সহস্র কিরণের মতো অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। সর্বত্রই সে জাগ্রত, সে সচেতন, সে উন্মুক্ত ; প্রস্তুত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, উচ্ছ্বসিত তার আহ্বানধ্বনি। সে সকলের, এবং সেই বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তাঁর যিনি সকলেরই।

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও জানি নে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যতদিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জানছি, ছোটো চিন্তায় ছোটো বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারি দিকে শ্রী নেই ; ততদিন তোমার জগদ্‌ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করছি, ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই,— ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ ব'লে গণ্য করি,— ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারি নে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই,— ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মতো আপনাকে কেবলই পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে চাই ; শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলি নে, ধর্ম বাঁচিয়ে চলি নে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলি নে। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারিদিকের অনিয়ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্য, অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না— চতুর্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্যবিজড়িত অনাদর দূর হয় না, নিখিলের প্রতি আমার আত্মা পরিপূর্ণ শক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না ; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি— কঠিন এবং প্রবল সংকল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারি নে ;— কি অব্যবস্থাকে কি অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে

প্রস্তুত হই নে, পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারি নে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে-মনে গৃহে-গ্রামে সমাজে-স্বদেশে সর্বত্রই নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে, অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারিদিকে স্তূপাকার করে তোলে।

হে ভূমা, আজকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগরণের দিন হ'ক— আজ তোমার এই আকাশে আলোকে বাতাসে উদ্‌বোধনের বিপুল বাণী উদ্‌গীত হতে থাক্‌, আমরা অতি দীর্ঘ দীনতার নিশাবসানে নেত্র উন্মীলন করে জ্যোতির্ময় লোকে নিজেকে অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে অনুভব করি; আনন্দসংগীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে; আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টায়, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল— তোমার আশীর্বাদ লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি; সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্যের আলোক, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আমাদের মন্ত্র; অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই,— আমরা মানব না পরাভব, আমরা জানব না অবসাদ, আমরা করব না আত্মার অবমাননা, চলব দৃঢ়পদে অসংকুচিত চিত্তে— চলব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত ক'রে— তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাকবে, চারিদিক থেকে আহ্বান আসতে থাকবে 'এসো, এসো, এসো'— আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চির জীবনের সিংহদ্বার— কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ— অন্তরে বাহিরে কল্যাণ— আনন্দম্ আনন্দম্, পরিপূর্ণমানন্দম্।

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও এই বিভাগে মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে প্রকাশিত হইবে।]

মহুয়া

মহুয়া ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মহুয়ার বর্তমান সংস্করণে অনেক কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইল, এবং রচনাতারিখ ও পাঠ পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইল।

নির্ঝরিণী, শুকতারা, অচেনা, পথের বাঁধন, বাসরঘর, বিদায়, প্রণতি, নৈবেদ্য, অশ্রু, অন্তর্ধান— এই দশটি কবিতা শেষের কবিতা[1] উপন্যাসের জন্য লিখিত হইলেও 'ভাবানুষঙ্গবশত মহুয়াতেও মুদ্রিত হইয়াছে'। রচনাবলী-সংস্করণে মহুয়ার সেই রূপ অপরিবর্তিত রাখা হইল।

মহুয়ার প্রথম সংস্করণের পাঠপরিচয়ে পাদটীকায় জানানো হইয়াছে যে, 'বিচ্ছেদ' ও 'বিরহ' শেষের কবিতার জন্য লিখিত হইলেও ওই উপন্যাসে ব্যবহৃত হয় নাই।

পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত কয়েকটি কবিতার মূল বা স্বতন্ত্র পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

৩ শুধায়ো না মোর গান
কারে করেছিনু দান
পথধুলা-'পরে আছে তারি তরে
যার কাছে পাবে মান।

২ যে সেই ধুলার ফুলে
হার গেঁথে লয় তুলে,—
হেলার সে-ধন হয়-যে ভূষণ
তাহারি মাথার চুলে।

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ড।

১ ফুল ছিঁড়ে লয় হাওয়া,
সে পাওয়া মিথ্যে পাওয়া—
আনমনে তার পুষ্পের ভার
ধুলায় ছড়িয়ে যাওয়া।

[১৯২৭]

উৎসর্গ-কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বর্জনচিহ্নিত প্রথম পাঠ ; পরে পার্শ্ববর্তী সংখ্যানুযায়ী শ্লোকগুলির ক্রম পরিবর্তিত হইয়াছিল।

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র অগ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক ম'রে,
জাগো চিরস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধ'রে।
যাহা স্থূল, যাহা ক্লান্ত তব,
অঙ্গ সাথে দগ্ধ হ'ক, হও নিত্যনব।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

বন্ধু তব দৈত্যজয়ী দেব বজ্রপাণি,
পুষ্পচ্ছলে তাঁরি অগ্নি দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
অন্তরে করুক ক্ষুব্ধ দুঃখের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

সংকটবন্ধুর তব দীর্ঘ রাজপথ—
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।

তিমিরতোরণ রজনীর
স্পন্দিবে আহ্বানে মোর নির্ঘোষগম্ভীর।
যাক দূরে দ্বিধা লজ্জা ত্রাস—
আয় বক্ষে সর্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

তপতী নাটকের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত (পৃ. ৫২-৫৪) অনেকাংশে-পৃথক পাঠ।

উজ্জীবন

উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি ধূর্জটির ক্রোধবহ্নিশিখা
হে মন্মথ, মনসিজ, হে মনের মায়ামরীচিকা,—
তৃষ্ণামরুবিহারে বিলাস,—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

দহনে দ্বিগুণ দীপ্তি লভিল দাহনশক্তি তব,
পুরাতনে ভস্ম করি বাহির হয়েছ নিত্যনব—
দুঃখে তব দুর্জয় বিকাশ—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

পুষ্পের প্রচ্ছন্ন তলে ইন্দ্রের যে বজ্র কর চুরি
মিলন করুক তীব্র, বিরহের দুঃসহ মাধুরী
শান্তি মোর করুক বিনাশ—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

নিন্দাকণ্টকিত পথে জয়যাত্রা অতন্দ্র অধীর
আনন্দে সার্থক করো— দাও মোরে বিশ্ববিস্মৃতির
সর্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

'তপতা'র পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ-স্বতন্ত্র পাঠ। অসম্পূর্ণ ?

বরণডালা

আজি এই মম সকল ব্যাকুল
অঙ্গ-মাঝে
ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

এই বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল মিলিছে তোমার
চরণমূলে।
আমার দেহের বাণীতে সে দোল
উঠিছে দুলে।
দিনু পূজা মম, নাহি যদি লও
মরিব লাজে।
ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

তরু হতে ফুল আনি নাই আমি
আনি নি ফল।
দেশ দেশ হতে আনি নি ভরিয়া
তীর্থজল।
আমার আপন তনুতে উছলে
অধরা ধারা,
অধীরতা তার তোমারি মাঝারে
হ'ক-না সারা।
ঘনযামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে।

ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

বৈশাখ ১৩৩৩

সম্ভবতঃ ইহা পূর্বপাঠ। কবির 'বৈকালী' গ্রন্থে (৪২ পৃ.) প্রাপ্ত। নটীর পূজা নাটকের 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটির সহিত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বরণ

পুরাণে কাহিনী শুনিয়াছি
দময়ন্তী নিয়েছিল বাছি
মানবেরে, ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে।
অর্ঘ্যহারা দেবতারা চলে গেল লাজে।
রাজকন্যা চিনেছে সেদিন
দেবমূর্তি, সে যে ছায়াহীন।

তাই শুনে একা বসে বসে
ভেবেছিনু বালিকাবয়সে—
আমি লব স্বয়ম্বরে বরি দেবতারে,
সর্বমানবের মাঝে চিনিব তাহারে;
তারি লাগি মোর দেহে মনে
বরমাল্য গাঁথিব যতনে।

বুঝি নি, কঠিন মোর পণ
কেমনে যে করিব সাধন।
কত-না মানুষ ফেরে দেবতার বেশে
লয়ে পুজারির দল দেশ হতে দেশে।
হেথা হোথা দিনে দিনে তাই
দ্বিধা লয়ে ফিরেছি সদাই।

খরতর রৌদ্রের বেলায়
জনতার মুখর মেলায়

দাঁড়ালেম একদিন রাজপথ-পাশে,
চেয়ে চেয়ে দেখিলাম যারা যায় আসে।
দেখিলাম যতটুকু কায়া
তার চেয়ে দীর্ঘতর ছায়া।

স্পর্ধাতীক্ষ্ণ কত কণ্ঠস্বর
শুনিলাম ভেদিছে অম্বর।
দেখিনু দীনের মূর্তি উজ্জ্বল সজ্জায়,
ধনসমারোহে তারে ঢাকিল লজ্জায়;
যতই ছুটায় অশ্বরথ
সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত।

সেদিন সবার ঠেলাঠেলি
নানা শব্দে উঠিল উদ্বেলি।
তুমি পথপ্রান্তে একা ছিলে হাস্যমুখে
নিঃশব্দে দেখিতেছিলে নিস্তব্ধ কৌতুকে;
হৃদয় আছিল জনস্রোতে,
মন ছিল দূরে সবা হতে।

বহে গেল জনতার ঢেউ।
তোমা-পানে চাহে নাই কেউ।
কেবল একেলা আমি দেখেছি তোমারে,
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে।
মালা হাতে কাছে গেনু ধেয়ে,
হাসিলে আমার মুখে চেয়ে।

২৫ অগস্ট ১৯২৮
চৌরঙ্গি

পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত স্বতন্ত্র পাঠ।

মহুয়া

রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
প্রাণ তোর উচ্চশির রহে রাজকুলবনিতার
মর্যাদা বহিয়া। হেরিয়াছি তোরে শালবীথিকায়
বনস্পতিসভা-মাঝে, সজ্জা তোর প্রচুর ছায়ায়
লুণ্ঠিত তৃণের 'পরে; বিপুল পল্লবঘন স্তরে
আগন্তুক বিহঙ্গমে সংগীতগুণীর সমাদরে
ডেকে নিস উদার আশ্রয়ে। উঠে যবে হুহুংকার
ক্রুদ্ধ কালবৈশাখীর, গর্ব জাগে শাখাপ্রশাখার,
তর্জনে গর্জিয়া উঠে দৃপ্তবলে রাখে আশ্রিতেরে।
অনাবৃষ্টিশীর্ণ দিনে বনের প্রাঙ্গণ হতে ফেরে
বুভুক্ষু অতিথি যবে, বন্য নারী আসে তোর পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি পূর্ণ করি দিস সদাব্রতে।
যে-বধূরে ভাবি মনে, কানে-কানে কহি আমি তোরে—
যদি তার দেখা পাই ডাকিব মহুয়া নাম ধ'রে।

২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত বর্জনচিহ্নাঙ্কিত প্রথম পাঠ।

বিরহ ও অন্তর্ধান

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল,—
ব্যথায় নিবিড় হল শেষ কথা কহিবার কাল।

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
গেলে তুমি দূর পথে, নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে।
ধীরে ধীরে বনান্তে মিলালো
প্রান্তরের প্রান্ততটে অস্তশেষ ক্ষীণ পাংশু আলো।

তব অন্তর্ধানে তব হেরিলাম রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।

যে-দ্বার খুলিয়া গেলে রুদ্ধ সে হবে না কোনোমতে,
কান পাতি রহে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে—
তোমার অমূর্ত আসাযাওয়া
যে পথে চঞ্চল করে দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া।

বসন্তে মাঘের অন্তে আম্রবনে মুকুলমত্ততা
মধুপগুঞ্জনে মিশি আনে কোন্ কানে-কানে কথা।
মোর নাম তব কণ্ঠে ডাকা
ক্লান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা।

বিরহের সঙ্গহীন স্তব্ধতার গভীর নিভৃতে
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতদিনে পাইনু শুনিতে
তুমি কবে মর্ম-মাঝে পশি
দিলে অনির্বচনীয় ধ্যানমন্ত্রবাণী মহীয়সী।

অন্তরের অন্ধকারে এতদিনে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তে মোর তোমারি সে দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৫

'বিরহ' ও 'অন্তর্ধান' কবিতাদুটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত একীকৃত আকারের প্রাথমিক পাঠ।

'দায়মোচন' কবিতাটির প্রথম শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপিতে নিম্নোদ্ধৃত একটি সম্পূর্ণ নূতন শ্লোক আছে :

শ্রাবণের বর্ষণে যা দিয়েছে ঢালি,
দান সেই অল্প তো নয়।

ফাল্গুনে ধরণীর যৌবনডালি
ভরে সেই রসসঞ্চয়।
তার পরে আশ্বিনে মেঘ উদাসীন
শূন্য গগনতলে সম্বলহীন ;—
স্বচ্ছ প্রভাতে ধরা চাহে তার পানে,
বিদায়ঋতুরে নাহি ডরে।
আলোতে শিশিরে আর সৌরভে প্রাণে
গৌরবে বিচ্ছেদ ভরে।

'সাগরিকা' কবিতাটির মহুয়ায় প্রচলিত পাঠে নিম্নমুদ্রিত একটি সম্পূর্ণ স্তবক বর্জিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি ও মাসিক পত্রে (প্রবাসী, ১৩৩৪ পৌষ) প্রাপ্ত এই স্তবকটির স্থান বর্তমান পাঠের চতুর্থ স্তবকের পরে :

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব অরুণরাগে,—
নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে,
শুনিনু কান পেতে,
গভীর স্বরে জপিছ কোন্‌খানে
উদ্‌বোধনমন্ত্র যাহা নিয়েছ তব কানে,
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহমোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ স্মরি' যুগল করি' পাণি।

'বিদায়সম্বল' কবিতাটির প্রচলিত পাঠে বর্জিত শেষ শ্লোকটি পাণ্ডুলিপি ও বিচিত্রা (১৩৩৪ কার্তিক) হইতে নিম্নে সংকলিত হইল :

যাবার দিকের পথিক যখন
শেষ কাঁদা শেষ হাসা
মিটায়ে চলিছে, থাক্‌-না তখন
মিছে ওইটুকু আশা।
বিদায়ের আগে সজল আঁখিতে
উঠুক ঘনিয়া ক্ষণিকের গীতে
'ভুলিব না কভু' এই কথাটিতে
অন্তিম ভালোবাসা।

মহুয়ার কয়েকটি কবিতার পরিবর্তিত সংগীতরূপ প্রথম সংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডেই (শ্রাবণ ১৩৩৯) পাওয়া যায়।

কবিতা	গানের প্রথম পংক্তি	গী. বি. পৃষ্ঠা
বিজয়ী -	বিরস দিন, বিরল কাজ	৮০৪
সন্ধান -	আমার নয়ন তোমার নয়নতলে	৭৫৫
মুক্তি -	চপল তব নবীন আঁখি দুটি	৭৯২
উদ্‌ঘাত -	জানি তোমার অজানা নাহি গো	৭৯৪
নিবেদন -	কাহার গলায় পরাবি গানের	৮৩৩
গুপ্তধন -	আরো একটু বোসো তুমি	৮২৭
পুরাতন -	অনেকদিনের আমার যে-গান	৭৬৬

প্রত্যাশা, সন্ধান, বরণডালা, নিবেদন, নির্ভয়, গুপ্তধন, অবশেষ—মহুয়ার এই সাতটি কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়াছিলেন ; দ্বিতীয় সংস্করণ গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৩৩৬ সালে গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে মহুয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল :

লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা— প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে— আর তাঁরই দালালি করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল। অতএব 'মহুয়া'র কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতা বলে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো কালবিশেষের নয়, এটা আকস্মিক। আমার সত্যিকার আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি এদের এক পংক্তিতে বসাও তা হলে তাদের বর্ণভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে কিছু যেন অত্যুক্তি করা হল। ফরমাশ ব্যাপারটা মোটরগাড়ির স্টার্টারের মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু তার পরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহই সম্পূর্ণ ভুলেছে— কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল ঘোরানো হতেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা শুরু হবামাত্রই লেখবার আনন্দই সারথি হয়ে বসে। এইজন্য আমার বিশ্বাস, তোমরা এই লেখার মধ্যে নতুন কিছু পাবে, আকারে এবং প্রকারে। নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে

পড়ে তখন তারা পূর্বদলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না; নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না। ক্ষণিকার বাসা আর বলাকার বাসা এক নয়।

আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

মহুয়ার 'মায়া' নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে— নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি ক'রে অন্তর-বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে— সেখানে ভাবে ভঙ্গীতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর-একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য, তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

এই দুয়ের মধ্যে নূতনের বাসন্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে— নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকত না। তুমি তো জানই কত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলি সমাধা করেছি। তার কারণ প্রবর্তনার বেগ মনে সতেজ ছিল। তাই অন্যমনস্ক-ভাবে এই পত্রের পূর্বাংশে তোমাকে যা লিখেছি অপরাংশে তার প্রতিবাদ করতে হল। বলেছিলুম এ লেখাগুলি আকস্মিক। ভুলেছিলুম সব কবিতাই যখনি লেখা যায় তখনি আকস্মিক। সব কবিতা বললে হয়তো বেশি বলা হয়। এক-একটা সময়ে এক-একটা নতুন ঝোঁকের কবিতা। বারো মাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে-ঋতু যায়, সে আর-এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা ক'রে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না, এ হতেই পারে না, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলনের মতো। মনের যে-ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, ফর্মাসের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক। এগুলি যখন লিখছিলুম অপূর্বকুমার[1] প্রায় রোজ এসে শুনে যেত, সে যে-উত্তেজনা প্রকাশ করত সেটা

১ শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ

অপূর্বতারই উত্তেজনা। রূপের দিকে বা ভাবের দিকে একটা-কিছু নতুন পাচ্ছে বলেই তার আগ্রহ— তখন সুধীন্দ্র দত্তও ছিল তার সঙ্গী। তার থেকে আমার বিশ্বাস আপনার এই সমর্থন পেত যে, মনের মধ্যে রচনার একটি বিশেষ ঋতুর সমাগম হয়েছে— তাকে পুরবীর ঋতু বা বলাকার ঋতু বললে চলবে না।

পুরবী ও মহুয়ার মাঝখানে আর-একদল কবিতা আছে— সেগুলি অন্য জাতের। তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিল কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষকে অতিক্রম করেছে। আর কোনো-খানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখি নি— তারই সঙ্গে মানবভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে। তার রীতিমত শুরু হয়েছে শারদোৎসবে— তার পরে ঋতুগীতির প্রবাহ বেয়ে এসে পড়েছিল ঋতুরঙ্গে। বিষয় এক তবু প্রভেদ যথেষ্ট। সেই প্রভেদ যদি না থাকত তা হলে লেখবার উৎসাহই থাকত না। মহুয়ার কবিতা যখন পড়বে তখন আমার স্বভাবের এই কথাটা মনে রেখো। এই বইয়ের প্রথমে ও সব-শেষে যে-গুটিকয়েক কবিতা আছে সেগুলি মহুয়া পর্যায়ের নয়। সেগুলি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের। দোলপূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা ব'লে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।

মহুয়া নামটা নিয়ে তোমার মনে একটা দ্বিধা হয়েছিল জানি। কাব্যের বা কাব্যসংকলন-গ্রন্থের নামটাকে ব্যাখ্যামূলক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নামের দ্বারা আগেভাগে কবিতার পরিচয়কে সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়াকে আমি অত্যাচার মনে করি। কবিতার অতিনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছা করেই মহুয়া নামটি দিয়েছি, নাম পাছে ভাষ্যরূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে। অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সংগতি আছে— মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা। যাই হ'ক, অর্থের অত্যন্ত বেশি সুসংগতি নেই বলেই কাব্যগ্রন্থের পক্ষে এ নামটি উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি।"

কবির স্বহস্তাঙ্কিত নামপত্র এবং উৎসর্গকবিতাটি প্রচলিত সংস্করণের মতো রচনাবলী-সংস্করণ মহুয়াতেও মুদ্রিত হইল।

বনবাণী

বনবাণী ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রচনাবলী-সংস্করণে গ্রন্থটির 'বনবাণী' এবং 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' কেবল এই দুইটি কবিতা-অংশ

মুদ্রিত হইল। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে অনেক কবিতার রচনাকাল ও পাঠ সংশোধিত এবং রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইল।

বনবাণীর ভূমিকাটি শ্রীতেজেশচন্দ্র সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের[১] পরিমার্জিত রূপ। 'কুটিরবাসী' কবিতার ভূমিকায় ইনিই 'তরুবিলাসী তরুণবন্ধু' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

পাণ্ডুলিপিতে উক্ত কবিতাটির আরম্ভে নিম্নমুদ্রিত তিনটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে :

বাসাটি বেঁধে আছ
    মুক্তদ্বারে
বটের ছায়াটিতে
    পথের ধারে।
  সমুখ দিয়ে যাই; মনেতে ভাবি
  তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি,
হারায়ে ফেলেছি সে
    ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে আর
    অনেক দায়ে।

এখানে পথে-চলা
    পথিক জনা
আপনি এসে বসে
    অন্যমনা।
  তাহার বসা সেও চলারই তালে,
  তাহার আনাগোনা সহজ চালে,
আসন লঘু তার
    অল্প বোঝা,
সোজা সে চলে আসে,
    যায় সে সোজা।

আমি যে ফাঁদি ভিত
    বিরাম ভুলি',

১ দ্রষ্টব্য : 'গাছপালার প্রতি ভালোবাসা'—প্রবাসী, ১৩৩৪ বৈশাখ।

চূড়ার 'পরে চূড়া
আকাশে তুলি।
আমি যে ভাবনার জটিল জালে
বাঁধিয়া নিতে চাই সুদূর কালে,
সে-জালে আপনারে
জড়াই ঠেসে,
পথের অধিকার
হারাই শেষে।

'শাল' কবিতার ভূমিকায় 'কিশোর কবিবন্ধু' বলিয়া যাঁহার উল্লেখ আছে, তিনি পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায় (১২৮৮-১৩১০)[১]।

বৃক্ষরোপণ-উৎসব শান্তিনিকেতনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ৩০ আষাঢ় ১৩৩৫ সালে (১৪ জুলাই ১৯২৮)। শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরকে একটি পত্রে (৯ শ্রাবণ ১৩৩৫)[২] রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন :

···এখানে হল বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হল হলচালন।··· তোমার টবের বকুলগাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হল। পৃথিবীতে কোন গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল— শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন— আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম— মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জালিয়ে তার অভ্যর্থনা হল।··· তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হল— আমি এই উপলক্ষ্যে ছোটো একটি গল্প[৩] লিখেছিলুম, সেটা পড়লুম। আমার বেশভূষা দেখলে নিশ্চয় খুশী হতে। একটা কালো রেশমের ধুতি, গায়ে লাল আঙিয়া, মাথায় কালো টুপি, কাঁধে জরিদেওয়া কালো পাড়ের কোঁচানো লম্বা চাদর।···

পরিশেষ

পরিশেষ ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, ভীরু —পরিশেষের এই ছয়টি কবিতা পুনশ্চ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া পরিশেষের বর্তমান সংস্করণে বর্জিত হইল। কবিতাগুলি রচনাবলী-সংস্করণে 'পুনশ্চ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১ দ্রষ্টব্য : বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে 'বন্ধুস্মৃতি'। ২ দ্রষ্টব্য : চিঠিপত্র, তৃতীয় খণ্ড, পত্র নং ২৮।

৩ বলাই : গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে অনেক কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তারিখ ও পাঠ সংশোধিত বা পরিবর্তিত হইয়াছে।

'বিচিত্রা' কবিতাটির একটি অপ্রকাশিত স্বতন্ত্র পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

বিচিত্রা

চুরি করে নিয়ে গেলে মোর মন কোন্ শিশুকালে,
হে বিচিত্রা, বাঁধি মায়াজালে—
বস্তুর আড়ালে যেথা দিনরাত্রি সাজাইছ তুমি
তোমার রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশে ছড়ায়ে কেশ বাঁশি বাজায়েছ চুপে চুপে,—
সেই সুরে মোর চক্ষে কত স্বপ্ন অপরূপ রূপে
করেছে বিচিত্র লীলা ধরণীর ধূলির সীমায়,
দিগন্তের দূর নীলিমায়।

নারিকেলপল্লবের আকম্পিত ইঙ্গিতমর্মরে
বৈশাখের খরসূর্যকরে
আকাশ নিশ্বসি উঠি মধ্যাহ্নের আতন্দ্র আলসে
ভরিয়াছে রহস্যের রসে।
তৃণাগ্রে শিশিরবিন্দু শরতের শুভ্রতার বাণী
বাতাস ঝলকি' দিত, মুক্তির আনন্দ দিত আনি,
কাঁপিত প্রভাত আলো বালকের পুলকিত বুকে
হে বিচিত্রা, চাহি তব মুখে।

চৈত্রে স্বচ্ছ পূর্ণিমায় যত্নে-গাঁথা মল্লিকার মালা
ভরে যবে রাত্রির নিরালা
মিলন-আশ্বাসগন্ধ, শ্রান্তিহীন পাপিয়ার গানে,
অনিদ্রা নিবিড় করি আনে,—
যৌবনের সেই রাত্রে, বিচিত্রা, কাহার কালো চোখে
মোহিনীর মিড়খানি মিলাইতে চাঁদের আলোকে,
মধুর সংশয়ে-ছোঁওয়া শরমের কুহেলিকা আনি
হাসির উপরে দিতে টানি।

লোকালয়ে ফিরায়েছ সুখদুঃখে নিজে হাত ধরি
পথে পথে দিবসশর্বরী।
প্রাণের বীণার তন্ত্রে মৃত্যুসুরে তুলেছ স্পন্দন,
বাঁধিয়াছ, ছিঁড়েছ বন্ধন।
মর্মের বেদনা মোর তোমার আপন রসধারে
পেয়েছে সুতীব্র বর্ণ, দিয়েছ গভীর অর্থ তারে,
মোর নৌকা খেয়া দিতে বারে বারে ঝঞ্ঝাবায়ু তুলে
নিয়ে গেছ অপূর্বের কূলে।

মনে হয় সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম পাঠ।

কয়েকটি কবিতার পরিশেষ-গ্রন্থে-বর্জিত অনুচ্ছেদ পাণ্ডুলিপি বা সাময়িক পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

সহসা জ্যৈষ্ঠের শেষরাতে
গুরু গর্জনের সাথে
পূর্ববনান্তের শাখে মর্মরিয়া জাগে বায়ুবেগ,
ঘননীল মেঘ
দিগন্তের তটে আনে বর্ষণের নিবিড় আশ্বাস—
তৃষিত মাটির বক্ষে দৈন্যজীর্ণ ঘাস
উল্লাসে তখনি
করিয়া অশ্রুত জয়ধ্বনি
থরে থরে
ছোটো ছোটো অক্ষরে অক্ষরে
আকাশের স্তবগান ফুটাইয়া তুলে
তিনীল তিনাল ফুলে ফুলে।—
সে-পুলক নেব মোর সর্বদেহ ভরি'
রক্তের লহরী
উঠিবে উচ্ছলি।
বসন্তে কুঞ্জের গলি
সুগন্ধিচ্ছায়ায়,

'জন্মদিন' কবিতার পাণ্ডুলিপিতে বর্জনচিহ্নিত রচনাংশ—
বর্তমান রচনাবলীর ১৬৭ পৃষ্ঠার অষ্টম ও নবম পংক্তির মধ্যে।

কবি আমি কারো গুরু নই।
জানি না কী আছে হোথা কৈবল্যের পারে
বৈকুণ্ঠের ধারে।

'পান্থ' কবিতার প্রথম পংক্তির পরে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত রচনাংশ।

তোমার প্রথম জন্মদিন
এনেছে মর্ত্যের ঘাটে যে-প্রাণ নবীন,
চিরন্তন মানবের মহাসত্তা-মাঝে
এল কোন্ কাজে ?
এক আমি-কেন্দ্র ঘিরে
ফিরে ফিরে
মুহূর্তের দল অগণন
সৃষ্টির নিগূঢ় শক্তি করিয়া বহন
দিনরাতি
কী গাঁথনি তুলিতেছে গাঁথি
আলোয় ছায়ায়,
বিচিত্র বেদনাঘাতে ঝংকৃত কায়ায়,
রূপে রসে বর্ণে নৃত্যে গন্ধে গানে বেষ্টিত মায়ায়।

'অপূর্ণ' কবিতার বর্জিত প্রথম অনুচ্ছেদ[১]।

শুধু প্রাণরক্ষা আর বংশরক্ষা কাজে
তোমার চিত্তের শক্তি সাঙ্গ হয় নাই আত্ম-মাঝে,
যা রহিল বাকি
ধূলি তারে ফাঁকি দিবে নাকি।
সে চিত্ত অসীম-পানে বাতায়ন দিয়েছিল খুলি,
প্রত্যহের আপনারে ভুলি'
নিত্যের নৈবেদ্যথালে
আপনার শ্রেষ্ঠ দান ভরি দিয়াছিল কালে কালে।

১ দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, ১৩৩৮ পৌষ— 'জন্মদিন'।

অসীম প্রাণের বার্তা যবে এসেছিল কানে
মরপ্রাণ তুচ্ছ করেছিলে আত্মদানে,
অর্থ তার কোথাও কি হবে না সমাধা,
মৃত্যু তারে দিবে বাধা,
ধুলায় কি হবে ধূলি
মহাক্ষণগুলি।

জন্মদিন এই বাণী
দিক তব চিত্তে আনি,—
মর্ত্যের জরায়ু
আপনাতে বদ্ধ করি লুপ্ত করিবে না তব আয়ু,—
অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রাণ—
এ গর্ভবন্ধনে তার হলে অবসান,—
আরবার নবজন্ম লবে
পূর্ণের উৎসবে।

'অপূর্ণ' কবিতার শেষদুটি বর্জিত অনুচ্ছেদ।

আঁধার তিথিতে তারকাবীথিতে তন্দ্রাজড়িত চন্দ্র।
যুথীকলিগুলি দিতেছে আকুলি হিমগদ্‌গদ গন্ধ।
ক্ষীণ জ্যোৎস্নায়, ঘন কুয়াশায়,
ঘুমে জাগরণে, কায়ায় মায়ায়,
তোমায় আমায় আলোয় ছায়ায়
যুগলে ঘটিল দ্বন্দ্ব।
জন্মমরণ-অতীত বেলায় স্মরণের পরপারে
তব ভাবনায় মোর চেতনায় এক হল একেবারে।

'তুমি' কবিতার বর্জিত প্রথম শ্লোক। দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, ১৩৪৮ চৈত্র— 'প্রাণলক্ষ্মী'।

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে।
সেই যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকুল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশনীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে-যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুনচৈত্ররাতে।
রইল তারি রাখি বাঁধা
ভাবীকালের হাতে।

'দিনাবসান' কবিতার তৃতীয় অনুচ্ছেদের পরবর্তী বর্জিত অনুচ্ছেদ।
দ্রষ্টব্য প্রবাসী, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ— 'জন্মোৎসবের দিনে'।

পরিশেষের কয়েকটি কবিতা সাময়িক পত্রে গদ্যভূমিকা-সংবলিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে গদ্যাংশগুলি মুদ্রিত হইল।

অবুঝ মন

জাহাজ চলছে, সমুদ্রের জল কেবলই ছল্‌ছল্‌ করে, আর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। একটি ছোটো শিশু; আমরা আছি আপন আপন কোণে একটিমাত্র কেদারা নিয়ে, কিন্তু সে আছে সমস্ত ডেক জুড়ে। তার অবুঝ মনখানি অসংলগ্ন অহৈতুক আগ্রহে ফ্যাল্‌ফেলে চোখের ভিতর দিয়ে বিশ্বের পরিচয় নিচ্ছে। আয়ার অঙ্কবিহারী সেই আটদশমাসের শিশুটির খেলা দেখে আমার অনেকটা সময় কাটে।

এটা বুঝতে পারছি যে, ওরই ওই মনটি আদিমকালের বহু পুরাতন। আমার যে-মন ওকে দেখছে আর ভাবছে, সেই হল নূতন; অনেক চেষ্টায় অনেক শিক্ষায় ও সাধনায় এই বিচারবুদ্ধিমান মন গড়ে উঠছে, এখনো সে অসমাপ্ত। ওরই অবচেতন মনটির সঙ্গে মেলে গাছপালার মধ্যে যে নির্বোধ মন জলের দিকে তার শিকড় চালাচ্ছে, সূর্যের দিকে যার আকুতি, যা স্বপ্নচালিতের মতো আপন ফুলের ভিতর দিয়ে আপন

ফলের উদ্দেশ্য সাধন করে। আমার নতুন মন গাছপালার মধ্যে ওই পুরাতন সহজ মন দেখে গভীর শান্তি পায়, আনন্দিত হয়। শিশুর মধ্যেও সেই আদিম মনটি দেখতে তার এত ভালো লাগে। মেয়েদের প্রকৃতিতেও মনের এই আদিমতার প্রাধান্য, তাদের সহজ বোধ সহজ প্রবৃত্তি বিচারবুদ্ধির চেয়ে অনেক প্রবল। আমরা অনেক-দিন থেকে ওদের সরলা অবলা বলে আসছি, সে কথার মানেই ওই— যে-তর্কে দ্বিধা আনে ওদের স্বভাবে ভালো করে সেই তর্কবুদ্ধি দখল পায় নি। নতুন-বুদ্ধি-ওয়ালা পুরুষের মনের কাছে এই সহজ মনের সংস্পর্শ আরামের। নতুনবুদ্ধিওয়ালা মনটা ক্লান্ত করে, বিভ্রান্ত করে, সংশয়ে আন্দোলিত করে; এইজন্যে মানুষ অনেক-সময় মদ খায়, এই উদগ্রবুদ্ধিমান মনটাকে বিহ্বল করে দিয়ে সেই আপন আদিম অবোধ মনের মধ্যে ছুটি নিতে চায় যেখানে অরাজকতা।

শিশুর মধ্যে যাকে দেখছি, সেই আদিম মনটাকে আর-এক জায়গায় দেখছি যেখানে গণসংঘ। সেই গণেশের হাতির মুণ্ড, তার যূথবুদ্ধির মাথা, সে বশ মানতেও যেমন মেতে উঠতেও তেমনি। তার প্রকাণ্ড শক্তির সঙ্গে তার নীরব বশ্যতার মিল পাই নে, তেমনি তার অকস্মাৎ দুর্দামতারও হিসেব পাওয়া যায় না। সেই অবুঝ মনটার সংস্কারগুলো, তার সমস্ত অন্ধ প্রবর্তনা গণসম্প্রদায়কে ঠেলে নিয়ে চলে। তারাই হল বাহন। নতুন মনটা সারথিগিরি করতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘোড়া প্রায়ই চার পা তুলে ছোটে। নইলে য়ুরোপে সেদিন যে যুদ্ধকাণ্ড হয়ে গেল, তা হতে পারত না। আদিম মনটা যখন বুদ্ধিওয়ালা মনটাকে একেবারেই মানতে চায় না, তখন মানুষ যাকে সভ্যতা বলে তার ঘটে দুর্গতি। প্রাচীন গ্রীস তার অসামান্য বুদ্ধি সত্ত্বেও যদি মরে থাকে, তার কারণটা ছিল অবচেতন মনের মধ্যে, যেখানে তার গুহাচর প্রবৃত্তির, তার গর্তবাসী সংস্কারের বাসা। আজকের দিনে য়ুরোপ কোনোমতেই স্থায়ী শান্তির কোনো ব্যবস্থা করতে পারছে না, তার কারণ সংস্কারগুলো লাগাম দাঁতে চেপে ধ'রে ছুটতে চায়।

সভ্যতা এর উলটো কারণেও মরে। নতুন মন যখন সনাতন সহজ মনের শক্তিকে আপন জটিল কর্মজালে সম্পূর্ণ চাপা দিতে চায়, আপন রথের চাকার তলায় তাকে খণ্ড খণ্ড করে, তখন তার শক্তির আদিম আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায়। আকাশগামী চূড়াটা ধুলোর আশ্রয় ছাড়িয়ে উঠতে চায়; ক্ষতি নেই, কিন্তু যখন সামঞ্জস্যের সীমা অতিক্রম করে তখনি ফিরে তাকে সেই ধুলোয় এসে পড়তে হয়। আদিম অবুঝ মনের সঙ্গে নতুনবুদ্ধিমান মনের পদে পদে রফা-নিষ্পত্তি করে চলাই পাকাচালে চলা। এই তো গেল আমার চিন্তার কথা। কিন্তু শিশুর মুখের দিকে যখন তাকিয়ে দেখতুম তখন যে-আনন্দ বোধ করতুম সেটা চিন্তার আনন্দ নয়; তখন আমি বিশ্বব্যাপী আদিম

প্রাণের বৃহৎ রঙ্গলীলা শিশুর দুটি চোখের বুদ্ধিবিহীন চঞ্চল ঔৎসুক্যের মধ্যে দেখতে পেতুম। শিশুর মধ্যে সেই বিশ্বশিশুকে দেখার আনন্দেই এই কবিতাটি লিখেছি।

—বিচিত্রা, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ

আরেক দিন

যখন বছর দুয়েক হল দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করেছিলুম তখন মনের মধ্যে কোনো ভার ছিল না। যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁরা আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা আমার কাছ থেকে বক্তৃতা চান না, আমাকেই চান। দেশের দিক থেকেও কোনো অনুরোধ নিয়ে আসি নি, কেবল জাহাজে ওঠবার আগে একটি বাঙালী মেয়ের চিঠি পেয়েছিলুম, সে ইচ্ছে জানিয়েছিল আমি যেন ডায়ারি লিখি। তার পরে ভেসে পড়লুম সমুদ্রে। মন অনেকদিন এমন মুক্তি পায় নি। সামনে পিছনে কর্তব্যের তাগিদ নেই, আশেপাশেও তথৈবচ। বহুকাল পূর্বে, তখন বয়স অল্প, ঘরে কিম্বা বাইরে খাতির করবার লোক নেই,— লেখা আরম্ভ করেছি কিন্তু সে লেখা দূরে পৌঁছয় নি। আমার কাছে দেশের লোকের বা বিদেশের লোকের কোনো প্রত্যাশা ছিল না। পাঠক জমতে আরম্ভ করে নি তা বলা যায় না, কিন্তু পাঠকমণ্ডলী-নামক প্রকাণ্ড একটি শনিগ্রহ আমার জীবনকে তার উপগ্রহদলে ভরতি করবার জন্যে টান মারে নি। তখন মাসিকপত্র দুটি-চারটি, তার মধ্যে যারা প্রবলকণ্ঠশালী তারা ছিল আমার নিয়ত প্রতিকুল। সাপ্তাহিক যে-কয়টি ছিল তারা কেউ আমার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। তাই আমার দায়িত্ব ছিল প্রধানত আমার নিজের কাছেই। তখন না ছিলেম অখ্যাত, না ছিলেম বিখ্যাত, ছিলেম প্রত্যাখ্যাত। তখন বাংলাদেশের নির্জন নদীর চরে ছিল আমার যাওয়া-আসা। সম্পূর্ণ নিজের মনেই লিখে যেতুম, শোনবার লোক কেউ ছিল না তা নয়, ছিল দুটি-চারিটি। আমার মন ছিল পাখি; তার না ছিল খাঁচা, না ছিল পায়ে শিকল,— না ছিল তার 'পরে শৌখিনের দাবি, না ছিল তার জন্যে প্রশংসার বাঁধা খোরাক। তার পর চল্লিশ বছর হয়ে গেল। এবার চলল সমুদ্রযাত্রা সুদীর্ঘ; পরিচিত সঙ্গী কেবলমাত্র একজন, এল্‌ম্‌হর্‌স্ট্‌, বাংলাভাষায় তার কান ছিল না। ডাঙার কোলাহল বহুদূরে। তার উপর শরীর হল অসুস্থ, তাতে ক'রেও সংসারের দায়িত্ব আরো অনেক দূরে দিলে সরিয়ে। বহুবৎসর পরে তাই ছুটি পাওয়া গেল, অল্পবয়সের হালকা জীবনের ছুটি। অমনি কলম আপনি ছুটল কবিতার চেনা রাস্তায়। ক্যাবিনে বসেও কবিতা লেখা চলে, এইবারে তার প্রথম আবিষ্কার। ক্যাবিনের খাঁচা বাইরের খাঁচা, সেটা ভুলতে বেশিক্ষণ লাগে না যদি

মনের মধ্যে পর্দা উঠে যায়, যদি ছুটির আকাশ থেকে হুহু করে হাওয়া ছুটে আসে। সেদিন শুধু কাব্য লিখি নি, গদ্যও লিখেছি; সেই কবিতা আর গদ্য ছিল ভাইবোন, সগোত্র।

এইবারে সেই ছুটি ঠিক মিলল না। মন ডানা নড়াতে গিয়ে দেখে ডানার উপরে কর্তব্যের ফরমাশ গট হয়ে চেপে ব'সে; মনের আপন খেয়ালের জায়গা খুব সংকীর্ণ। দূর হ'কগে— বোঝাটাকে নিয়ে দেশদেশান্তরে আর বয়ে বেড়াতে পারি নে। কাল ডেকের উপর কেদারায় বসে মনে-মনে বললুম, বিশ্বের কাছে আমার দায়িত্ব আছে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে এই কথাটা ভুলব। তাই একটা ছোটো কালো খাতা নিয়ে ঝুঁকে পড়া গেল, গৌড়জনকে নিরবধি মধু খাওয়াব সংকল্প করে নয়, অদৃষ্টের কাছে আজো ছুটির পাওনা দাবি করতে পারি এইটি প্রমাণ করবার জন্যে।

তার পরে সন্ধে হয়ে এল। দূরে দেখা যায় তটরেখা, নীল পাহাড় ঝাপসা হয়ে এসেছে। হাওয়া উঠেছে, সমুদ্রে দিয়েছে ঢেউ। ডেকের উপর আলো জ্বলল। আবার একবার কলম হাতে খাতা খুললুম।

—বিচিত্রা, ১৩৩৪ মাঘ

তে হি নো দিবসাঃ

অপরাহ্নে আর-একটা কবিতা লিখে বসেছি। কর্তব্য হাতে না থাকলে অকাজের প্রাদুর্ভাব কি-রকম প্রবল হয় তারই এটা প্রমাণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ যখন কর্তব্য সম্বন্ধে ওড্‌ লিখেছিলেন তখন তাঁকে যদি মুলোর চাষ করতে হত, তা-হলে অতবড়ো দুর্ঘটনা ঘটত না। পোড়ো বাড়িতেই ভূতে বাসা করে।

—বিচিত্রা, ১৩৩৪ ফাল্গুন

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পরিশেষের 'দুয়ার' কবিতাটির শ্লোকচারিটি বিশ্ব-ভারতী বিদ্যাভবনে চারিটি দ্বারের উদ্দেশে রচিত হইয়া দ্বারগুলির শীর্ষফলকে অঙ্কিত হইয়াছে।

সংযোজন

পরিশেষ প্রকাশের বৎসরে (১৩৩৯) ও তৎপূর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কবিতা বনবাণী বা পরিশেষে সংকলিত হইতে পারিত অথচ কোনো কবিতাগ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের কতকগুলি পঞ্চদশখণ্ড রচনাবলীর সংযোজন-বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশেষ গ্রন্থের কবিতাগুলির ভাবানুষঙ্গ বিচারে অব্যবহিত পরবর্তী কালের কয়েকটি রচনাও এই অংশে সংকলিত হইয়াছে। একই কারণে

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' হইতে 'লক্ষ্যশূন্য' এবং 'জাভাযাত্রীর পত্র' হইতে 'নূতন কাল' কবিতাদুটিও মুদ্রিত হইল।

সাময়িক পত্র হইতে সংকলিত কবিতার তালিকা পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল সহ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

প্রাচী	-	প্রাচী, ১৩৩০ আষাঢ়
আশীর্বাদ (পৃ. ২৯১)	-	প্রবাসী, ১৩৪৮ শ্রাবণ
আশীর্বাদ (পৃ. ২৯২)	-	বিচিত্রা, ১৩৩৫ শ্রাবণ
প্রবাসী[১]	-	প্রবাসী, ১৩৩৩ বৈশাখ
বুদ্ধজন্মোৎসব[২]	-	প্রবাসী, ১৩৩৪ বৈশাখ
প্রথম পাতায়[৩]	-	প্রবাসী, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৫৭
নূতন	-	কল্লোল, ১৩৩৫ বৈশাখ
শুকসারী	-	উত্তরা, ১৩৩৮ আশ্বিন
সুসময়	-	বিচিত্রা, ১৩৩৫ আষাঢ়
পরিণয়মঙ্গল	-	বিচিত্রা, ১৩৩৪ চৈত্র
গৃহলক্ষ্মী	-	বঙ্গলক্ষ্মী, ১৩৩৪ বৈশাখ
রঙিন	-	বিচিত্রা, ১৩৩৮ বৈশাখ
আশীর্বাদী	-	উপাসনা, ১৩৩৮ আশ্বিন
বসন্ত-উৎসব	-	বিচিত্রা, ১৩৩৯ বৈশাখ
আশীর্বাদ (পৃ. ৩০৮)	-	প্রবাসী, ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ
আশীর্বাদ (পৃ. ৩০৯)	-	বিচিত্রা, ১৩৩৯ মাঘ
উত্তিষ্ঠত নিবোধত	-	প্রবাসী, ১৩৪৮ মাঘ
প্রার্থনা	-	বিচিত্রা, ১৩৪০ ভাদ্র
অতুলপ্রসাদ সেন	-	উত্তরা, ১৩৪১ আশ্বিন

'জীবনমরণ' কবিতাটি পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে ; ১৩৪৮, আশ্বিনের মেঘনা পত্রিকায় কবিতাটি 'বসন্ত' নামে প্রকাশিত হয়, সেখানে উহার তারিখ— দোলপুর্ণিমা ১৩৩৪। 'জীবনমরণ' ও 'সুসময়' কবিতাদুটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত পূর্ব পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

জীবনমরণ

জীবনের মরণের বাজায়ে মন্দিরা
বসন্ত নাচিয়া চলে চরণ চঞ্চল।
মাটির বন্দিনী ধরা তাই তো অধীরা
সাথে চলে যেতে চায় ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল।

১ প্রবাসী পত্রিকার পঁচিশবৎসর-পূর্তি উপলক্ষে আশীর্বাণী।
২ দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় সংস্করণ নটীর পূজা, পৃ. ৫৬।
৩ 'ছোটো একটি মেয়েকে লেখা' কয়েকটি পত্রের সহিত প্রকাশিত।

আজি হেরো করে কোলাকুলি
এক দোলে দোঁহে দোলাদুলি
জীর্ণ পাতা কিশলয় কচি,
আজি হেরো শিরীষের বনে
নূতনের সাথে পুরাতনে
উৎসবের ডালি দেয় রচি।

বিদায় টেনেছে মিড় মিলনের তারে,
আনন্দের সুরে লাগে মূর্ছিত মূর্ছনা।
যুগল কপোতকণ্ঠে করুণা সঞ্চারে
ছায়াতলে বনলক্ষ্মী উৎসুক উন্মনা।
মোর প্রাণে যাওয়া আর আসা
একসুরে খোঁজে দোঁহে ভাষা,
একতালে দোলে কান্নাহাসি।
যে আছে যে নাই দোঁহে মিলি
মোর ভাবনায় নিরিবিলি
বাজাইছে ফাল্গুনের বাঁশি।

৬ ফাল্গুন ১৩৩৪

সুসময়

'দাও লেখা দাও' দেয় কত জন তাড়া,
চারদিকে চাই, না পাই বাণীর সাড়া।
চায় যবে কেউ অমনি ধরাই পড়ে
নই তো সে-জন লেখন যে-জন গড়ে—
লক্ষ্মীছাড়ার মিথ্যে দুয়ার নাড়া।

চাবার মানুষ চায় না যখন কেহ
'তীখন কথার লিখন ভিক্ষা দেহো',
হাটের পথিক নাই যবে কেউ বাকি,
একলা শাখায় বউ-কথা-কও পাখি,
হরিণশিশুর নাই মনে সন্দেহ,—

ক্লান্ত সমীর শান্ত কোমল শ্বাসে
অস্ফুট সুর জাগায় যখন ঘাসে,—
তখন হঠাৎ আলগা দুয়ার খোলা,—
স্বপনমগন-নয়ন, আপন-ভোলা
লেখক যে-জন বাহির-ভুবনে আসে।

যখন-তখন লুকিয়ে তাহার আসা,
প্রদোষ-আলোয় পথহারা তার বাসা।
বক্ষে তাহার যে-পুষ্পহার দোলে
নাই জানা নাই কোথায় সে-ফুল তোলে,—
চক্ষে তাহার কোন্ ইশারার ভাষা।

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যাসোনার ভাণ্ডারদ্বার-পানে,
মেঘের উপর যতই দারুণ দাবি,
কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি,
গগন আপন অবগুণ্ঠন টানে।

তার পরে যেই শিউলিফুলের বাসে
শরৎলক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
কুন্দকলির স্নিগ্ধ শীতল কথা,
আকাশ সে কোন্ স্বপন-আভায় হাসে,—

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
সবুজ খেতের নবীন ধানের শিষে
ঢেউ খেলে যায় আলোক ছায়ায় মিশে,
গগনসীমায় কাশের কাঁপন লাগে—

হঠাৎ তখন সূর্য-ডোবার কালে
দীপ্তি জাগায় দিক্‌ললনার ভালে।
মেঘ ছিঁড়ে তার পর্দা আঁধার কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
পরম আশার চরম প্রদীপ জ্বালে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

পূর্বোদ্ধৃত 'সুসময়' কবিতার প্রথম চারটি শ্লোকের পরিবর্তিত স্বতন্ত্ররূপ পাণ্ডুলিপির অন্যত্র স্বাধীন কবিতার আকারে পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে মুদ্রিত হইল :

'লিখন দেহো, লিখন দেহো' ডাকে,
খুঁজে না পাই বাণী কোথায় থাকে।
চায় কেহ যেই তখন ধরা পড়ে
নই আমি সেই লেখা যে-জন গড়ে,
লেখনী মোর শরমে মুখ ঢাকে।

চাবার মানুষ নাইকো যখন কেহ,
বলে না কেউ 'লিখন দেহো দেহো',
তখন দেখি মনের দুয়ার খোলা,
স্বপন-লাগা নয়ন ভাবে ভোলা
লেখক আসে অভয় অসন্দেহ।

হঠাৎ তাহার গোপন যাওয়া আসা,—
কোন্ গভীরে অজানা তার বাসা।
বক্ষে তাহার যে-পুষ্পহার দোলে
কেউ জানে না কোথায় সে ফুল তোলে,
চক্ষে তাহার কোন্ ইশারার ভাষা।

'লক্ষ্যশূন্য' ও 'নূতনকাল' কবিতাদুটির সূচনাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, 'যাত্রী'[১] গ্রন্থ হইতে তাহা যথাক্রমে অংশতঃ উদ্ধৃত হইল। পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১ 'যাত্রী' গ্রন্থের অঙ্গীভূত 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'জাভা-যাত্রীর পত্র'— রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থমালার স্বতন্ত্র দুইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

লক্ষ্যশূন্য

সিদ্ধি, যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্‌সেস, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে না। বীভৎস সর্বভুক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্‌স্‌ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁঠকাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মবুদ্ধি যেখানে মাঝে-মাঝে বাধা খাড়া করে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফমারা **hurdle race** খেলে চলেছে। সবুর সয় না যে। বিষবায়ুবাণ যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন এক পক্ষ ব্যবহার করলে তখন অন্য পক্ষ ধর্মবুদ্ধির দোহাই পাড়লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে। যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণবর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেল ধর্মবুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি ধার্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লিবাসীদের প্রতি কথায়-কথায় পাপবজ্র সন্ধান করছে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যাপ্রচারের শয়তানী অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই শয়তানি আজও থামে নি। এমন-কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগাণ্ডা রেয়াত করে না। এই-সব নীতি হচ্ছে সবুর-না-করা নীতি— এরা হল পাপের দ্রুত চাল,— এরা প্রতি পদেই বাহিরে জিতছে বটে কিন্তু সে জিত অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে। রসাতল থেকে দানব বলছে 'বাহবা'।

—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

নূতন কাল

…আমরা যারা এখানে [বালীদ্বীপে] বাহির থেকে এসেছি, আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেছে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্তমানভাবে দেখতে পাচ্ছি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি ; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুরভাবে আপন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্তমানের পিছনে পড়া, সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন। বর্তমান সেই অতীতের বাহনমাত্র হয়ে বলছে 'আমি হার মানলুম' ; সে দীনভাবে বলছে, 'এই অতীতকে প্রকাশ করে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে।' নিজের 'পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই

হচ্ছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব— বৈরাগ্যমেবাভয়ং, অর্থাৎ বৈনাশ্যমেবাভয়ং।

…এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভব-রকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজনে— যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্মূল্য চালে। এখানে অতীতকালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেছে বহুকাল ধ'রে, বর্তমানকালকে আপন সর্বস্ব দিতে হচ্ছে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।

এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হ'ক নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেছি…

—জাভাযাত্রীর পত্র। ৩০ অগস্ট ১৯২৭

'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' কবিতাটির ব্যাখ্যাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী রমা দেবীকে নিম্ন-মুদ্রিত পত্রটি (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) লিখিয়াছিলেন :

যে-আশীর্বাদ তোমাকে পাঠালুম এখনি তার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারবে না, তাতে ক্ষতি নেই, রইল তোমার কাছে। এর মধ্যে যে-কথাটি আছে সংক্ষেপে তার অর্থ এই, ঈশ্বরের কাছ থেকে দানরূপে পেয়েছি আমাদের এই জীবন, একে যদি হেলা করে নষ্ট না করি, নিজের চেষ্টায় একে যদি ভালো করতে পারি, সুন্দর করতে পারি, তা হলেই এই দান সার্থক হবে— নইলে এত বড়ো ঐশ্বর্য পেয়েও হারানো হবে। 'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' এই মন্ত্রের অর্থ এই— 'ওঠো, জাগো'। জীবনকে সত্য করে তুলতে হলে সচেতন থেকে তার সাধনা করতে হয়।

'প্রবাসী' কবিতাটিকে ভাঙিয়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র দুটি গান রচনা করিয়াছিলেন ; প্রথম সংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' (পৃ. ৭৯০) এবং 'এসো এসো প্রাণের উৎসবে' (পৃ. ৮৪৪) গানদুটি দ্রষ্টব্য।

'নূতন' কবিতাটিরও একটি পরিবর্তিত সংগীতরূপ প্রথম সংস্করণ গীতবিতানে (পৃ. ৮৪৪) পাওয়া যায়। গানটির প্রথম ছত্র— 'দূর রজনীর স্বপন লাগে'।

উল্লিখিত গানগুলি অধুনাপ্রচলিত গীতবিতানের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যাইবে।

বসন্ত

বসন্ত ১৩২৯ সালের (১৯২৩) ফাল্গুন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে উহা 'ঋতু-উৎসব' গ্রন্থে (১৩৩৩) সংকলিত হইয়াছে।

'গানগুলি মোর শৈবালেরি দল' গানটি ঋতু-উৎসবের পাঠে বর্জিত হইয়া থাকিলেও ১৩২৯ সালের পাঠ অনুযায়ী রচনাবলী-সংস্করণ বসন্ত গ্রন্থে যথাস্থানে মুদ্রিত হইল। বলাকার ১৫ সংখ্যক[১] কবিতার সহিত গানটি তুলনীয়।

রক্তকরবী

রক্তকরবী ১৩৩৩ সালে [১৯২৬ ডিসেম্বর] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলঙ-বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে ইহার নাম দিয়াছিলেন 'নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। কালানুক্রম অনুসারে রচনাবলীতে রক্তকরবী বসন্তের পরেই মুদ্রিত হইল।

বর্তমান সংস্করণের 'নাট্যপরিচয়' অংশ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রক্তকরবীর পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত সংস্করণ রক্তকরবীর 'প্রস্তাবনা' ১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি 'অভিভাষণ'।[২] নিম্নে উহা মুদ্রিত হইল :

"আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার 'নন্দিনী'র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হলে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড পৃ ৩৪।

২ দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, ১৩৩২ বৈশাখ— 'রক্তকরবী'।

বের ক'রে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। দশমুণ্ড বিশহাতওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় সামান্য একটা বন্য বানর লেজে ক'রে আগুন লাগায়, এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আজ আপনাদের এই সভায় উপস্থিত করতেন তা হলে তার গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা কলরব উঠত। সন্দেহ করতেন কোনো-একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ করা হচ্ছে। অথচ শত শত বছর ধরে স্বভাবসন্দিগ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে-রস আছে তাই ভোগ করে এলেন— গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি করলেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত ক'রে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

আদিকবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক ব'লে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে এটি সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা-যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই

অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে-স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তা হলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থলের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী ব'লে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই করে সে ধন-হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না? কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে-একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বল প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা-যে বর্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কিরকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই-জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তা-ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধ'রে টান দিয়েছিল?

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী-যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল

কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন? বাল্মীকির পক্ষে এ-সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।

বারোয়ারির প্রবীণমণ্ডলীর কাছে এ-কথা বলে ভালো করলেম না। সীতাচরিত প্রভৃতি পুণ্যকথাসম্বন্ধে তাঁরা আমাকে অশ্রদ্ধাবান বলেই সন্দেহ করেন। এটা আমার দোষ নয়, তাঁদেরও দোষ বলতে পারি নে, বিধাতা তাঁদের এই-রকমই বুদ্ধি দিয়েছেন। বোধ করি সেটা আমার সঙ্গে বারে বারে কৌতুক করবার জন্যেই। পুণ্যশ্লোক বাল্মীকির প্রতি কলঙ্ক আরোপ করলুম বলে পুনর্বার হয়তো তাঁরা আমাকে একঘরে করবার চেষ্টা করবেন। ভরসার কথা আমার দলের লোক আছেন, কৃত্তিবাস নামে আর-এক বাঙালী কবি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠল। আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারই প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনি আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।

হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর-একটিতে শানবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহ-মিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ এক দিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আরেক দিকে শ্রেণীগত মানুষের; রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ ক'রে তাকিয়ে

দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়,— মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।"

যাত্রী গ্রন্থে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত রক্তকরবী সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি ; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল ; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ মজুমদার এজেন্সি হইতে গ্রন্থাকারে দুই খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১ আশ্বিন ১৩০৭ ; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে।

বর্তমান খণ্ড রচনাবলীতে প্রকাশিত 'গিন্নি' গল্পটি অন্যান্য কয়েকটি গল্পের সহিত প্রথম গল্পগুচ্ছে বাদ পড়ে, যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট গল্প' (১৫ ফাল্গুন ১৩০০) বইটিতে উহা ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৯০৮-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে

পাঁচ ভাগে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান প্রেসের গল্পগুচ্ছেও উহা বর্জিত ছিল। বিশ্বভারতী সংস্করণ গল্পগুচ্ছের (শ্রাবণ ১৩৩৩) প্রথম খণ্ডে গল্পটি পুনরায় সন্নিবিষ্ট হয়।

১৩১৭ সালের ২৮ ভাদ্র তারিখে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একটি পত্রে[১] রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।[২]... সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প, সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"

বর্তমান খণ্ড রচনাবলীতে মুদ্রিত গল্প-ছয়টি হিতবাদীতে সম্ভবতঃ প্রথম ছয় সপ্তাহে বাহির হয়।

পোস্টমাস্টার গল্পটি সম্পর্কে সাজাদপুর হইতে ২৯ জুন ১৮৯২ তারিখে লেখা একটি পত্র 'ছিন্নপত্র' হইতে অংশতঃ উদ্ধৃত হইল :

"কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্‌ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অপিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনি আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল, তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ ক'রে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হ'ক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানা-রকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ-একটু হাস্যরসও আছে।"

এই প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রের সাজাদপুর হইতে লেখা ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ তারিখের চিঠিটিও দ্রষ্টব্য।

১ দ্রষ্টব্য : প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক।

২ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের শেষ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'হিতবাদী'-নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়।

'গিন্নি' গল্পের শিবনাথ পণ্ডিতের সহিত 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত 'নর্মাল স্কুল'এর জনৈক শিক্ষকের নিম্নোদ্ধৃত চিত্রটি তুলনীয় :

"ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে।··· শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যার কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কী করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে, সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ওই ক্লাসের পড়াশুনার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ওই কথাটা মনে-মনে আলোচনা করিতাম, তাহা আজও আমার মনে আছে।"

হিতবাদী পত্রিকার দুষ্প্রাপ্যতা-বশতঃ রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গল্পগুলির পাঠ প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট গল্প' ও গল্পগুচ্ছের পূর্বসংস্করণগুলির সাহায্যে সংশোধিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন ১৯০৯ হইতে ১৯১৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ছোটো ছোটো পুস্তিকার আকারে সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২১ সালের মাঘ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ও অন্যত্র নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই এই সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃত 'সংশোধিত ও নির্বাচিত' যে বিশ্বভারতীসংস্করণ শান্তিনিকেতন ১৩৪১-৪২ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, তাহাতে অন্যান্য খণ্ডের কয়েকটি উপদেশের সহিত একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ডের 'দুর্লভ', 'মাতৃশ্রাদ্ধ', 'সামঞ্জস্য'—এই তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান এবং 'জাগরণ'-এর শেষার্ধ বর্জিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে একাদশ [অক্টোবর ১৯১০] ও দ্বাদশ [জানুয়ারি ১৯১১] খণ্ড শান্তিনিকেতন প্রথম সংস্করণ অনুসারে যথাক্রমে মুদ্রিত হইল।

মহুয়ার প্রথম সংস্করণে 'সবলা' কবিতাটির চতুর্থ ছত্রটি বাদ পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে স্মৃতি হইতে সংশোধন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে ২৭ অক্টোবর ১৯৩৯ তারিখের একটি পত্রে সম্পূর্ণ এক নূতন পংক্তি লিখিয়া পাঠান :

মহুয়াতে 'সবলা' বলে যে কবিতাটি আছে, তাতে একটা লাইন ছুট হয়েছে—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতঃ,
সংকোচের দৈন্যজাল কেন তুমি পাতো—

এই শেষের লাইনটা পড়ে গিয়েছে— এই লাইনটাকে উদ্ধার কোরো। পরের লাইনে আছে—

পথপ্রান্তে কেন র'ব জাগি—

পথপ্রান্তে শব্দের পর সেমিকোলন দেওয়া চলে কিনা ভেবে দেখো— তা হলে মানে হবে সংকোচের জালটা পাতা হচ্ছে চলবার পথে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী